Uthon Periye Dui Paa by Humayun Ahmed

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

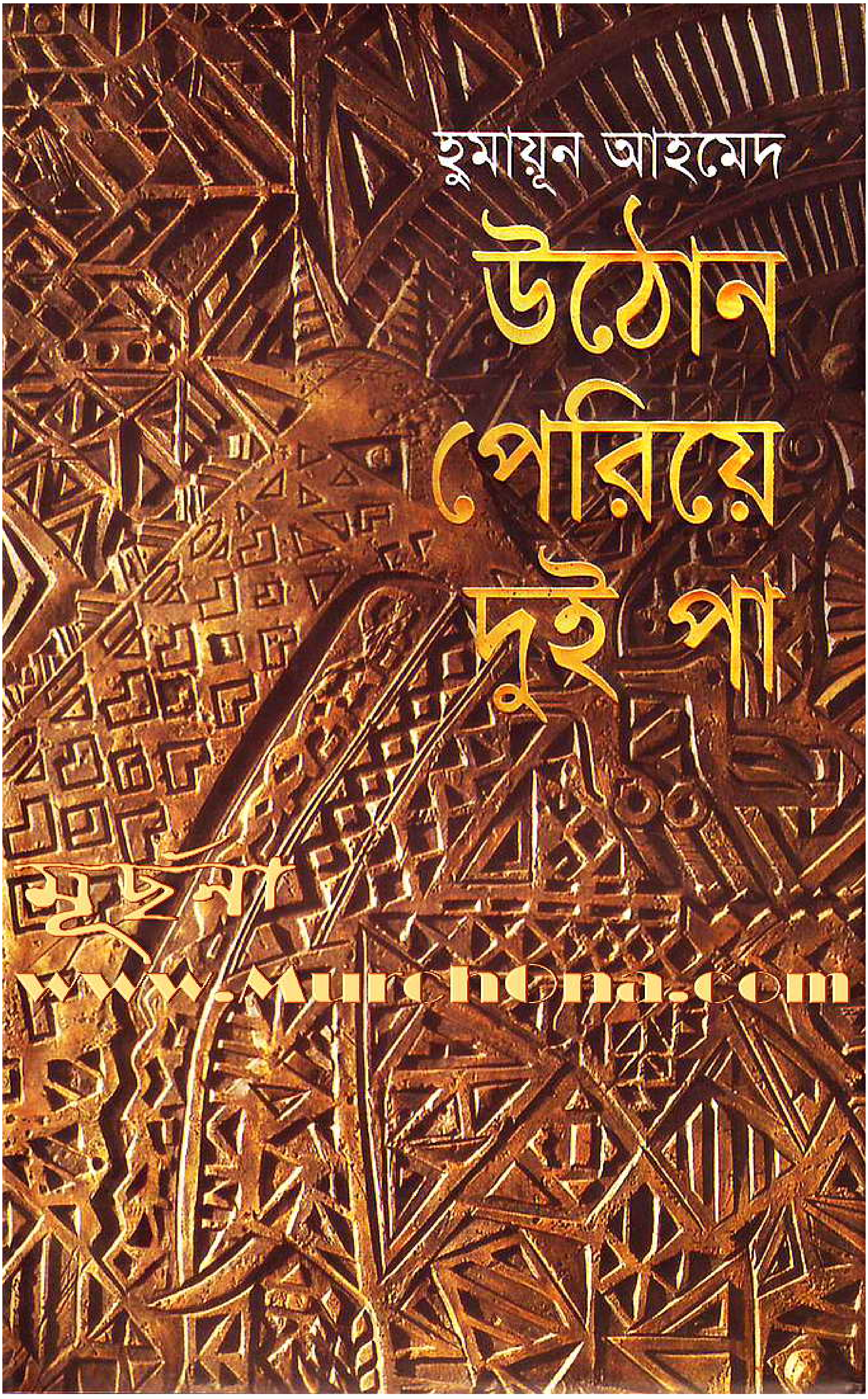
হুমায়ূন আহমেদ
উঠোন
পেরিয়ে
দুই পা
মূর্ছনা
www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

- হোটেল গ্রেভার ইন
- মে ফ্লাওয়ার
- দেখা না-দেখা

উৎসর্গ

পক্ষী বন্ধু সাদাত সেলিম
তিনি পাখিদের ভালবাসেন
পাখিরা কি তাঁকে ভালবাসে?

ভূমিকা

ইংরেজীতে Travelogue বলে একটি শব্দ আছে যার অর্থ অবশ্যই ভ্রমণ কাহিনী না। ভ্রমন-গল্প হতে পারে। আমি এই ধারায় বেশ কিছু লেখালেখি করেছি। লেখাগুলিকে একত্র করার নিজে তেমন প্রয়োজন অনুভব করিনি। অনন্যা'র মুনীর কি জন্যে করলেন তিনিই জানেন।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে স্পষ্ট দুই বিভাজন আছে। জীবনের শুরুর অংশে যে আমার সঙ্গিনী ছিল শেষের অংশে সে ছিল না। অন্য একজন এসেছে। আমি পরিবার-কেন্দ্রিক মানুষ বলেই দু'জনের কথাই আনন্দ নিয়ে অকপটে লিখেছি। পাঠকরা পড়তে গিয়ে ধাক্কার মত খান কি-না কে জানে।

যাপিত জীবন আমার কাছে ট্রেভেলগের মত। ভ্রমনে সঙ্গী বদল হয়। দৃশ্যপট বদলায়–যিনি ভ্রমন করেছেন তিনিও বদলান।

হোটেল গ্রেভার ইন

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

হোটেল গ্রেভার ইন

এলেম নতুন দেশে। লরা ইঙ্গেলস ওয়াইল্ডারের প্রেইরি ভূমি, ডাকোটা রাজ্য। ভোর চারটায় পৌঁছলাম, বাইরে অন্ধকার, সূর্য এখনো ওঠেনি, হেক্টর এয়ারপোর্টের খোলামাঠে হু-হু করে হাওয়া বইছে। শীতে গা কাঁপছে। যদিও শীত লাগার কথা নয়। এখন হচ্ছে– ফল, শীত আসতে দেরি আছে।

আমার মন খুব খারাপ।

দেশ ছেড়ে দীর্ঘদিনের জন্যে বাইরে যাবার উৎসাহ আমি কখনো বোধ করিনি। বর্ষাকালে বৃষ্টির শব্দ শুনবো না, ব্যাঙের ডাক শুনবো না চৈত্র মাসের রাতে খোলা ছাদে পাটি পেতে বসবো না, শীতের দিনে গ্রামের বাড়িতে আগুনের কাছে হাত মেলে ধরবো না, এটা হতে পারে না।

অনেকের পায়ের নিচে সর্ষে তাকে। তাঁরা বেড়াতে ভালোবাসেন। বিদেশের নামে তাঁদের রক্তে বাজনা বেজে ওঠে। আমার কাছে ভ্রমণের চেয়ে ভ্রমণকাহিনী ভালো লাগে। একটা বই হাতে, নিজের ঘরে নিজের চেনা জায়গাটায় বসে থাকবো, পাশে থাকবে চায়ের পেয়ালা, অথচ আমি লেখকের সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লেখক হয়তো সুন্দর একটা হ্রদের বর্ণনা দিচ্ছেন, আমি কল্পনায় সেই হ্রদ দেখছি। সেই হ্রদের জল নীল। জলে মেঘের ছায়া পড়েছে। আমার কল্পনাশক্তি ভালো। লেখক তাঁর চোখে যা দেখছেন আমি আমার কল্পনার চোখে তাঁর চেয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছি। কাজেই কষ্ট করে যাযাবরের মতো দেশ-বিদেশ দেখার প্রয়োজন কি?

প্রেইরি ভূমি সম্পর্কে আমি ভালো জানি। লরা ইঙ্গেলস-এর প্রতিটি বই আমার অনেকবার করে পড়া। নিজের চোখে এই দেশ দেখার কোন আগ্রহ আমার নেই। আমি এসেছি পড়াশোনা করতে। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনির্ভার্সিটি থেকে কেমিস্ট্রির মতো রসকষহীন একটি বিষয়ে পি-এইচ-ডি ডিগ্রি নিতে হবে। কতো দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী কেটে যাবে। ল্যাবরেটরিতে, পাঠ্য বইয়ের গোলকধাঁধায়। মনে হলেই হৃৎপিণ্ডের টিক্‌টিক্ খানিকটা হলেও শ্লথ হয়ে যায়। হেক্টর এয়ারপোর্টের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার মতো বুকের ভেতরটাও হু-হু করে।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

মন খারাপ হবার আমার আরেকটি বড় কারণও আছে। দেশে সতেরো বছর বয়সী আমার স্ত্রীকে ফেলে এসেছি। তার শরীরে আমাদের প্রথম সন্তান। ভালোবাসাবাসির প্রথম পুষ্প। ঢাকা এয়ারপোর্টে আরো অনেকের সঙ্গে সে-ও এসেছিল। সারাক্ষণই সে একটু দূরে-দূরে সরে রইলো। এই বয়সেই সন্তান ধারণের লজ্জায় সে ম্রিয়মাণ। কালো একটা চাদরে শরীরটা ঢেকেঢুকে রাখার চেষ্টাতেই তার সময় কেটে যাচ্ছে। বিদায়ের আগমুহূর্তে সে বললো, আমাদের প্রথম বাচ্চার জন্মের সময় তুমি পাশে থাকবে না?

আমার চোখে প্রায় পানি এসে যাবার মতো অবস্থা হলো। ইচ্ছে করলো টিকিট এবং পাসপোর্ট ছুঁড়ে ফেলে তার হাত ধরে বলি– চলো, বাসায় যাই।

অল্প কিছুদিন আমাদের আয়ু। এই অল্পদিনের জন্যে আমাদের মতো আয়োজন– পাস, ডিগ্রি, চাকরি, প্রমোশন, টাকা-পয়সা, বাড়িঘর– কোনো মানে হয়? কোনোই মানে হয় না।

আমার মনের অবস্থা সে টের পেলো। মুহূর্তের মধ্যে কথা ঘুরিয়ে বললো, যদি ছেলে হয় নাম রাখবো আমি। আর যদি মেয়ে হয় নাম রাখবে তুমি। কেমন?

প্লেনে আসতে-আসতে সারাক্ষণ আমি আমার মেয়ের নাম ভেবেছি। কতো লক্ষ লক্ষ নাম পৃথিবীতে, কিন্তু কোনোটিই আমার মনে ধরছে না। কোনোটিই যেন মায়ের গর্ভে ঘুমিয়ে থাকা রাজকন্যার উপযুক্ত নাম নয়। এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নামটি আমাকে আমার মেয়ের জন্য খুঁজে বের করতে হবে। আজ থেকে আঠারো, উনিশ বা কুড়ি বছর পর কোনো-এক প্রেমিক পুরুষ এই নামে আমার মেয়েকে ডাকবে। ভালোবাসার কতো না গল্প সে করবে। হেক্টর এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে এইসব ভাবছি। চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। পৃথিবীটা এমন যে বেশির ভাগ ইচ্ছাই কাজে খাটানো যায় না। আমি বসে বসে ভোর হবার জন্যে অপেক্ষা করছি। এতো ভোরে কেউ আমাকে নিতে আসবে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রতিবছর হাজার খানিক বিদেশী ছাত্র নর্থডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে আসে। কার এতো গরজ পড়েছে এদের এয়ারপোর্ট থেকে খাতির করে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাওয়ার?

তুমি কি বাংলাদেশের ছাত্র-আহামাদ? আমি চমকে তাকালাম। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যে মহিলা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। চোখ ঝলসে যায়। অপূর্ব রূপবতী। যে পোশাক তাঁর গায়ে তার উদ্দেশ্য সম্ভবত শরীরের সুন্দর অংশগুলোর দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমি জবাব না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রমহিলা আবার বললেন– তুমি কি বাংলাদেশের ছাত্র আহামাদ?

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

আমার নাম টয়লা ক্রেইন। আমি হচ্ছি নর্থডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার। আমি খুবই লজ্জিত যে দেরি করে ফেলেছি। চলো, রওনা হওয়া যাক। তোমার সঙ্গে সব জিনিসপত্র কি এই?

ইয়েস।

আমার সব জবাব এক শব্দে, ইয়েস এবং নো-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইংরেজিতে একটা পুরো বাক্য বলার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে একটা পুরো বাক্য বলেই এই ভদ্রমহিলা হা হা করে হেসে উঠবেন।

আহামাদ, তুমি কি রওনা হবার আগে এক কাপ কফি খাবে? বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। হঠাৎ কেন জানি ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। কফি আনাবো?

না।

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি পূর্বদেশীয় ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো কিছু খাবার কথা বললেই তারা প্রথমে বলে 'না'। অথচ তাদের খাবার ইচ্ছা আছে। আমি শুনেছি 'না' বলাটা তাদের ভদ্রতার একটা অংশ। কাজেই আমি আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করছি– তুমি কি কফি খেতে চাও?

চাই।

ভদ্রমহিলা কাগজের গ্লাসে দু'কাপ কফি নিয়ে এলেন। এর চেয়ে কুৎসিত কোনো পানীয় আমি এই জীবনে খাইনি। কষা তিতকুটে একটা জিনিস। নাড়ীভূঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। ভদ্রমহিলা বললেন, হট কফি ভালো লাগছে না? আমি মুখ বিকৃত করে বললাম, খুব ভালো।

টয়লা ক্রেইন হেসে ফেলে বললেন, আহামাদ তোমাকে আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি। আমেরিকায় পূর্বদেশীয় ভদ্রতা অচল। এদেশে সব কিছু তুমি সরাসরি বলবে। কফি ভালো লাগলে বলবে– ভালো। খারাপ লাগলে কফির কাপ 'ইয়াক' বলে ছুঁড়ে ফেলবে ডাস্টবিনে।

আমি ইয়াক্ বলে একটা শব্দ করে ডাস্টবিনে কফির কাপ ছুঁড়ে ফেললাম। এই হচ্ছে আমেরিকায় আমেরিকানদের মতো আমার প্রথম আচরণ।

টয়া ক্রেইনের গাঢ় লাল রঙের গাড়ি ডাউনটাউন ফারেগোর দিকে যাচ্ছে। আমি ঝিম ধরে পেছনের সিটে বসে আছি। আশেপাশের দৃশ্য আমাকে মোটেই টানছে না। টয়লা ক্রেইন একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন। প্রতিটি শব্দ খুব স্পষ্ট করে বললেন। তাতে বুঝতে আমার তেমন কোনো অসুবিধা হলো না। আমেরিকানদের ইংরেজি বোঝা যায়। ব্রিটিশদেরটা বোঝা যায় না। ব্রিটিশরা

www.MurchOna.com

অনেক কথা বলে, অর্ধেক পেটে রেখে দেয়া বলে তা-ও বলার আগে মুখে খানিকক্ষণ রেখে গার্গল করে বলে আমার ধারণা।

আহামাদ, তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি 'হোটেল গ্রেভার ইনে।' হোটেল গ্রেভার ইন পুরোদস্তুর একটা হোটেল। তবে হোটেলের মালিক গত বছর এই হোটেল স্টেট ইউনিভার্সিটিকে দান করে দিয়েছেন। বর্তমানে ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা হোটেলটা চালাচ্ছে। অনেক গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট এই হোটেলে থেকেই পড়াশোনা করে। তুমিও ইচ্ছা করলে তা করতে পারো। হোটেলের সব সুযোগ-সুবিধা এখানে আছে। বার আছে, বল রুম আছে, সাওয়ানা আছে। একটাই অসুবিধা, হোটেলটা ইউনিভার্সিটি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। তোমাকে বাসে যাতায়াত করতে হবে। এটা কোনো সমস্যা হবে না, হোটেল থেকে দু'ঘণ্টা পর পর ইউনির্ভার্সিটির বাস যায়। আমি কি বলছি বুঝতে পারছো তো?

পারছি।

তুমি এসেছো একটা অড টাইমে, স্প্রিং কোয়ার্টার শুরু হতে এখনো এগারো দিনের মতো বাকি। সামারের ছুটি চলছে। এই ক'দিন বিশ্রাম নাও। নতুন দেশের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতেও কিছু সময় লাগে। তাই না?

ইয়েস।

টয়লা ক্রেইন হেসে বলেন– ইয়েস এবং নো– এই দুটি শব্দ ছাড়াও তোমাকে আরো কিছু শব্দ শিখতে হবে। দুটি শব্দ সম্বল করে কথাবার্তা চালানো বেশ কঠিন।

তিনি আমাকে হোটেলের রিসিপশনে নিয়ে অতিদ্রুত কি সব বলতে লাগলেন ডেস্কে বসে থাকা পাথরের মতো মুখের মেয়েটিকে। সেইসব কথার এক বর্ণও আমি বুঝলাম না। বোঝার চেষ্টাও করলাম না। আমি তখন একটা দীর্ঘ বাক্য ইংরেজিতে তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। বাক্যটা বাংলায় এ রকম– মিসেস টয়লা ক্রেইন, আপনি যে এই ভোররাতে আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে আনার জন্য নিজে গিয়েছেন এবং নিজে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

বাক্যটা মনে মনে যখন প্রায় গুছিয়ে এনেছি তখন টয়লা ক্রেইন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাই। বলেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আমার আর ধন্যবাদ দেয়া হলো না। এই মহিলার আচার-ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছিল উনি একজন অত্যন্ত কর্মঠ, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হাসিখুশি ধরনের মহিলা। পরে জানলাম ইনি একজন খুবই ইনএফিসিয়েন্ট মহিলা। তাঁর অকর্মণ্যতা ও অযোগ্যতার জন্যে পরের বছরই তাঁর চাকরি চলে যায়।

হোটেল গ্রেভার ইনে আমার জীবন শুরু হলো।

তিনতলা একটা হোটেল। পুরোনো ধরনের বিল্ডিং। এর সবই পুরোনো, কার্পেট পুরোনা, ঘরের বাতাসে পর্যন্ত একশ' বছর আগের গন্ধ। আমেরিকানরা ট্রাডিশনের খুব ভক্ত এটা বলা ঠিক হবে না। তবে ডাকোটা কান্ট্রির অনেক জায়গাতেই দেখেছি ওয়াইল্ড ওয়েস্ট ধরে রাখার একটা চেষ্টা। পুরোনো হোটেলগুলোকে পুরোনো করেই রাখা হয়েছে। দেয়ালে বাইসনের বড় বড় শিং। যত্ন করে ঝুলানো আগের আমলের পাইপ গান, বারুদের থলে। মেঝেতে বিছানো ভারী কার্পেটের রঙ বিবর্ণ। আমেরিকানরা হয়তো বা এসব দেখে নস্টালজিক হয়। আমি হলাম বিরক্ত। কোথায় এরা আমাকে এনে তুললো?

আমার ঘরটা দোতলায়। বিরাট ঘর। দুটো খাট পাশাপাশি বিছানো। ঘরে আসবাবপত্র কোনোটাই আমার মন কাড়লো না। তবে দেয়ালজোড়া পুরোনো কালের আয়নাটা অপূর্ব। যেন বাংলাদেশের দিঘির কালো জলকে জমিয়ে আয়না বানিয়ে দেয়ালে সাজিয়ে রেখেছে। এ রকম চমৎকার আয়না এ যুগে তৈরি হয় কিনা আমি জানি না।

আমার পাশের ঘরে থাকেন নব্বুই বা এক শ' বছরের একজন বুড়ি। এই হোটেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়াও বাইরের গেস্টরা ভাড়া দিয়ে থাকতে পারেন। লক্ষ করলাম গেস্টদের প্রায় সবাই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা শ্রেণীর। পরে জেনেছি, এদের অনেকেই জীবনের শেষের দিকে বছরের পর বছর হোটেলে কাটিয়ে দেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্যে নির্মিত ওল্ডহোমগুলো তাঁদের পছন্দ নয়। ওল্ড হোমগুলোতে তাঁরা হসপিটাল হসপিটাল গন্ধ পান। লোকজনও ওল্ট হাউসগুলোকে দেখে করুণার চোখে, এর চেয়ে হোটেলই ভালো।

পাশের ঘরের বৃদ্ধার নাম মনে পড়ছে না– সুসিন বা সুজি জাতীয় কিছু হবে। দেখতে অবিকল পথের পাঁচালির সত্যজিতের ছবির ইন্দিরা ঠাকরুণের মতো। মাথার চুল সেই রকম ছোটছোট করে কাটা, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া শরীর। শুধু পরনে শতছিন্ন শাড়ির বদলে স্কার্ট, ঠোঁটে লিপস্টিক। এই বৃদ্ধা, হোটেলে ঢোকার এক ঘন্টার মধ্যে আমার দরজায় নক করলেন। দরজা খোলামাত্র বললেন, সুপ্রভাত। তোমার কাছে কি ভারতীয় মুদ্রা আছে?

না।

স্ট্যাম্প আছে?

না, তা-ও নেই।

ও আচ্ছা। আমি মুদ্রা এবং স্ট্যাম্প দুটাই জমাই। এটা আমার হবি।

www.MurchOna.com

বৃদ্ধা বিমর্ষমুখে চলে গেলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এই মহিলা জীবনের শেষ কটি দিন স্ট্যাম্প বা মুদ্রা জমিয়ে যাচ্ছেন কেন বুঝতে পারলাম না। অন্য কোনো সঞ্চয় কি তাঁর জীবনে নেই? বৃদ্ধা চলে যাবার পর পরই হোটেলের লন্ড্রির লোক ঢুকলো। কালো আমেরিকান। এর নাম জর্জ ওয়াশিংটন। নিগ্রোদের মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের নাম অনুসারে নাম রাখার একটা প্রবণতা আছে। এই জর্জ ওয়াশিংটন সম্ভবত আমার গায়ের কৃষ্ণবর্ণের কারণে আমার প্রতি শুরুতেই গভীর মমতা দেখাতে শুরু করলো। গম্ভীর মুখে বললো, প্রথম এসেছো আমেরিকায়?

হ্যাঁ।

পড়াশোনার জন্যে?

হ্যাঁ।

নিজেদের দেশে পড়াশোনা হয় না যে এই পচা জায়গায় আসতে হয়?

আমি নিশ্চুপ। সে গলা নামিয়ে বলল, বুড়িগুলোর কাছ থেকে সাবধানে থাকবে, এরা বড় বিরক্ত করে। মোটেই পাত্তা দেবে না।

ঠিক আছে।

মদ্যপান করো?

না।

মাঝে-মধ্যে করতে পারো, এতে দোষের কিছু নেই। তবে মেয়েদের সঙ্গে মেশার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। হুকার (বেশ্যা)-দের নিয়ে বিছানায় যাবে না– অসুখ-বিসুখ হবে। তাছাড়া হুকারদের বেশিরভাগই হচ্ছে চোর, টাকা-পয়সা, ঘড়ি এইসব নিয়ে পালিয়ে যাবে। হুকার কি করে চিনতে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো।

আচ্ছা।

খাওয়া-দাওয়া কোথায় করবে? হোটেলে?

হুঁ।

খবরদার, এই হোটেলের রেস্টুরেন্টে খাবে না। রান্না কুৎসিত, দামও বেশি। দুই ব্লক পরে একটা হোটেল আছে নাম– বিফ এন্ড বান।

বিফ এন্ড বান?

হ্যাঁ। ঐখানে খাবার ভালো, দামেও সস্তা।

তোমাকে ধন্যবাদ।

ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। বিয়ে করেছো?

হ্যাঁ।

www.MurchOna.com

বউয়ের ছবি আছে?

আছে।

দেখাও।

আমি ছবি বের করে দেখালাম। জর্জ ওয়াশিংটন নানা ভঙ্গিতে ছবি দেখে বলল– অপূর্ব সুন্দরী। তুমি অতি ভাগ্যবান।

আমেরিকানদের অনেক কুৎসিত অভ্যাসের পাশে-পাশে অনেক সুন্দর অভ্যাসও আছে। যার একটি হচ্ছে, ছবি দেখে মুগ্ধ হবার ভান করা। আমি লক্ষ করেছি, অতিসামান্য পরিচয়েও এরা বলে– ফ্যামিলি ছবি সঙ্গে আছে? দেখি কেমন?

ছবিতে যদি তাড়কা রাক্ষসীর মতো কোনো দাঁত বের করা মহিলাও থাকে, এরা বলবে, অপূর্ব। তুমি ভাগ্যবান পুরুষ, লাকি ডগ।

এরা মানিব্যাগে ক্রেডিট কার্ডের পাশে নিজের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের ছবি রাখে। এর কোনো ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না বলেই আমার ধারণা। অবশ্যি স্ত্রী বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ছবিও বদলায়। নতুন স্ত্রীকে দিনের মধ্যে একশবার মধুর কণ্ঠে হানি ডাকে। সেই হানি এক সময় হেমলক হয়ে যায়, তখন খোঁজ পড়ে নতুন কোনো হানির। মানিব্যাগে আবার ছবি বদল হয়।

জর্জ ওয়াশিংটন চলে গেল। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত একা-একা নিজের ঘরে বসে রইলাম। কিছুই ভালো লাগে না। ঘরে চিঠি লেখার কাগজপত্র আছে। চিঠি লিখতে ইচ্ছে করলো না। সঙ্গে একটিমাত্র বাংলা বই– রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। ভেবেছিলাম একাকীত্বের জীবন গল্পগুলো পড়তে ভালো লাগবে। আমার প্রিয় গল্পের একটি পড়তে চেষ্টা করলাম–

... সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি এবং বউ বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড় যত্ন করিতেন এবং আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা আপনি বলাবলি করিতেন, আহা দুটিতে বেশ মানায়...

আমার এতো প্রিয় গল্প অথচ পড়তে ভালো লাগলো না, ইচ্ছে হলো হোটেলের জানালা খুলে নিচে লাফিয়ে পড়ি।

রাতে খেতে গেলাম 'বিফ এন্ড বান' রেস্টুরেন্টে। আলো ঝলমল ছোটখাট একটা রেস্টুরেন্ট। বিমানবালাদের মতো পোশাকের তিনটি ফুটফুটে তরুণী খাবার দিচ্ছে। অর্ডার নিচ্ছে। মাঝে-মাঝে রসিকতা করছে। এদের চেহারা যেমন সুন্দর কথাবার্তাও তেমনি মিষ্টি। আমেরিকান সুন্দরীরা কেমন তা দেখতে হলে এদের বার রেস্টুরেন্টে উঁকি দিয়ে ওয়েট্রেসদের দেখতে হয়।

www.MurchOna.com

আমি কোণার দিকের একটা টেবিলে বসলাম। আমার পকেটে আছে মাত্র পনেরো ডলার। উনিশশো বাহাত্তর সালের কথা, তখন দেশের বাইরে কুড়ি ডলারের বেশি নেয়া যেতো না। আমি কুড়ি ডলার নিয়েই বের হয়েছিলাম। পথে লোভে পড়ে এক কার্টুন মার্লবোরো সিগারেট কিনে ফেলায় ডলারের সঞ্চয় কমে গেছে। মেনু দেখে আঁতকে উঠলাম। সব খাবারের দাম আট ডলার নয় ডলার। স্টেক জাতীয় খাবারগুলোর দাম আরো বেশি। বেছে-বেছে সবচেয়ে কমদামী একটা খাবারের অর্ডার দিলাম– ফ্রেঞ্চ টোস্ট। দামে সস্তা, তাছাড়া চেনা খাবার। ওয়েট্রেস অবাক হয়ে বলো, এটাই কি তোমার ডিনার? আমি বললাম, ইয়েস।

সঙ্গে আর কিছু নেবে না? কোল্ড ড্রিংক কিংবা কফি?

নো।

রাতের খাবার শেষ করে একা-একা হোটেলের লাউঞ্জে বসে রইলাম। লাউঞ্জ প্রায় ফাঁকা। এক কোণায় দুইজন বুড়োবুড়ি ঝিম মেরে বসে আছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে জীবনের বাকি দিনগুলো কী করে কাটাবে এরা এই নিয়েই চিন্তিত। ওদের চেয়ে আমি নিজেকে আলাদা করতে পারলাম না।

পাশের ঘরেই হোটেলের বার। সেখানে উদ্দাম গান হচ্ছে। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নারী-পুরুষ জড়াজড়ি করে নাচছে। গানের কথাগুলো পরিষ্কার নয়। একটি চরণ বার বার ফিরে ফিরে আসছে– Whom do you want to love yea? Yea শব্দটির মানে কি কে জানে?

রাতে ঘুম এল না ভয়ে- ভূতের ভয়।

এই ভূতের ভয়ের মুল কারণ, আমার ঘরে রাখা হোটেল গ্রেভার ইন সম্পর্কে একটি তথ্য-পুস্তিকা। সেখানে আছে, এই পাথরের হোটেলটি কে প্রথম বানিয়েছিলেন সেই সম্পর্কে তথ্য। বিখ্যাত ব্যক্তি কারা-কারা এই হোটেলে ছিলেন তাঁদের নাম-ধাম। সেই সব বিখ্যাত ব্যক্তির কাউকেই চিনতে পারলাম না, তবে এই হোটেলে একটি ভৌতিক কক্ষ আছে জেনে আঁতকে উঠলাম। রুম নম্বর ৩০৯-এ একজন অশরীরী মানুষ থাকেন বলে একশ বছরের জনশ্রুতি আছে। যিনি এখানে বাস করেন তাঁর নাম জন পাউল। পেশায় আইনজীবী ছিলেন। এই হোটেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর হোটেলের মায়া কাটাতে পারেননি। পুস্তিকায় লেখা এই বিদেহী আত্মা অত্যন্ত শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের। কাউকে কিছুই বলেন না। গভীর রাতে পাইপ হাতে হোটেলের বারান্দা দিয়ে হেঁটে বেড়ান।

হোটেলের তিনশ নয় নম্বর কক্ষটিতে কোনো অতিথি রাখা হয় না। বছরের পর বছর এটা খালি থাকে, তবে রোজ পরিষ্কার করা হয়। বিছানার চাদর বদলে দেয়া হয়। বাথরুমে নতুন সাবান, টুথপেস্ট দেয়া হয়। ঘরের সামনে একটা সাইন

www.MurchOna.com

বোর্ড আছে, সেখানে লেখা– 'মি. জন পাউলের ঘর। নীরবতা পালন করুন। জন পাউল নীরবতা পছন্দ করেন।'

পুরো ব্যাপারটা একধরনের রসিকতা কিংবা আমেরিকানদের ব্যবসা-কৌশলের একটা অংশ, তবু রাত যতই বাড়তে লাগলো মনে হতে লাগলো এই বুঝি জন পাউল এসে আমার দরজায় দাঁড়িয়ে বলবেন– তোমার কাছে কি আগুন আছে? আমার পাইপের আগুন নিভে গেছে।

এমনিতেই ভয়ে কাঠ হয়ে আছি, তার উপর পাশের ঘরের বৃদ্ধা বিচিত্র সব শব্দ করছেন– এই খকখক করে কাশছেন, এই চেয়ার ধরে টানাটানি করছেন, গানের সিকি অংশ শুনছেন, দরজা খুলে বেরুচ্ছেন আবার ঢুকছেন। শেষ রাতের দিকে মনে হলো দেশ-গাঁয়ের মেয়েদের মতো সুর করে বিলাপ শুরু করেছেন।

নিঃসঙ্গ মানুষদের অনেক ধরনের কষ্ট থাকে।

পুরোপুরি না ঘুমিয়ে কেউ রাত কাটাতে পারে না। শেষ রাতের দিকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ঘুম আসে। কিন্তু আমার এল না। পুরো রাত চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলাম। ভোরবেলা আমার ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল টেলিফোন করলো ওয়াশিংটন সিয়াটল থেকে। সে আমার আগে এদেশে এসেছে। পি-এইচ-ডি করছে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে। পরিষ্কার লজিকের ঠাণ্ডা মাথার একটা ছেলে। ভাবালুতা কিংবা অস্থিরতার কিছুই তার মধ্যে নেই। জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণার ফাঁকে-ফাঁকে সে অসম্ভব সুন্দর কিছু লেখা লিখে ফেলেছে– কপোট্রনিক সুখ-দুঃখ, দীপু নাম্বার টু, হাত কাটা রবীন। প্রসঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছি, তবু বলার লোভ সামলাতে পারছি না। জাফর ইকবালের লেখা পড়লে ঈর্ষার সূক্ষ্ম খোঁচা অনুভব করি। এই ক্ষমতাবান প্রবাসী লেখক দেশে তাঁর যোগ্য সম্মান পেলেন না, এই দুঃখ আমার কোনোদিন যাবে না।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ইকবাল টেলিফোন করে খাস ময়মনসিংহের উচ্চারণে বললো– দাদাভাই কেমন আছো?

আমি বললাম, তুই আমার টেলিফোন নাম্বার কোথায় পেলি?

আমেরিকায় টেলিফোন নাম্বার পাওয়া কোনো সমস্যা না। তুমি কেমন আছো বল?

তোর কাছে ডলার আছে?

তোমাকে একশ ডলারের একটা ড্রাফট পাঠিয়ে দিয়েছি। আজই পাবে।

একশ ডলারে হবে না। তুই আমাকে একটা টিকিট কেটে দে আমি দেশে চলে যাবো।

আমার কথায় সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। সহজ গলায় বললো, যেতে

চাও কোনো অসুবিধা নেই টিকিট কেটে দেবো। কয়েকটা দিন যাক। একটু ঘুরে-ফিরে দেখো। এখানে বাংলাদেশী ছেলে নেই?

বাংলাদেশী ছেলে আমার কোনো দরকার নেই। তুই টিকিট কেটে পাঠা।

আচ্ছা পাঠাবো। তুমি কি পৌঁছার সংবাদ দেশে দিয়েছো? ভাবীকে চিঠি লিখেছো?

চিঠি লেখার দরকার কি আমি নিজেই তো যাচ্ছি।

তা ঠিক। তবু লিখে দাও। যেতে-যেতেও তো সময় লাগবে। আজই লিখে ফ্যালো। আর শোনো, তোমার যে খুব খারাপ লাগছে দেশে চলে যেতে চাচ্ছো এইসব না লিখলেই ভালো হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। ইকবাল বললো, রাতে তোমাকে আবার টেলিফোন করবো। আর আমি তোমাদের ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারকেও ফোন করে বলে দিচ্ছি যাতে তিনি বাংলাদেশী ছেলেদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করিয়ে দেন।

সেই সময় ফার্গো শহরে আর একজন মাত্র বাঙালি ছিলেন– সুফী সাহেব। তিনি এসেছেন এগ্রোনমিতে পি-এইচ-ডি করতে। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো রকম যোগাযোগ হলো না। দিনের বেলাটা ইউনিভার্সিটিতে খানিকক্ষণ ঘুরলাম। চারদিকে বড় বেশি ঝকঝকে, তকতকে। বড় বেশি গোছানো। বিশ্ববিদ্যালয় সামারের বন্ধ থাকলেও কিছু কিছু ক্লাস হচ্ছে। একটা ক্লাস রুমে উঁকি দিয়ে দেখি অনেক ছেলেমেয়ের হাতে কফির কাপ কিংবা কোল্ড ড্রিংকের বোতল। আরাম করে খাওয়া-দাওয়া করতে করতে অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনছে। পৃথিবীতে দু'ধনের মানুষ আছে। এক ধরনের কাছে বিদেশের সব কিছুই ভালো লাগে, অন্যদের কিছুই ভালো লাগে না। আমি দ্বিতীয় দলের। আমার কাছে কিছুই ভালো লাগে না। যা দেখি তাতেই বিরক্ত হই।

রাতে আবার খেতে গেলাম বিফ এন্ড বানে। সেই পুরাতন খাবার। ফ্রেঞ্চ টোস্ট। রুটিনটি হলো এ-রকম : সকালবেলা ইউনিভার্সিটি এলাকায় যাই। একা একা হাঁটাহাঁটি করি– যা দেখি তাই খারাপ লাগে। সন্ধ্যায় হোটেলে ফেরত আসি। রাতে খেতে যাই বিফ এন্ড বানে। ফ্রেঞ্চ টোস্টের অর্ডার দেই। অন্য কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। ডলারের অভাব এখন আর আমার নেই। ইউনিভার্সিটি আমাকে চারশ ডলার অগ্রিম দিয়েছে। সিয়াটল থেকে পাঠানো ছোট ভাইয়ের চেকটাও ভাঙিয়েছি। টাকার অভাব নেই। বিফ এন্ড বানে খাবারেরও অভাব নেই। কিন্তু কোনো খাবারই খেতে ইচ্ছা করে না। খেতে গেলেই চোখের সামনে ভাসে এক প্লেট ধবধবে সাদা ভাত– একটা বাটিতে সর্ষেবাটা দিয়ে রাঁধা ইলিশ। ছোট্ট পিরিচে কাঁচা লংকা, আধখান কাগজী লেবু। আমার প্রাণ হু-হু করে। ওয়েট্রেস

www.MurchOna.com

যখন অর্ডার নিতে আসে, আমি বলি ফ্রেঞ্চ টোস্ট। সে অবাক হয়ে তাকায়। হয়তো ইতিমধ্যে এই রেস্টুরেন্টে আমার নামই হয়ে গেছে 'ফ্রেঞ্চ টোস্ট'। আমি লক্ষ করছি– আমাকে দেখলেই ওয়েট্রেসরা নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওয়ি করে এবং এক সময় এসে কোমল গলায় বলে, সে-ই খাবার?

আমি বলি, ইয়েস।

ছটি দীর্ঘ রজনী কেটে গেল। তারপর চমৎকার একটা ঘটনা আমার জীবনে ঘটলো। ঘটনাটা বিশদভাবে বলা দরকার। এই ঘটনা না ঘটলে হয়তো আমি আমেরিকায় থাকতে পারতাম না। সব ছেড়েছুঁড়ে চলে আসতাম।

যথারীতি রাতে খাবার খেতে গিয়েছি। ওয়েট্রেস অর্ডার নিতে আমার কাছে আর আসছে না। আমার কেন জানি মনে হলো দূর থেকে সবাই কৌতূহলী ভঙ্গিতে আমাকে দেখছে। ফিসফাস করছে। তাদের দোষ দিচ্ছি না। দিনের পর দিন ফ্রেঞ্চ টোস্ট খেয়ে-খেয়ে আমিই এই অবস্থাটা তৈরি করেছি। একা অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর অর্ডার নিতে একটি মেয়ে এল। আমাকে অবাক করে দিয়ে বসলো আমার সামনের চেয়ারে। যে কথাগুলো সে আমাকে বললো তা শোনার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। মেয়েটি নিচু গলায় বললো,

দ্যাখো আহামাদ, আমরা জানি তোমার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। দিনের পর দিন তুমি একটা কুৎসিত খাবার মুখ বুঁজে খেয়ে যাচ্ছো। টাকা-পয়সার কষ্টের মতো কষ্ট তো আর কিছুই হতে পারে না। তবু বলছি, নিজের উপর বিশ্বাস রাখো। দুঃসময় একদিন অবশ্যই কাটবে।

আমি একবার ভাবলাম বলি, তোমরা যা ভাবছো ব্যাপারটা সে রকম নয়। পরমুহূর্তেই মনে হলো– এটা বলার দরকার নেই। এটা বলা মানেই এদের ভালোবাসার অপমান করা। আমি তা হতে দিতে পারি না।

মেয়েটি বললো, আজ তোমার জন্যে আমরা ভালো একটা ডিনারের ব্যবস্থা করেছি। এর জন্যে তোমাকে কোনো পয়সা দিতে হবে না। তুমি আরাম করে খাও এবং মনে সাহস রাখো।

সে উঠে গিয়ে বিশাল ট্রে-তে করে টি-বোন স্টেক নিয়ে এল। সঙ্গে নানান ধরনের টুকিটাকি। কফি এল, আইসক্রিম এল। ওয়েট্রেসরা সবাই একবার করে দেখে গেল আমি ঠিকমতো খাচ্ছি কিনা। আমি খুব আবেগপ্রবণ ছেলে, আমার চোখে পানি এসে গেল। এরা এতো মমতা একজন অচেনা-অজানা ছেলের জন্যে রেখে দিয়েছিল? মেয়েগুলো আমার চোখের জল দেখতে পেলেও ভান করলো যেন দেখতে পায়নি।

গভীর আনন্দ নিয়ে হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরে এলাম। রিসিপশনে বসে থাকা

www.MurchOna.com

গোমড়া মুখের মেয়েটাকে আজ অনেক ভালো লাগলো। আমি হাসিমুখে বললাম, হ্যালো।

সে-ও হাসিমুখে বললো হ্যালো।

গ্রেভার ইন বার-এর উদ্দাম গান আজ শুনতে ভালো লাগলো। ইচ্ছে করলো ভেতরে ঢুকে খানিকক্ষণ শুনি।

আমার পাশের বৃদ্ধার ঘরে নক করে তাঁকে বললাম– আমার কাছে দুটো বাংলাদেশী মুদ্রা আছে তুমি কি নেবে?

অনেক রাতে স্ত্রীকে চিঠি লিখতে বসলাম। সেই চিঠিটা খুব অদ্ভুত ছিল। কারণ চিঠিতে তুষারপাতের একটা বানানো বর্ণনা ছিল। তুষারপাত না দেখেই আমি লিখলাম– আজ বাইরে খুব তুষারপাত হচ্ছে। রাস্তাঘাট ঢেকে গেছে সাদা বরফে। সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য তুমি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি হোটেলের জানালার কাছে বসে-বসে লিখছি। তুমি পাশে থাকলে দুজন হাত ধরাধরি করে তুষারের মধ্যে দাঁড়াতাম।

যে তিনজন তরুণী আমেরিকা প্রসঙ্গে আমার ধারণাই বদলে দিলো আজ তাঁদের কথা গভীর মমতা ও গভীর ভালোবাসায় স্মরণ করছি। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র খণ্ডে আজ আমরা বিভক্ত। কতো দেশ, কতো নাম–কিন্তু মানুষ একই আছে। আসছে লক্ষ বছরেও তা-ই থাকবে।

www.MurchOna.com

ডানবার হলের জীবন

নর্থ ডাকোটা ইউনিভার্সিটির ক্লাসগুলো যেখানে হয় তার নাম ডানবার হল। ডানবার হলের তেত্রিশ নম্বর কক্ষে ক্লাস শুরু হলো। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্লাস। কোর্স নাম্বার ৫২৯।

কোর্স নাম্বারগুলি সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিয়ে নেই। টু হানড্রেড লেভেলের কোর্স হচ্ছে আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের নিচের দিকের ছাত্রদের জন্যে। থ্রি হানড্রেড লেভেল হচ্ছে আণ্ডার-গ্রাজুয়েটের উপরের দিকের ছাত্রদের জন্যে। ফোর হানড্রেড এবং ফাইভ হানড্রেড লেভেল হচ্ছে গ্রাজুয়েট লেভেল।

ফাইভ হানড্রেড লেভেলের যে কোর্সটি আমি নিলাম সে সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্প কিছু কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়েছি। একেবারে কিছুই যে জানি না তাও না। তবে এই বিষয়ে আমার বিদ্যা খুবই ভাসাভাসা। জলের উপর ওড়াউড়ি, জল স্পর্শ করা নয়।

একাডেমিক বিষয়ে নিজের মেধা এবং বুদ্ধির উপর আমার আস্থাও ছিল সীমাহীন। রসায়নের একটি বিষয় আমি পড়ে বুঝতে পারব না, তা হতেই পারে না।

আমাদের কোর্স কো-অর্ডিনেটর আমাকে বললেন, ফাইভ হানড্রেড লেভেলের এই কোর্সটি যে তুমি নিচ্ছ, ভুল করছ না তো? পারবে?

আমি বললাম, ইয়েস।

তখনো ইয়েস এবং নো-র বাইরে তেমন কিছু বলা রপ্ত হয়নি। কোর্স কো-অর্ডিনেটর বললেন, এই কোর্সে ঢুকবার আগে কিন্তু ফোর হানড্রেড লেভেলের কোর্স শেষ করনি। ভালো করে ভেবে দেখ, পারবে?

ইয়েস।

কোর্স কো-অর্ডিনেটরের মুখ দেখে মনে হলো তিনি আমার ইয়েস শুনেও বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন না।

ক্লাস শুরু হলো। ছাত্র সংখ্যা পনেরো। বিদেশী বলতে আমি এবং ইন্ডিয়ান

এক মেয়ে– কান্তা। ছাত্রদের মধ্যে একজন অন্ধ ছাত্রকে দেখে চমকে উঠলাম। সে তার ব্রেইলি টাইপ রাইটার নিয়ে এসেছে। ক্লাসে ঢুকেই সে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আমি বক্তৃতা টাইপ করব। খটখট শব্দ হবে, এ জন্যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি আমি হতভম্ব। অন্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে এটা আমি জানি। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছু অন্ধ ছাত্র-ছাত্রী আছে, তবে তাদের বিষয় হচ্ছে সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা বা দর্শন। কিন্তু থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রিও কেউ পড়তে আসে আমার জানা ছিল না।

আমাদের কোর্স টিচারের নাম, মার্ক গর্ডন। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মস্তান লোক। থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রির লোকজন তাঁর নাম শুনলে চোখ কপালে তুলে ফেলে। তাঁর খ্যাতি প্রবাদের পর্যায়ে চলে গেছে।

লোকটি অসম্ভব রোগা এবং তালগাছের মতো লম্বা। মুখ ভর্তি প্রকাণ্ড গোঁফ। ইউনিভার্সিটিতে আসেন ভালুকের মতো বড় একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি যখন ক্লাসে যান কুকুরটা তাঁর চেয়ারে পা তুলে বসে থাকে।

মার্ক গর্ডন ক্লাসে ঢুকলেন একটা টি শার্ট গায়ে দিয়ে। সেই টি শার্টে যা লেখা, তার বঙ্গানুবাদ হলো, সুন্দরী মেয়েরা আমাকে ভালোবাসা দাও।

ক্লাসে ঢুকেই সবার নামধাম জিজ্ঞেস করলেন। সবাই বসে বসে উত্তর দিল। একমাত্র আমি দাঁড়িয়ে জবাব দিলাম। মার্ক গর্ডন বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন? বসে কথা বলতে কি তোমার অসুবিধা হয়?

আমি জবাব দেবার আগেই কান্তা বলল, এটা হচ্ছে ভারতীয় ভদ্রতা।

মার্ক গর্ডন বলেন, হুমায়ুন তুমি কি ভারতীয়?

না। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি।

ও আচ্ছা, আচ্ছা। বাংলাদেশ। বস। এর পর থেকে বসে বসে কথা বলবে।

আমি বসলাম। মানুষটাকে ভালো লাগল এই কারণে যে সে শুদ্ধভাবে আমার নাম উচ্চারণ করেছে। অধিকাংশ আমেরিকান যা পারে না কিংবা শুদ্ধ উচ্চারণের চেষ্টা করে না। আমাকে যে সব নামে ডাকা হয় তার কয়েকটি হচ্ছে : হামায়ান, হিউমেন, হেমনি।

মার্ক গর্ডন টেবিলে পা তুলে বসলেন এবং বললেন, ক্লাস শুরু করার আগে একটা জোক বলা যাক। আমি আবার ডার্টি জোক ছাড়া অন্য কিছু জানি না। যারা ডার্টি জোক শুনতে চাও না, তারা দয়া করে কান বন্ধ করে ফেল।

গল্পটি হচ্ছে এক ফরাসি তরুণীকে নিয়ে যার একটি স্তন বড় অন্যটি ছোট। বিয়ের রাতে তার স্বামী..

গল্পটি চমৎকার, তবে এ দেশে তা আমার পক্ষে লেখা সম্ভব না বলে শুধু

শুরুটা বললাম। গল্প শেষ হবার পর হাসি থামতে পাঁচ মিনিটের মতো লাগল। শুধু কান্তা হাসল না, মুখ লাল করে বসে রইল। যেন পুরো রসিকতাটা তাকে নিয়েই করা হয়েছে।

মার্ক গর্ডন লেকচার শুরু করলেন। ক্লাসের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। বক্তৃতার শেষে তিনি বললেন, সহজ ব্যাপারগুলি নিয়ে আজ কথা বললাম, প্রথম ক্লাস তো তাই।

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কিছু বুঝতে পারিনি। তিনি ব্যবহার করছেন গ্রুপ থিওরি, যে গ্রুপ থিওরির আমি কিছুই জানি না।

আমি আমার পাশে বসে থাকা আমেরিকান ছাত্রটিকে বললাম, তুমি কি কিছু বুঝতে পারলে?

সে বিস্মিত হয়ে বলল, কেন বুঝব না, এসব তো খুবই এলিমেন্টারি ব্যাপার। এক সপ্তাহ চলে গেল। ক্লাসে যাই, মার্ক গর্ডনের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকি। কিছু বুঝতে পারি নাই। নিজের মেধা এবং বুদ্ধির উপর যে আস্থা ছিল তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর প্রচুর বই জোগাড় করলোম। রাত দিন পড়ি। কোনও লাভ হয় না। এই জিনিস বোঝার জন্য ক্যালকুলাসের যে জ্ঞান দরকার তা আমার নেই। আমার ইনসমনিয়ার মতো হয়ে গেল। ঘুমুতে পারি না। গ্রেভার ইনের লবিতে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকি। মনে মনে বলি–কী সর্বনাশ।

আমার পাশের ঘরের বৃদ্ধা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, তোমার কি হয়েছে বলতো? তুমি কি অসুস্থ? স্ত্রীর চিঠি পাচ্ছ না?

দেখতে দেখতে ডিম-টার্ম পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার পর পর যে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে তা ভেবে হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাবার জোগাড় হ'ল। মার্ক গর্ডন যখন দেখবে বাংলাদেশের এই ছেলে পরীক্ষার খাতায় কিছুই লেখেনি তখন তিনি কি ভাববেন? ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানই বা কী ভাববেন?

এই চেয়ারম্যানকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সভাপতি প্রফেসর আলি নওয়াব আমার প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে লিখেছেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ যে অল্প সংখ্যক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র তৈরি করেছে, হুমায়ুন আহমেদ তাদের অন্যতম।

অসাধারণ মেধাবী ছাত্রটি যখন শূন্য পাবে তখন কী হবে? রাতে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

মিড-টার্ম পরীক্ষায় বসলাম। সব মিলিয়ে দশটি প্রশ্ন।

এক ঘণ্টা সময়ে প্রতিটির উত্তর করতে হবে। আমি দেখলাম একটি প্রশ্নের

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

অংশবিশেষের উত্তর আমি জানি, আর কিছুই জানি না। অংশবিশেষের উত্তর লেখার কোনো মানে হয় না। আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। এক ঘণ্টা পর সাদা খাতা জমা দিয়ে বের হয়ে এলাম।

পরদিনই রেজাল্ট হ'ল। এ-তো আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় যে পনেরোটি খাতা দেখতে পনেরো মাস লাগবে।

তিনজন এ পেয়েছে। ছ'জন বি। বাকি সব সি। বাংলাদেশের হুমায়ূন আহমেদ পেয়েছে শূন্য। সবচে বেশি নম্বর পেয়েছে অন্ধ ছাত্রটি। [এ ছেলেটির নাম আমার মনে পড়ছে না। তার নামটা মনে রাখা উচিত ছিল।]

মার্ক গর্ডন আমাকে ডেকে পাঠালেন। বিস্মিত গলায় বললেন, ব্যাপারটা কী বলতো?

আমি বললাম, কোয়ান্টাম মেকানিক্সে আমার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না। এই হায়ার লেভেলের কোর্স আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছ না তাহলে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? ঝুলে থাকার মানে কী?

আমি ছাড়তে চাই না।

তুমি বোকামি করছ। তোমার গ্রেড যদি খারাপ হয়, যদি গড় গ্রেড সি চলে আসে তাহলে তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হবে। গ্রাজুয়েট কোর্সের এ-ই নিয়ম।

এই নিয়ম আমি জানি।

জেনেও তুমি এই কোর্সটা চালিয়ে যাবে?

হ্যাঁ।

তুমি খুবই নির্বোধের মতো কথা বলছ।

হয়ত বলছি। কিন্তু আমি কোর্সটা ছাড়ব না।

কারণটা বল।

একজন অন্ধ ছাত্র যদি এই কোর্সে সবচে বেশি নম্বর পেতে পারে আমি পারব না কেন? আমার তো চোখ আছে।

তুমি আবারো নির্বোধের মতো কথা বলছ। সে অন্ধ হতে পারে কিন্তু তার এই বিষয়ে চমৎকার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। সে আগের কোর্স সবগুলি করেছে। তুমি করনি। তুমি আমার উপদেশ শোন। এই কোর্স ছেড়ে দাও।

না।

আমি ছাড়লাম না। নিজে নিজে অংক শিখলাম। গ্রুপ থিওরি শিখলাম, অপারেটর এলজেব্রা শিখলাম। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই এই প্রবাদটি সম্ভবত ভুল নয়। এক সময় অবাক হয়ে লক্ষ করলাম কোয়ান্টাম মেকানিক্স বুঝতে শুরু করেছি।

www.MurchOna.com

ফাইন্যাল পরীক্ষায় যখন বসলাম তখন আমি জানি আমাকে আটকানোর কোনো পথ নেই। পরীক্ষা হয়ে গেল। পরদিন মার্ক গর্ডন একটি চিঠি লিখে আমার মেইল বক্সে রেখে দিলেন। টাইপ করা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে :

– তুমি যদি আমার সঙ্গে থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে কাজ কর তাহলে আমি আনন্দিত হব এবং তোমার জন্যে আমি একটি ফেলোশিপ ব্যবস্থা করে দেব। তোমাকে আর কষ্ট করে টিচিং অ্যাসিসটেন্টশিপ করতে হবে না।

একটি পরীক্ষা দিয়েই আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিত হয়ে গেলাম। বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিজের উদ্যোগে ব্যবস্থা করে দিলেন যেন আমি আমার স্ত্রীকে আমেরিকায় নিয়ে আসতে পারি।

পরীক্ষায় কত পেয়েছিলাম তা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। পাঠক-পাঠিকারা আমার এই লোভ ক্ষমার চোখে দেখবেন বলে আশা করি। আমি পেয়েছিলাম ১০০ তে ১০০।

বর্তমানে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি পড়াই। ক্লাসের শুরুতে ছাত্রদের এই গল্পটি বলি। শ্রদ্ধা নিবেদন করি ঐ অন্ধ ছাত্রটির প্রতি, যার কারণে আমার পক্ষে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।

আরেকটি কথা, আমি কিন্তু মার্ক গর্ডনের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হইনি। এই বিষয়টি নিয়ে আর কষ্ট করতে ইচ্ছা করছিল না, তাছাড়া আমার খানিকটা কুকুরভীতি আছে। মার্ক গর্ডনের ভালুকের মতো কুকুরটিকে পাশে নিয়ে কাজ করার প্রশ্নই উঠে না।

www.MurchOna.com
===

বাংলাদেশ নাইট

ভোর চারটার সময় টেলিফোন বেজে উঠল, অসময়ে টেলিফোন মানেই রিসিভার না নেয়া পর্যন্ত বুক ধড়ফড়। নির্ঘাৎ বাংলাদেশের কল। একগাদা টাকা খরচ করে কেউ যখন বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় কল করে তখন ঘটনা খারাপ ধরেই নিতে হবে। নিশ্চয়ই কেউ মারা-টারা গেছে।

তিনবার রিং হবার পর আমি রিসিভার তুলে ভয়ে ভয়ে বললাম, হ্যালো।

ওপার থেকে ভারী গলা শোনা গেল, হুমায়ুন ভাই, খিচুড়ি কি করে রান্না করতে হয় জানেন?

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। টেলিফোন করেছে মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির মিজানুল হক। সেখানকার একমাত্র বাঙালি ছাত্র। অ্যাকাউন্টিং-এ আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স করছে।

হ্যালো হুমায়ুন ভাই, কথা বলছেন না কেন? খিচুড়ি কী করে রান্না করতে হয় জানেন?

না।

তাহলে তো বিগ প্রবলেম হয়ে গেল।

আমি চুপ করে রইলাম। মিজানুল হক হড়বড় করে বলল, কাচ্চি বিরিয়ানির প্রিপারেশন জানা আছে?

আমি শীতল গলায় বললাম, কটা বাজে জান?

ক'টা?

রাত চারটা।

বলেন কি? এতরাত হয়ে গেছে? সর্বনাশ।

করছিলে কি তুমি?

বাংলাদেশের ম্যাপ বানাচ্ছি। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন হুমায়ুন ভাই। সকালে টেলিফোন করব, বিরাট সমস্যায় পড়েছি।

মিজানুল হক খট করে টেলিফোন রেখে দিল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

www.MurchOna.com

পার্কোলেটরে কফি বসিয়ে দিলাম। আমার ঘুমাবার চেষ্টা করা বৃথা। মিজানুল হকের মাথার ঠিক নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার টেলিফোন করবে। অন্য কোনও খাবারের রেসিপি জানতে চাইবে।

এ ব্যাপারটা গত তিন দিন ধরে চলছে। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অন্যান্য দেশের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হবে বাংলাদেশ নাইট। এই অঞ্চলে বাংলাদেশের একমাত্র ছাত্র হচ্ছে মিজান, আর আমি আছি নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। মিজানের একমাত্র পরামর্শদাতা। আশপাশে সাতশ মাইলের মধ্যে দ্বিতীয় বাঙালি নেই।

কফির পেয়ালা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মিজানের টেলিফোন–

হ্যালো হুমায়ুন ভাই?

হ্যাঁ।

প্ল্যান-প্রোগ্রাম নিয়ে আপনার সঙ্গে আরেকবার বসা দরকার।

এখনো তো দেরি আছে।

দেরি আপনি কোথায় দেখলেন? এক সপ্তাহমাত্র। শালাদের একটা ভেলকি দেখিয়ে দেব। বাংলাদেশ বললে চিনতে পারে না, হা-করে তাকিয়ে থাকে। ইচ্ছা করে চড় মেরে মুখ বন্ধ করে দেই। এইবার শালারা বুঝবে বাংলাদেশ কি জিনিস। ঠিক না হুমায়ুন ভাই?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

শালাদের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে দেখবেন। আমি আপনার এখানে চলে আসছি।

মিজান টেলিফোন নামিয়ে রাখলো। আমি আরেকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। এই ছেলেটিকে আমি খুবই পছন্দ করি। তার সমস্যা একটাই, সারাক্ষণ মুখে– বাংলাদেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন একটা খোলার চেষ্টা করেছিল। একজন ছাত্র থাকলে এসোসিয়েশন হয় না বলে সেই চেষ্টা সফল হয়নি। অন্য স্টেট থেকে বাংলাদেশী ছাত্র আনার চেষ্টাও করেছে, লাভ হয়নি। এই প্রচণ্ড শীতের দেশে কেউ আসতে চায় না। শীতের সময় এখানকার তাপমাত্রা শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রি নিচে নেমে যায়, কে আসবে এই রকম ভয়াবহ ঠাণ্ডা একটা জায়গায়?

মিজান এই ব্যাপারে বেশ মনমরা হয়েছিল। বাংলাদেশ নাইট-এর ব্যাপারটা এসে পড়ায় সেই দুঃখ খানিকটা কমেছে। এই বাংলাদেশ নাইট নিয়েও বিরাট কাণ্ড। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার মিজানকে বলল, তুমি এক কাজ কর– তুমি বাংলাদেশ নাইট পাকিস্তানীদের সঙ্গে কর।

www.MurchOna.com

মিজান হুংকার দিয়ে বলল, কেন?

এতে তোমার সুবিধা হবে। ডবল ডেকোরেশন হবে না। এক খরচায় হয়ে যাবে। তুমি একা মানুষ।

তোমার এত বড় সাহস, তুমি পাকিস্তানীদের সঙ্গে আমাকে বাংলাদেশ নাইট করতে বলছ? তুমি কি জান, ওরা কী করেছে? তুমি কি জান ওরা আমাদের কতজনকে মেরেছে? তুমি কি জান...?

কী মুশকিল– তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?

তুমি আজেবাজে কথা বলবে, তুমি আমার দেশকে অপমান করবে, আর আমি তোমার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলব?

মিজান, ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারের সামনের টেবিলে প্রকাণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল। টেবিলে রাখা কফির পেয়ালা উল্টে পড়ল। লোকজন ছুটে এল। প্রচণ্ড হৈচৈ।

এরকম মাথা গরম একটা ছেলেকে সব সময় সামলে-সুমলে রাখা মুশকিল। তবে ভরসা একটাই– সে আমাকে প্রায় দেবতার পর্যায়ে ফেলে রেখেছে। তার ধারণা আমার মতো জ্ঞানী-গুণী মানুষ শতাব্দীতে এক-আধটা জন্মায়। আমি যা বলি, শোনে।

মিজান তার ভাঙা মরিস মাইনর নিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে এল। সঙ্গে বাংলাদেশের ম্যাপ নিয়ে এসেছে। সেই ম্যাপ দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। যে কটা রঙ পাওয়া গেছে সব কটাই সে লাগিয়েছে।

জিনিসটা দাঁড়িয়েছে কেমন বলুন তো?

রঙ একটু বেশি হয়ে গেল না?

ওরা রঙ-চঙ একটু বেশি পছন্দ করে হুমায়ূন ভাই।

তাহলে ঠিকই আছে।

এখন আসুন প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলা যাক। বাংলাদেশী খাবারের নমুনা হিসাবে খিচুড়ি খাওয়ানো হবে। খিচুড়ির শেষে দেওয়া হবে পান-সুপারি।

পান-সুপারি পাবে কোথায়?

শিকাগো থেকে আসবে। ইন্ডিয়ান শপ আছে– ওরা পাঠাবে। ডলার পাঠিয়ে চিঠি দিয়ে দিয়েছি।

খুব ভালো।

দেশ সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দেয়া হবে। বক্তৃতার শেষে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব। সবার শেষে জাতীয় সঙ্গীত।

জাতীয় সঙ্গীত গাইবে কে

www.MurchOna.com

কেন, আমি আর আপনি।

তুমি পাগল হয়েছ? জীবনে আমি কোনোদিন গান গাইনি।

আর আমি বুঝি হেমন্ত? এইসব চলবে না, হুমায়ুন ভাই। আসুন গানটা একবার প্রাকটিস করি।

মিজান, মরে গেলেও আমাকে দিয়ে গান গাওয়াতে পারবে না। তাছাড়া এই গানটার আমি কথা জানি না, সুর জানি না।

কথা সুর তো আমিও জানি না হুমায়ূন ভাই। চিন্তা নেই, একটা ব্যবস্থা হবেই।

উৎসবের দিন ভোর বেলাতে আমরা প্রকাণ্ড সসপ্যানে খিচুড়ি বসিয়ে দিলাম। চাল, ডাল, আনাজপাতি সেদ্ধ হচ্ছে। দুটো মুরগি কুচি কুচি করে ছেড়ে দেয়া হলো। এক পাউন্ডের মতো কিমা ছিল তাও ঢেলে দিলাম। যত ধরনের গরম মসলা ছিল সবই দিয়ে দিলাম। জ্বাল হতে থাকল।

মিজান বলল, খিচুড়ির আসল রহস্য হলো মিক্সিং-এ। আপনি ভয় করবেন না। জিনিস ভালোই দাঁড়াবে।

সে একটা খুন্তি দিয়ে প্রবল বেগে নাড়াতে শুরু করল। ঘণ্টা দুয়েক পর যা দাঁড়াল তা দেখে বুকে কাঁপন লাগে। ঘন সিরাপের মতো একটা তরল পদার্থ। উপরে আবার দুধের সরের মতো সর পড়েছে। জিনিসটার রঙ দাঁড়িয়েছে ঘন কৃষ্ণ। মিজান শুকনো গলায় বলল, কালো হলো কেন বলুন তো হুমায়ূন ভাই। কালো রঙের কিছুই তো দেইনি।

আমি সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। মিজান বলল, টমেটো পেস্ট দিয়ে দেব নাকি?

দাও।

টমেটো পেস্ট দেয়ায় রঙ আরো কালচে মেরে গেল। মিজান বলল, লাল রঙয়ের কিছু পুড কালার কিনে এনে ছেড়ে দেব?

দাও।

তাও দেয়া হলো। এতে কালো রঙের কোনো হেরফের হলো না। তবে মাঝে মাঝে লাল রঙ ঝিলিক দিতে লাগলো। দু'জনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। জাতীয় সংগীতেরও কোনো ব্যবস্থা হলো না। মিজানের গানের গলা আমার চেয়েও খারাপ। যখন গান ধরে মনে হয় গলায় সর্দি নিয়ে পাতিহাঁস ডাকছে। শিকাগো থেকে পানও এসে পৌঁছল না।

অনুষ্ঠান সন্ধ্যায়। বিকেলে এক অদ্ভুত ব্যাপার হলো। অবাক হয়ে দেখি দূর

www.MurchOna.com

দূর থেকে গাড়ি নিয়ে বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করেছে। শুনলাম মিজান নাকি আশপাশের যত ইউনিভার্সিটি আছে সব ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশ নাইটের খবর দিয়ে চিঠি দিয়েছিল। দেড় হাজার মাইল দূরে মন্টানো স্টেট ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে একটি মেয়ে গ্রে হাউন্ড বাসে করে একা একা চলে এসেছে। মিনেসোটা থেকে এসেছে দশজনের একটা বিরাট দল। তারা সঙ্গে নানান রকম পিঠা নিয়ে এসেছে। গ্রান্ড ফোকস থেকে এসেছেন করিম সাহেব, তাঁর ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী। এই অসম্ভব কর্মঠ মহিলাটি এসেই আমাদের খিচুড়ি ফেলে দিয়ে নতুন খিচুড়ি বসালেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে সাউথ ডাকোটার ফলস স্প্রিং থেকে একদল ছেলেমেয়ে এসে উপস্থিত হ'ল।

মিজান আনন্দে লাফাবে না চেঁচাবে কিছুই বুঝতে পারছে না। চুপচাপ বসে আছে, মাঝে মাঝে গম্ভীর গলায় বলছে– দেখ শালা বাংলাদেশ কী জিনিস। শালা দেখে যা।

অনুষ্ঠান শুরু হ'ল দেশাত্মবোধক গান দিয়ে।

–এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি..।

অন্যান্য স্টেট থেকে মেয়েরা যারা এসেছে তারাই শুধু গাইছে। এত সুন্দর গাইছে। এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে গান শুনে দেশের জন্যে আমার বুক হু-হু করতে লাগল। চোখে জল এসে গেল। কেউ যেন তা দেখতে না পায় সে জন্যে মাথা নিচু করে বসে রইলাম।

পরদিন ফার্গো ফোরম পত্রিকায় বাংলাদেশ নাইট সম্পর্কে একটা খবর ছাপা হ'ল। খবরের অংশবিশেষ এ রকম– একটি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ জাতির অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় দেশের গান দিয়ে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম গান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশী ছেলেমেয়েরা সব কাঁদতে শুরু করল। আমি আমার দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতা-জীবনে এমন মধুর দৃশ্য দেখিনি...।

www.MurchOna.com
==

কিসিং বুথ

অমেরিকানদের বিচিত্র কাণ্ডকারখানার গল্প বলার সময় কিসিং বুথের গল্পটা আমি খুব আগ্রহ করে বলি। শ্রোতারা চোখ বড় বড় করে শোনে। যুবক বয়েসীরা গল্প শেষ হবার পর মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হয়ত-বা ভাবে, আহা তারা কী সুখেই না আছে।

গল্পটা বলা যাক।

আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে "হোম কামিং" বলে একটি উৎসব হয়। এই উৎসবে আনন্দ মিছিল হয়, হৈচৈ গান-বাজনা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচে সুন্দরী ছাত্রীটিকে হোম কামিং কুইন নির্বাচিত করা হয়। এই হোম কামিং রানীকে ঘিরে সারাদিন ধরে চলে আনন্দ-উল্লাস।

আমার আমেরিকাবাসের প্রথম বর্ষে হোম কামিং কুইন হলো আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ক্লাসের এক ছাত্রী। স্পেনিশ আমেরিকান, রূপ ফেটে পড়ছে। কিছুক্ষণ এই মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলে বুকের মধ্যে এক ধরনের হাহাকার জমে উঠতে থাকে, জগৎ-সংসার তুচ্ছ বোধ হয়। সম্ভবত এই শ্রেণীর রূপবতীদের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে, মুনীগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।

মেয়েটিকে নিয়ে ভোর এগারোটার দিকে একটা মিছিল বের হ'ল। আমার ইচ্ছা করল মিছিলে ভীড়ে যাই। শেষ পর্যন্ত লজ্জা লাগল। ল্যাবরেটরিতে চলে এলাম। অনেকগুলি স্যাম্পল জমা হয়েছে। এদের এক্সরে ডিফ্রেকশান প্যাটার্ন জানাতে হবে। ডিফ্রেকশান মেশিনটা ভালো কাজ করছে না। ছবি পরিষ্কার আসছে না। দুপুর একটা পর্যন্ত কাজ করলাম। ঠিক করে রাখলাম লাঞ্চ সারার জন্যে আধ ঘণ্টার বিরতি দেব।

মেমোরিয়াল ইউনিয়নে লাঞ্চ খেতে গিয়েছি। লক্ষ করলাম মেমোরিয়াল ইউনিয়নের দোতলায় অস্বাভাবিক ভীড়। কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেলাম।

জটলা আমাদের হোম কামিং কুইনকে ঘিরেই। এই রূপবতী বড় বড় পোস্টার সাজাচ্ছে। পোস্টারগুলিতে লেখা : নীল তিমিরা আজ বিপন্ন। নীল তিমিদের বাঁচান।

www.MurchOna.com

জানা গেল এই হোম কামিং কুইন– নীল তিমিদের বাঁচাও– সংঘের একজন কর্মী। সে আজ নীল তিমিদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করবে।

নীল তিমিদের ব্যাপারে আমি তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করলাম না। মানুষই যেখানে বিপন্ন সেখানে নীল তিমি নিয়ে লাফালাফি করার কোনো অর্থ হয় না। তবু দাঁড়িয়ে আছি। রূপবতী মেয়েটির আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি দেখতে ভালো লাগছে।

আমি লক্ষ করলাম, কাঠগড়ার মতো একটা বেষ্টনী তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে লাল কালিতে ঠোটের ছবি এঁকে নিচে লেখা হ'ল "কিসিং বুথ"–চুম্বন কক্ষ। তার নিচে লেখা চুমু খাবার নিয়মকানুন।

(১) জড়িয়ে ধরবেন না, মুখ বাড়িয়ে চুমু খান।

(২) চুমু খাবার সময় খুবই সংক্ষিপ্ত।

(৩) প্রতিটি চুমু এক ডলার।

(৪) চেক গ্রহণ করা হবে না। ক্যাশ দিতে হবে।

(৫) বড় নোট গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যাপারটা কী কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার পাশে দাঁড়ানো আমেরিকান ছাত্র বুঝিয়ে দিল।

হোম কামিং কুইন কিসিং বুথে দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্যরা তাকে চুমু খাবে এবং প্রতিটি চুমুতে এক ডলার করে দেবে। সেই ডলার চলে যাবে নীল তিমি বাঁচাও ফান্ডে।

আমি হতভম্ব।

প্রথমে মনে হলো পুরো ব্যাপারটাই হয়ত এক ধরনের রসিকতা। আমেরিকানরা রসিকতা পছন্দ করে। এটাও বোধ হয় মজার রসিকতা।

দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই রসিকতা নয়। মেয়েটি কিসিং বুথে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে লাইন। এক একজন এগিয়ে আসছে, ডলার দিচ্ছে, মেয়েটিকে চুমু খেয়ে সরে যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে দ্বিতীয় জন। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি।

মেয়েটির মুখ হাসি হাসি। তার নীল চোখ ঝকমক করছে। যেন পুরো ব্যাপারটায় সে খুবই আনন্দ পাচ্ছে। আনন্দ ছেলেরাও পাচ্ছে। একজনকে দেখলাম দশ ডলারের একটা নোট দিয়ে পর পর দশবার চুমু খেল। এতেও তার স্বাদ মিটল না। মানি ব্যাগ খুলে বিশ ডলারের আরেকটি নোট বের করে উঁচু করে সবাইকে দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাত তালি, যার মানে চালিয়ে যাও।

ইউনিভার্সিটির মেথর, ঝাড়ুদার এরাও ডলার নিয়ে এগিয়ে এল। এরা বেশ

গম্ভীর। যেন কোনো পবিত্র দায়িত্ব পালন করছে। চুমু খেল খুবই শালীন ভঙ্গিতে– মন্দিরের দেবীমূর্তিকে চুমু খাবার ব্যবস্থা থাকলে হয়ত এভাবেই খাওয়া হ'ত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতীয় ছাত্ররা চলে এল। এরা চুমু খাবার লাইনে দাঁড়াল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকাতে লাগল। এ ওকে ঠেলাঠেলি করছে। কেউ যেতে চাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত একজন এগিয়ে এল, এর নাম উমেশ। বোম্বের ছেলে। মানুষ যে বানর থেকে এসেছে এটা উমেশকে দেখলেই বোঝা যায়। তার জন্যে ডারউইনের বই পড়তে হয় না। উমেশ চুমু খাবার পর পরই অন্য ভারতীয়দের লজ্জা ভেঙে গেল। তারাও লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ল্যাবোরেটরিতে চলে এলাম। আমার প্রফেসর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই এক্সরের কাজ কী হচ্ছে তার খোঁজ নিতে এলেন। ডিফেকশন প্যাটার্ন দেখতে দেখতে বললেন, তুমি কি এ মেয়েটিকে চুমু খেয়েছ?

আমি বললাম, না।

না কেন? মাত্র এক ডলারে এমন রূপবতী একটি মেয়েকে চুমু খাবার সুযোগ নষ্ট করা কি উচিত?

আমি বললাম, এভাবে চুমু খাওয়াটা আমাদের দেশের নীতিমালায় বাধা আছে।

বাধা কেন? চুমু হচ্ছে ভালোবাসার প্রকাশ। তুমি যদি তোমার শিশুকন্যাকে প্রকাশ্যে চুমু খেতে পার তাহলে একটি তরুণীকে চুমু খেতে পারবে না কেন? মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ভালোবাসা।

আমি বললাম, এই মেয়েটির ব্যাপারে তো ভালোবাসার প্রশ্ন আসছে না।

তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, আসবে না কেন? এই মেয়েটিকে তুমি হয়তো ভালোবাসছ না, কিন্তু তার রূপকে তুমি ভালোবাসছ। বিউটি ইজ ট্রুথ। তাই নয় কি?

আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, একটি নির্জন দ্বীপে যদি তোমাকে এ মেয়েটির সঙ্গে ছেড়ে দেয়া হতো তাহলে তুমি কী করতে? চুপ করে বসে থাকতে?

আমি নিচু গলায় বললাম, মুনীগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।

অধ্যাপক বিরক্ত গলায় বললেন, এর মানে কি?

আমি ইংরেজীতে তাঁকে ব্যাখ্যা করে দিলাম। অধ্যাপক পরম প্রীত হলেন।

আমি বললাম, তুমি কি চুমু খেয়ে এসেছ?

না। এখন ভীড় বেশি। ভীড়টা কমলেই যাব।

বিকেল চারটায় এক্সরে টেকনিশিয়ান ছুটে এসে বলল, বসে আছো কেন? এক্ষুণি মেমোরিয়েল ইউনিয়নে চলে যাও। কুইক। কুইক।

www.MurchOna.com

কেন?

চারটা থেকে চারটা ত্রিশ, এই আধঘণ্টার জন্যে চুমুর দাম কমানো হয়েছে। এই আধঘণ্টার জন্যে ডলারে দুটো করে চুমু।

টেকনিশিয়ান যেমন ঝড়ের গতিতে এসেছিল তেমনি ঝড়ের গতিতেই চলে গেল। আমি গেলাম দেখতে। লাইন এখনও আছে। লাইনের শুরুতেই উমেশকে দেখা গেল। সে মনে হয় লাইনে লাইনেই আজকের দিনটা কাটিয়ে দিচ্ছে। আমার প্রফেসরকেও দেখলাম। এক ডলারের একটা নোট হাতে দাঁড়িয়ে। তিনি আমাকে দেখে হাত ইশারা করে ডাকলেন।

গল্পটা আমি এই জায়গাতে শেষ করে দেই। শ্রোতারা ব্যাকুল হয়ে জানতে চায়, আপনি কি করলেন? দাঁড়ালেন লাইনে?

আমি তাদের বলি, আমি লাইনে দাঁড়ালাম কি দাঁড়ালাম না, তা মূল গল্পের জন্যে অনাবশ্যক।

অনাবশ্যক হোক আর না হোক, আপনি দাঁড়ালেন কি না বলুন।

আমি কিছুই বলি না। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসি। যে হাসির দু'রকম অর্থই হতে পারে।

www.MurchOna.com

প্রথম তুষারপাত

ভিসকোমিটারটা ঠিকমতো কাজ করছিল না। একেক সময় একেক রকম রিডিং দিচ্ছে। আমার সঙ্গে কাজ করে পাল রেইমেন। ভিসকোমিটার কাজ করছে না শুনে সে কোত্থেকে লম্বা একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে এল এবং পটপট করে ভিসকোমিটারের সব অংশ খুলে ফেলল। আমি মনে মনে বললাম, বাহ্ বেশ ওস্তাদ ছেলে তো। এত জটিল যন্ত্র অথচ কী অবলীলায় খুলে ফেলল।

আমি বললাম, পল। তুমি কি এই যন্ত্র সম্পর্কে কিছু জান?

পল বলল, না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, জান না তাহলে এটা খুলে ফেললে যে?

দেখি ব্যাপারটা কী?

পল ভিসকোমিটারের স্প্রিং খুলে বের করে আনল এবং দু'হাতে কিছুক্ষণ টানাটানি করে বলল– এটা গেছে। বলেই স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে উঠে চলে গেল। আমি টেবিলের উপর একগাদা যন্ত্রপাতির অংশ ছড়িয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। কী করব কিছু বুঝতে পারলাম না।

আমেরিকানদের এই বিচিত্র অভ্যাসটি সম্পর্কে বলা দরকার। আমি এর নাম দিয়েছি স্ক্রু ড্রাইভার প্রেম। সব আমেরিকানদের পকেটে কয়েক সাইজের স্ক্রু ড্রাইভার থাকে বলে আমার ধারনা। প্রথম সুযোগেই এরা সমস্ত স্ক্রু খুলে ফেলবে।

যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমাদের এক ধরনের ভীতি আছে। ভীতির কারণ আমাদের শৈশব। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি– বাড়িতে হয়ত একটা রেডিও আছে। ছোট ছেলে রেডিও ধরতে গেল। বাবা চেঁচিয়ে উঠবেন, খবরদার হাত দিবি না। মা চেঁচাবেন, খোকন হাত দিও না, ব্যথা পাবে। ছোট্ট খোকনের মনের ভেতর ঢুকে গেল যন্ত্রপাতিতে হাত দেয়া যাবে না। হাত দিলেই খারাপ কিছু ঘটে যাবে। বড় হবার পরেও শৈশবের স্মৃতি থেকেই যায়। ঘরের ফিউজ কেটে গেলেও আমরা একজন মিস্ত্রি ডেকে আনি।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি– টেবিলে যন্ত্রপাতির অংশ ছড়িয়ে বসে আছি। মনটা খারাপ, এইসব খুঁটিনাটি জোড়া লাগাব কীভাবে তাই ভাবছি। তখন পল আবার ঘরে ঢুকল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, তাড়াতাড়ি বাইরে যাও, তুষারপাত হচ্ছে।

www.MurchOna.com

আমাদের সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে বর্ষা। মেঘমেদুর আকাশ। শ্রাবণের ধারা। আষাঢ়ের পূর্ণিমা। তেমনি ইংরেজী সাহিত্যে আছে তুষারপাত। বিশেষ করে বছরের প্রথম তুষারপাতের বর্ণনা। বছরের প্রথম বৃষ্টি বলে আমাদের কিছু নেই। সারা বছরই বৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষাকালে বেশি, অন্য সময় কম।

এদেশে তুষারপাতের নির্দিষ্ট সময় আছে। সামারে তুষারপাত হবে না। স্প্রিং বা ফলেও হবে না। তুষারপাত হবে শীতের শুরুতে। এবং প্রথম তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে দীর্ঘ শীতের প্রস্তুতি। ফায়ারিং প্লেস ঠিক করতে হবে। হিটিং সিস্টেম ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে। শীতের দিনের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা দেখতে হবে। দিনের পর দিন ঘর বন্দি হয়ে থাকতে হবে, তার জন্যও প্রস্তুতি দরকার। ব্লিজার্ড হতে পারে। ব্লিজার্ড হলে ছ'সাত দিন একনাগাড়ে গৃহবন্দি থাকতে হবে। তারও প্রস্তুতি আছে। দেখতে হবে সেলারে প্রচুর মদের বোতল আছে কি না। পছন্দসই বিয়ারের পেটি কটা আছে। শীতের সিজনে স্কিইং করার পরিকল্পনা থাকলে তার জন্যও প্রস্তুতি দরকার। অনেক কাজ। সব কাজের শুরুর ঘটা হচ্ছে বছরের প্রথম তুষার।

তুষারপাত দেখবার জন্যে ডানবার হলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। আকাশ ঘোলাটে। বইপত্রে পড়েছি পেঁজা তুলার মতো তুষার পড়ে। এখন সে রকম দেখলাম না, পাউডারের কণার মতো গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার পড়ছে। গায়ে পড়া মাত্রই তা গলে যাচ্ছে। খুব যে একটা অপরূপ দৃশ্য তা নয়। তবুও মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি।

দেখতে দেখতে পট পরিবর্তন হলো। শিমুলতুলার মতো তুষার পড়ছে। মনে হচ্ছে মেঘের টুকরো। এই টুকরোগুলি গায়ে পড়া মাত্র গলে যাচ্ছে না। গায়ের সঙ্গে লেগে থাকছে। চেনা এই জায়গা মুহূর্তের মধ্যে অচেনা হয়ে গেল। যেন এটা ডানবার হলের সামনের জায়গা নয়। এটা ইন্দ্রলোকের কোন-এক মেঘপুরী।

মাত্র দু'ঘণ্টা সময়ে সমস্ত ফার্গো শহর তুষারে ঢাকা পড়ে গেল। চারদিক সাদা। এই সাদা রঙের কী বর্ণনা দেব? তুষারের সাদা রঙ অন্য সাদার মতো নয়। এই সাদা রঙে একটা হিম ভাব থাকে যা ঠিক কাছে টানে না, একটু যেন দূরে সরিয়ে দেয়। তুষারের শুভ্রতার সঙ্গে অন্য কোনো শুভ্রতার তুলনা চলে না। এই শুভ্রতা অপার্থিব।

ল্যাবরেটরি বন্ধ করে সকাল সকাল হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরছি। বাস নিলাম না। তুষারের রূপ দেখতে দেখতে যাবো। মাইল দু'এক পথ। কতক্ষণ আর লাগবে?

পথে নেমেই বুঝলাম খুব বড় বোকামি করেছি। রাস্তা অসম্ভব পিছল। পা ফেলা যায় না, তার উপর ঠাণ্ডা। টেম্পারেচার দ্রুত নেমে যাচ্ছে। গায়ে সেই অনুপাতে গরম কাপড় নেই। ঠাণ্ডায় প্রায় জমে যাচ্ছি। তবু ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে সারা পৃথিবী বরফের চাদরে ঢাকা। নিজেকে মনে হচ্ছে ক্যাপটেন স্কট– এগুচ্ছি মেরুবিন্দুর খোঁজে। চারদিকের কী অপরূপ দৃশ্য। সুন্দর। সুন্দর!! সুন্দর!!! আবেগে ও আনন্দে আমার চোখ ভিজে উঠল।

"Winter for a moment takes the mind; the snow
Falls past the archlight; icicles guard a wall;
The wind moans through a crack in the window
A keen sparkle of frost is no the sill"

www.MurchOna.com

জননী

ছোট বেলায় আমার ঘর-পালানো রোগ হয়েছিল।

তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি। স্কুলের নাম কিশোরীমোহন পাঠশালা। থাকি সিলেটের মীরাবাজারে। বাসার কাছেই স্কুল। দুপুর বারোটায় স্কুল ছুটি হয়ে যায়। বাকি দীর্ঘ সময় কিছুতেই আর কাটে না। আমার বোনেরা তখন রান্নাবাটি খেলে। ওদের কাছে পাত্তা পাই না। মাঝে মাঝে অবশ্যি খেলায় নেয়, তখন আমার ভূমিকা হয় চাকরের। আমি হই পুতুল খেলা সংসারের চাকর। ওদের ফাইফরমায়েশ খাটি। ওরা আমার সঙ্গে তুই তুই করে কথা বলে। কাজেই ওদের পুতুল খেলায় খুব উৎসাহ বোধ করি না।

ঘর-পালানো রোগ তখন হলো। এক ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। চমৎকার অভিজ্ঞতা। হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত সব কল্পনা করা যায়। মজার মজার দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ানো যায়। কারো কিছু বলার থাকে না।

আমি রোজই তা-ই করি। সন্ধ্যার আগে আগে বাসায় ফিরে আসি। আমার মা নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর ছেলে যে সারা দুপুর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তা-ও তিনি জানেন না। আর জানলেও যে ভয়ংকর কিছু করতেন তা-ও মনে হয় না। তাঁর দিবানিদ্রায় আমি ব্যাঘাত করছি না– এই আনন্দটাই তাঁর জন্য অনেকখানি ছিল বলে আমার ধারণা।

যাই হোক, একদিনের ঘটনা বলি। হাঁটতে হাঁটতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বিশ্রাম নেয়ার জন্য একটা বাড়ির বারান্দায় এসে বসলাম। কালো সিমেন্টের বারান্দা। দেখলেই ইচ্ছে করে খালি গায়ে শুয়ে পড়তে। চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ বাড়ির দরজা খুলে গেল। ঘুমঘুম চোখে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। নরম গলায় বললেন, কী চাও খোকা?

আমি বললাম, কিছু চাই না।

বাসা কোথায়?

আমি জবাব দিলাম না। বাসা কোথায় তা এই মহিলাকে বলার কোনো অর্থ

হয় না। তিনি চলে গেলেন না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখে গভীর বিস্ময় এবং কৌতূহল। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তিনি বললেন, তুমি চলে যেও না, আমি আসছি।

তিনি ঘরের ভিতরে চলে গেলেন এবং মিনিট তিনেক পর আবার উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে কী-একটা খাবার। তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন– নাও, খাও।

অপরিচিত কেউ কিছু খেতে দিলে বলতে হয়– খাব না। ক্ষিধে নেই। আমি তা বলতে পারলাম না। জিনিসটা হাতে নিলাম। খেতে গিয়ে বুঝতে পারলাম ঐ খাদ্য এই পৃথিবীর খাদ্য নয়। স্বর্গীয় কোনো অমৃত।

জিনিসটা হচ্ছে জেলি মাখানো এক টুকরো পাউরুটি। এরকম সুখাদ্য পৃথিবীতে আছে এবং তা অপরিচিত কাউকে দেয়া যায় তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। ভদ্রমহিলা বললেন, আরেকটা দেব?

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম, তবে তা করতে বড় কষ্ট হলো। ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন এবং আরো এক টুকরা পাউরুটি নিয়ে ফিরে এলেন।

আমি দ্বিতীয়টিও নিঃশব্দে খেয়ে ফেললাম।

ভদ্রমহিলা বললেন, তোমার নাম কী, খোকা?

আমি নাম বললাম না। এক দৌড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম। তিন নিশ্চয়ই আমার এই অদ্ভুত ব্যবহারে খুবই অবাক হয়েছিলেন, তবে তিনি হয়ত-বা তার চেয়েও অবাক হলেন যখন দেখলেন পরের দিন আমি আবার উপস্থিত হয়েছি।

তিনি আমাকে দেখে খুব হাসলেন। তারপরই খাবার নিয়ে এলেন। ব্যাপারটা রুটিনের মতো হয়ে গেল– আমি রোজ যাই, ভদ্রমহিলা খাবার দেন, আমি খাই এবং চলে আসি।

তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করেন বলে মনে হয়। বারান্দায় এসে বসা মাত্র দরজা খুলে বের হয়ে আসেন।

একদিনের কথা বলি। মেঘলা দুপুর। চারদিকে কেমন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভদ্রমহিলার বারান্দায় পা দেয়া মাত্র বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল।

তিনি দরজা খুলে বললেন, বারান্দায় বৃষ্টির ছাঁট আসবে, ভেতরে এসো খোকা।

আমি ভয়ে ভয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালাম। কী চমৎকার সাজানো বাড়ি। যেন ছবি আঁকা। মানুষের বাড়ির ভেতরটা এত সুন্দর হয় আমার জানা ছিল না।

খোকা, বস।

আমি ভয়ে ভয়ে সোফায় বসলাম। তিনি বললেন, আজ থেকে তুমি আমাকে মা বলে ডাকবে, কেমন? তুমি মা ডাকবে, আমি তোমাকে খুব মজার মজার খাওয়াব। আচ্ছা?

আমি কিছু বললাম না।

তিনি বললেন, তুমি যে আমাকে মা ডাকছ এটা কাউকে বলার দরকার নেই। এটা তোমার এবং আমার গোপন খেলা।

আমি ভদ্রমহিলার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তিনি নাশপাতি কিংবা নাশপাতির মতো দেখতে কোনো একটা ফল কেটে দিলেন। বললেন, এসো, তুমি আমার কোলে বসে খাও। তার আগে মিষ্টি করে আমাকে মা ডাক তো।

আমি মা ডাকতে পারলাম না। বিচিত্র এক ধরনের ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠল। শিশুদের মনের গভীরে অনেক ধরনের ভয় লুকানো থাকে। তারই কোনো একটা বের হয়ে এসে আমাকে অভিভূত করে ফেলল। আমি ছুটে বের হয়ে গেলাম। বৃষ্টিতে কাক ভেজা হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বাসায় পৌঁছলাম।

ঐ রহস্যময় বাড়িতে আর কোনোদিন যাইনি। মানুষের জীবনে কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। রহস্যময় প্রকৃতি মানুষকে একই পরিস্থিতিতে বার বার ফেলে মজা দেখেন বলে আমার ধারণা। সিলেটের ঐ বাড়ির মহিলার মতো এক মহিলার দেখা পেলাম খোদ আমেরিকায়। আমার বয়স তখন সাতাশ।

শীতের শুরু।

বরফ পড়া আরম্ভ হয়েছে। হোটেল গ্রেভার ইন থেকে বাসে ইউনিভার্সিটিতে আসতে খুব কষ্ট হয়। বাসের ভিতর হিটিং-এর ব্যবস্থা আছে, তবু শীতে জমে যাবার মতো কষ্ট পাই। বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করার কষ্টও অকল্পনীয়। আমার ভারতীয় বন্ধু উমেশ আমার জন্য ইউনিভার্সিটির কাছে একটা ঘর খুঁজে দিল।

আমেরিকান এক ভদ্রমহিলা তার বাড়ির কয়েকটা ঘর বিদেশী ছাত্রদের ভাড়া দেন। ভাড়া খুবই সস্তা, মাসে চল্লিশ ডলার। তবে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে বাইরে। আমি বাড়িওয়ালির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর নাম লেভারেল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, আমি খুব বেছে বেছে রুম ভাড়া দেই। যাদেরকে দেই তাদের কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। তার মধ্যে সবচে কঠিন নিয়ম দুটি হচ্ছে, রাত দশটার পর কোনো বান্ধবীকে ঘরে আনা যাবে না। এবং উঁচু ভ্যলুমে স্টেরিও বাজানো যাবে না।

আমি বললাম, বান্ধবী এবং স্টেরিও– দুটোর কোনোটিই আমার নেই।

তিনি বললেন, এখন নেই, দুদিন পর হবে। সেটা দোষের নয়। তবে আমার নিয়ম তোমাকে বললাম। পছন্দ হলে রুম নিতে পার।

আমি রুম নিয়ে নিলাম। প্রথম মাসের ভাড়া বাবদ চল্লিশ ডলার দেবার পর তিনি একটি ছাপানো কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। সেই কাগজে আরো সব শর্ত লেখা। প্রথম শর্ত পড়েই আমার আক্কেল গুড়ুম। লেখা আছে : এই বাড়ির কোনো অগ্নিবীমা নেই। কাজেই এই বাড়ির অধিবাসীদের কেউ ধূমপান করতে পারবে না।

সব নিয়ম মানা সম্ভব কিন্তু এই নিয়ম কী করে মানব? মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। একেবার ভাবলাম ডলার ফেরত নিয়ে হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরে যাব। আবার ভাবলাম, বাসায় তো আর বেশিক্ষণ থাকব না, কাজেই তেমন অসুবিধা হয়ত হবে না।

অসুবিধা হলো।

ঘুমুতে যাবার আগে আগে সিগারেটের তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাবার মতো অবস্থা হ'ল। আমি গরম কাপড় গায়ে দিলাম। গায়ে পার্কা চড়ালাম। মাফলার দিয়ে নিজেকে পেঁচিয়ে মাংকিক্যাপ মাথায় দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে সিগারেট ধরালাম।

দৃশ্যটা অদ্ভুত। বরফ পড়ছে। এই বরফের মধ্যে জোব্বা-জাব্বা গায়ে এক ছেলে সিগারেট টানার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

দিন সাতেক পরের কথা। লেভারেল আমার ঘরে ঢুকে কঠিন গলায় বলল, এগারটা-বারটার সময় বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টান তাই না?

হ্যাঁ।

ধূমপান যারা করে তাদের আমি বাড়ি ভাড়া দেই না।

আমি সামনের মাসে চলে যাব।

খুবই ভালো কথা। মাসের এই কটা দিন দয়া করে ঘরে বসেই সিগারেট খাবে। ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে অসুখ-বিসুখ বাঁধাও তা আমি চাই না।

ধন্যবাদ।

শুকনো ধন্যবাদের আমার দরকার নেই। আমি পনেরো বছরে এই প্রথম একজনকে সিগারেট খাবার অনুমতি দিলাম।

থ্যাংক ইউ।

লেভারেল উঠে চলে গেল। তবে যাবার আগে হঠাৎ বলল, তোমার অন্য কোথাও যাবার দরকার নেই। তুমি আমার এখানেই থাকবে। আমি তোমার সিগারেটের অভ্যাস ছাড়িয়ে দেব।

ভদ্রমহিলা এর পর আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। আমার সিগারেটের প্যাকেট তাঁর কাছে জমা রাখতে হলো। তিনি গুনে গুনে আমাকে সিগারেট দেন। তাঁর সামনে বসে খেতে হয়। তিনি নানান উপদেশ দেন, ধোঁয়া বুকের ভিতর নিও না। পাফ করে ছেড়ে দাও।

সিগারেট খাবার সময় একজন অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, এটা অসহ্য।

এছাড়াও তিনি আরো সব সমস্যা করতে লাগলেন– আমার ওজন খুব কম, কাজেই তিনি ওজন বাড়ানো চেষ্টা করতে লাগলেন। বলতে গেলে রোজ রাতে তার সঙ্গে ডিনার খেতে হয়। তিনি আমার কাপড় ধুয়ে দেন। ঘর ঝাঁট দিয়ে দেন। একদিন তুষার ঝড় হচ্ছিল। ইউনিভার্সিটি থেকে আমি ঠিকমতো ফিরতে পারব না ভেবে নিজেই ইউনিভাসিটিতে হাজির হলেন। আমি বরফের উপর দিয়ে ঠিকমতোই হাঁটতে পারছি তবু তিনি হাত ধরে আমাকে নিয়ে এলেন।

বরফের উপর দিয়ে দুজন আসছি। হঠাৎ উনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, হুমায়ূন [ইনিই একমাত্র আমেরিকান যিনি শুদ্ধভাবে আমার নাম উচ্চারণ করতেন] তুমি কি দয়া করে এখন থেকে আমাকে মা ডাকবে?

আমি স্তম্ভিত।

বলেন কী এই মহিলা।

আমি চুপ করে রইলাম। লেভারেল শান্ত গলায় বললেন, তুমি আমাকে মা ডাকলে আমার খুব ভালো লাগবে। সব সময় ডাকতে হবে না। এই হঠাৎ হঠাৎ।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। আমাদের মধ্যে আর কোনো কথা হলো না।

আমি বিরাট সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলাম।

ভদ্রমহিলার আদরযত্নে খুব অস্বস্তি বোধ করি। কেউ আমার প্রতিটি ব্যাপার লক্ষ রাখছে তাও আমার ভালো লাগে না।

আমি পড়াশুনা করি, তিনি চুপচাপ পাশে বসে থাকেন। বারবার জিজ্ঞেস করেন, আমি পাশে বসে থাকায় কি তোমার অসুবিধা হচ্ছে? আমি ভদ্রতা করে বলি "না"।

ঠাণ্ডা লেগে একবার খানিকটা জ্বরের মতো হলো, তিনি তাঁর নিজের ইলেকট্রিক ব্ল্যাংকেট আমাকে দিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে একটা কার্ড, সেখানে লেখা : তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠ। তোমার মা– লেবারেল।

ভদ্রমহিলার এখানে বেশিদিন থাকতে হলো না। ইউনিভার্সিটি আমাকে বাড়ি দিল। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বিদায়ের সময় তিনি শিশুদের মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। ভদ্রমহিলার স্বামী বিরক্ত হয়ে বারবার বললেন, এসব কী হচ্ছে? ব্যাপারটা কি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। লেভারেল, তুমি এত আপসেট কেন?

আমার হৃদয় খুব সম্ভব পাথরের তৈরি। এই দুজনের কাউকেই আমি মুখ ফুটে মা ডাকতে পারিনি।

www.MurchOna.com

এই পরবাসে

অকর্মা লোক খুব ভালো চিঠি লিখতে পারে বলে একটা প্রবচন আছে। অকর্মাদের কাজকর্ম নেই– ইনিয়ে-বিনিয়ে দীর্ঘ চিঠি তাদের পক্ষেই লেখা সম্ভব।

আমি নিজেও এইসব অকর্মাদের দলে। গুছিয়ে চিঠি লিখবার ব্যাপারে আমার জুড়ি নেই। পাঠকরা হয়ত ভুরু কুঁচকে ভাবছেন– এই লোকটা দেখি খুব অহংকারী।

তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আমি আসলেই অহংকারী, তবে লিখিতভাবে সেই অহংকার কখনো প্রকাশ করিনি। আজ করলাম। আমি যে চমৎকার চিঠি লিখতে পারি তার এখন একটি প্রমাণ দেব। আমার ধারণা, যে-সব পাঠক এতক্ষণ ভুরু কুঁচকে ছিলেন– প্রমাণ দাখিলের পর তাঁদের মুখের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

প্রবাস জীবনের সাত মাস পার হয়েছে। আমার স্ত্রী গুলতেকিন আমার সঙ্গে নেই। সে আছে দেশে। হলিক্রস কলেজ থেকে আই-এস-সি পরীক্ষা দেবে। কোমর বেঁধে পড়াশোনা করছে। পরীক্ষার আর মাত্র মাস খানেক দেরি। এই অবস্থায় আমি আমার বিখ্যত চিঠিটি লিখলাম। চার পাতার চিঠিতে একা থাকতে যে কী পরিমাণ খারাপ লাগছে, তার প্রতি যে কী পরিমাণ ভালোবাসা জমা করে রেখেছি এইসব লিখলাম। চিঠির শেষ লাইনে ছিল– আমি এনে দেব তোমার উঠোনো সাতটি অমরাবতী।

এই চিঠি পড়ে সে খানিক্ষণ কাঁদল। পরীক্ষা-টরীক্ষার কথা সব ভুলে গিয়ে সাত মাস বয়েসী শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে চলে এল আমেরিকায়। আমি আমার চিঠি লেখার ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত। পরীক্ষা-টরীক্ষা সব ফেলে দিয়ে চলে আসায় আমি খানিকটা বিরক্ত। দু'মাস অপেক্ষা করে পরীক্ষা দিয়ে এলেই হতো।

গুলতেকিন চলে আসায় আমার জীবনযাত্রা বদলে গেল। দেখা গেল সে একা আসেনি, আমার জন্যে কিছু সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে, সে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি আমাকে একটা বাড়ি দিল।

দু'তলা বাড়ি। এক তলায় রান্নাঘর, বসার ঘর এবং স্টাডি রুম। দু'তলায় দুটি শোবার ঘর। এত বড় বাড়ির আমার প্রয়োজন ছিল না। ওয়ান বেডরুমই যথেষ্ট ছিল। তবে নর্থ ডাকোটা স্টেটের নিয়ম হচ্ছে বাচ্চার জন্যে আলাদা শোবার ঘর

থাকতে হবে। বাচ্চাদের মধ্যে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে হলে তাদের জন্যে আলাদা আলাদা শোবার ঘর থাকতে হবে। তবে দু'জই ছেলে বা মেয়ে হলে একটি শোবার ঘরেই চলবে।

আমরা নতুন বাড়িতে উঠে এলাম। বলতে গেলে প্রথমবারের মতো আমার সংসার শুরু করলাম। এর আগে থেকেছি মা-র সংসারে। আলাদা সংসারের আনন্দ বেদনার কিছুই জানি না। প্রবল উৎসাহে আমরা ঘর সাজাবার কাজে লেগে পড়লাম। রোজই দোকানে যাই। যা দেখি তাই কিনে ফেলি। এমন অনেক জিনিস আমরা দুজনে মিলে কিনেছি যা বাকি জীবনে একবারও ব্যবহার হয়নি। এই মুহূর্তে দুটি জিনিসের নাম মনে পড়ছে– টুল বক্স, যেখানে করাত-ফরাত সবই আছে। এবং ফুট বাথ নেবার জন্যে প্লাস্টিকের গামলা জাতীয় জিনিস।

গুলতেকিন প্রবল উৎসাহে রান্নাবান্না নিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাত মাছ ছাড়াও নানান পরীক্ষামূলক রান্না হতে লাগল। অতি অখাদ্য সেই সব খাদ্যদ্রব্য মুখে নিয়ে আমি বলতে লাগলাম, অপূর্ব।

খুব সুখের জীবন ছিল আমাদের। সাত মাস বয়সের পুতুলের মতো একটি মেয়ে যে কাউকে বিরক্ত করে না, আপন মনে খেলে। মাঝে মাঝে তার মনে গভীর ভাবের উদয় হয় সে তার নিজস্ব ভাষায় গান গায়–

গিবিজি গিবিজি, গিবিজি গিবিজি
গিবি ॥
গিবিজি গিবিজি গিবিজি গিবিজি
গিবি ॥

আহা, সে বড় সুখের সময়।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই দেশে প্রবাসী ছাত্রদের স্ত্রীরা ভয়াবহ জীবন যাপন করেন। এদের কিছুই করার থাকে না। স্বামী কাজে চলে যায়, ফেরে গভীর রাতে। এই দীর্ঘ সময় বেচারীকে কাটাতে হয় একা একা। এরা সময় কাটায় টিভির সামনে বসে থেকে কিংবা শপিং মলে ঘুরে ঘুরে।

রাতে স্বামী যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে তখন অতি অল্পতেই খিটিমিটি লেগে যায়। স্ত্রী বেচারীর ফুঁপিয়ে কাঁদা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। আমি এক ভদ্রলোককে জানতাম যিনি রাত একটায় তাঁর স্ত্রীকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন। একবারও ভাবেননি এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে আত্মীয়-পরিজনহীন শহরে মেয়েটি কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে।

যাক ওসব, নিজের গল্পে ফিরে আসি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলাম, প্রবাসী জীবনে আমি কখনো আমার স্ত্রীর উপর রাগ করব না। কখনো তাকে একাকীত্বের কষ্ট পেতে দেব না।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আঠারো বছরের এই মেয়ে আমেরিকান জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে খুব সহজেই মানিয়ে নিচ্ছে। অতি অল্প সময়ে সে চমৎকার ইংরেজী বলা শিখল। সুন্দর একসেন্ট। আমি অবাক হয়ে বললাম, এত চমৎকার ইংরেজী কোথায় শিখলে?

সে বলল টিভি থেকে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ১৪ ঘণ্টা টিভি খোলা থাকে। ইংরেজী শিখব না তো করব কি?

একদিন বাসায় এসে দেখি ফুটফুটে চেহারার দু'টি আমেরিকান বাচ্চা আমার মেয়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করছে। অবাক হয়ে বললাম, এরা কারা?

গুলতেকিন হাসিমুখে বলল, বেবি সিটিং শুরু করেছি।

সে কি?

অসুবিধা তো কিছু নেই। আমার নিজের বাচ্চাটিকে তো আমি দেখছি, এই সঙ্গে এই দু'জনকেও দেখছি। আমার তো সময় কাটাতে হবে।

গুলতেকিন খুবই অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে। ওদের ধানমণ্ডির বাসায় আমি প্রথম কাপড় ধোয়া এবং কাপড় শুকানোর যন্ত্র দেখি। ওদের পরিবারের ম্যানেজার জাতীয় একজন কর্মচারী আছে, তিনজন আছে কাজের মানুষ। ড্রাইভার আছে, মালী আছে। এদের প্রত্যেকের আলাদা শোবার ঘর আছে। এরা যেন নিজেরা রান্না-বান্না করে খেতে পারে সে জন্যে আলাদা রান্নাঘর এবং বাবুর্চি আছে।

সেই পরিবারের অতি আদরের একটি মেয়ে বেবি সিটিং করছে। ভাবতে অবাক লাগে। কাজটা হচ্ছে আয়ার। এই জাতীয় কাজের মানসিক প্রস্তুতি নিশ্চয়ই তার ছিল না। বিদেশের মাটিতে সবই বোধহয় সম্ভব। বেবী সিটিং-এর কাজটি সে চমৎকারভাবে করতে লাগল। বাসা ভরতি হয়ে গেল বাচ্চায়। সবাই গুলতেকিনকে বেবি সিটার হিসেবে পেতে চায়।

মাঝে মাঝে দুপুরে বাসায় খেতে এসে দেখি পুরোপুরি স্কুল বসে গেছে। বাড়ি ভর্তি বাচ্চা। তারা আমার মেয়ের দেখাদেখি গুলতেকিনকে ডাকে আম্মা, আমাকে ডাকে আব্বা।

মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে আমেরিকান দম্পতি দুপুর রাতে তাদের বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত। লজ্জিত গলায় বলছে, আমার বাচ্চাটা চেঁচামেচি করছে রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমুবে। কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না। আমরা খুবই লজ্জিত। কী করব বুঝতে পারছি না।

গুলতেকিন হাসিমুখে বলল– বাচ্চাকে রেখে যান।

এর জন্যে আমি তোমাকে পে করব।

পে করতে হবে না। রাতের বেলা তোমার বাচ্চা আমার গেস্ট।

www.MurchOna.com

শুলতেকিন শুয়েছে, একদিকে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে আমাদের নিজের মেয়ে নোভা। অন্যদিকে আমেরিকান বাচ্চা। চমৎকার দৃশ্য।

টিচিং অ্যাসিসটেন্ট হিসাবে আমি যত টাকা পেতাম সে তারচে অনেক বেশি পেতে লাগল। আমরা চমৎকার একটা গাড়ি কিনলাম– ডজ কোম্পানির পোলারা।

ছুটির দিনগুলিতে গাড়ি করে ঘুরে বেড়াই। প্রায়ই মনে হয় আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়টা কাটাচ্ছি।

টাকা-পয়সা নিয়ে আমরা যত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করি, সুখের উপকরণগুলির মধ্যে টাকা-পয়সার ভূমিকাটা বেশ বড়। যতই দিন যাচ্ছে ততই তা বুঝতে পারছি। কিংবা কে জানে ধনবাদী এই সমাজ আমার চিন্তা-ভাবনাকে পাল্টে দিতে শুরু করেছে কিনা।

পরবাসে আমার রুটিনটা হলো এরকম : ভোরবেলা ল্যাবরেটরিতে চলে যাই। সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসি। ঘরে পা দেবার পর ক্লাসের বইপত্র ছুঁয়েও দেখি না। টিভি চালিয়ে দেই, গান শুনি, লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা গাদা গাদা গল্পের বইয়ের পাতা উল্টাই। নোভাকে বাংলা শেখাতে চেষ্টা করি। গ্লাসের পানি দেখিয়ে বলি– এর নাম পানি। বল, পানি।

সে বলে, গিবিজি।

গিবিজি নয়। বল পানি প-া-ন-ি.

গিবিজি গিবিজি।

মেয়েটিকে নিয়ে তার মা খুব দুশ্চিন্তায় ভোগে। শুধুমাত্র গিবিজি শব্দ সম্বল করে সে এই পৃথিবীতে এসেছে কিনা কে জানে। তার দেড় বছর বয়স হয়ে গেছে, এই বয়সে বাচ্চারা চমৎকার কথা বলে। অথচ সে শুধু বলে– গিবিজি। আমি নিজেও খানিকটা চিন্তিত বোধ করলাম।

দু'বছর বয়সে হঠাৎ করে সে কথা বলতে শুরু করল। ব্যাপারটা বেশ মজার, কারণ সে কথা বলা শুরু করল ইংরেজিতে। একটা দুটা শব্দ নয়, প্রথম থেকে বাক্য। এবং বেশ দীর্ঘ বাক্য। বাসায় দুটো ভাষা চালু ছিল– ইংরেজী ও বাংলা। আমরা নিজেরা বাংলা বলতাম। যে সব বাচ্চারা সারাদিন বাসায় থাকত তারা বলত ইংরেজি। সে দুটি ভাষাই দীর্ঘদিন লক্ষ করেছে। বেছে নিয়েছে একটি। ভাষা বিজ্ঞানীদের জন্যে এই তথ্যটি সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ।

আমার দীর্ঘ সাত বছরের প্রবাস জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের গল্প আছে। সবই ব্যক্তিগত গল্প। তার থেকে দু একটি বলা যেতে পারে।

একদিনের কথা বলি। সন্ধ্যা মিলিয়েছে [বলে রাখা ভালো সামারে সন্ধ্যা হয় রাত ন টার দিকে]। আমি পোর্চে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ লক্ষ করলাম ন'দশ বছরের

www.MurchOna.com

একটি বালিকা আমার বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। মেয়েটির চেহারা ডল পুতুলের মত। ফ্রকের হাতায় সে চোখ মুছছে। আমি বললাম কী হয়েছে খুকী।

সে বলল, কিছু হয়নি। আমি কি তোমার বাসার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি?

অবশ্যই পারো। ভেতরে এসেও বসতে পার।

না। আমার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগছে।

রাত সাড়ে দশটায় খাবার শেষ করে বাইরে এসে দেখি মেয়েটি তখনো দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, এখনো দাঁড়িয়ে আছো?

সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি তো তোমাকে বিরক্ত করছি না। শুধু দাঁড়িয়ে আছি।

ব্যাপারটা কি তুমি আমাকে বলবে?

মেয়েটি ঘটনাটা বলল।

তার মা একজন ডিভোর্সি মহিলা। মেয়েকে নিয়ে থাকে। সম্প্রতি একটি ছেলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ছেলেটিকে নিয়ে সে ডেটিং-এ যায়। মেয়েটিকে একা বাড়িতে রেখে যায়। সন্ধ্যা মেলাবার পর মেয়েটির একা একা ভয় করতে থাকে। সে তখন ঘর বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়ায়। মায়ের জন্য অপেক্ষা করে। আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ানোর কারণ হচ্ছে আমাদের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত বাতি জ্বলে। সে লক্ষ করেছে আমি খুব রাত জাগি।

মেয়েটির কষ্টে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি বললাম, খুকী তুমি আমার ঘরে এসে মার জন্য অপেক্ষা কর।

সে কঠিন গলায় বলল, না।

সেবারের পুরো সামারটা আমার নষ্ট হয়ে গেল। মেয়েটি রোজ গভীর রাত পর্যন্ত আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার মার জন্যে অপেক্ষা করে। ভদ্রমহিলা মধ্যরাতে মাতাল অবস্থায় ফেরেন। আমার ইচ্ছা করে চড় দিয়ে এই মহিলার সব কটি দাঁত ফেলে দেই। তা করতে পারি না। কান পেতে শুনি মহিলা তার মেয়েকে বলছেন– আর কখনো দেরি হবে না। তুমি কি খুব বেশি ভয় পাচ্ছিলে?

না।

আমি তোমাকে ভালোবাসি, মা।

আমিও তোমাকে ভালোবাসি।

আই লাভ ইউ– কথাটি একজন আমেরিকান তাঁর সমস্ত জীবনে কত লক্ষ বার ব্যবহার করেন আমার জানতে ইচ্ছে করে। এই বাক্যটির আদৌ কি কোনো অর্থ তাদের কাছে আছে?

www.MurchOna.com

আরেকটা ঘটনা বলি।

আমার স্ত্রী জেনি লি নামের একটি মেয়ের বেবি সিটিং করতো। মেয়েটির বয়স সাত-আট বছর। মেয়েটির মা একজন ডিভোর্সি মহিলা, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সমাজবিদ্যার ছাত্রী। সে ইউনিভার্সিটিতে যাবার পথে মেয়েটিকে রেখে যায়। ফেরার পথে নিয়ে যায়। একদিন ব্যতিক্রম হলো, সে মেয়েকে নিতে এল না। রাত পার হয়ে গেল। পরদিন ভোরে তার বাসায় গিয়ে দেখি বিরাট তালা ঝুলছে। খুব সমস্যায় পড়লাম। মহিলা গেলেন কোথায়? তিন দিন কেটে গেল কোনো খোঁজ নেই। আমরা পুলিশে খবর দিলাম। মহিলার মার ঠিকানা বের করে তাঁকে লং ডিসটেন্স টেলিফোন করলাম। ভদ্রমহিলা কঠিন গলায় বললেন, এই সব ব্যাপার নিয়ে আমাকে বিরক্ত না করলে খুশি হব। আমার মেয়ের সঙ্গে গত সাত বছর ধরে কোনো যোগাযোগ নেই। নতুন করে যোগাযোগ হোক তা আমার কাম্য নয়। জীবনের শেষ সময়টা আমি সমস্যা ছাড়া বাঁচতে চাই।

আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তবে জেনি লি নির্বিকার। সে বেশ সহজ ভঙ্গিতে বলল, আমার মা আমাকে তোমাদের ঘাড়ে ডাম্প করে পালিয়ে গেছে। সে আর আসবে না।

আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম, অবশ্যই আসবে।

না আসবে না। আমি না থাকলেই তার সুবিধা। বয় ফ্রেন্ডের সঙ্গে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে। আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব।

কথাগুলি বলবার সময় মেয়েটির গলা একবারও ধরে এল না। চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করল না। একমাত্র শিশুরাই পারে নির্মোহ হয়ে সত্যকে গ্রহণ করতে।

জেনি লির মা চারদিন পর ফিরে আসে। সে তার বয় ফ্রেন্ডের সঙ্গে ডিসটেন্স ড্রাইভে দশ হাজার মাইল দূর মন্টানার এক পাহাড়ে চলে গিয়েছিল।

আমেরিকা কী ভাবে বিদেশী ছাত্রদের জীবনে প্রভাব ফেলতে থাকে তার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েই গল্প শেষ করব।

শীতের সময়কার ঘটনা।

এখানকার শীত মানে ভয়াবহ ব্যাপার। ঘর থেকে বেরুনো বন্ধ। আমি ইউনিভার্সিটিতে যাই। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে আসি। জীবন এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

আমেরিকানদের মতে এই সময়টা স্বামী-স্ত্রীদের জন্যে খুব খারাপ। সবার মধ্যেই তখন থাকে– কেবিন ফিবার। দিনের পর দিন ঘরে বন্দি থেকে মেজাজ হয় রুক্ষ। ঝগড়াঝাটি হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ডির্ভোসের শতকরা ৭৬ ভাগ হয় শীতের সময়টায়।

আমেরিকানদের কেবিন ফিবারের ব্যাপারটা যে কত সত্যি তার প্রমাণ হাতে হাতে পেলাম। অতি সামান্য ব্যাপার নিয়ে কুৎসিত একটা ঝগড়া করলাম গুলতেকিনের সঙ্গে। সে বিস্মিত গলায় বারবার বলতে লাগল, তুমি এ রকম করে কথা বলছ কেন? এসব কী? কেন এরকম করছ?

আমি চেঁচিয়ে বললাম, ভালো করছি।

তুমি খুবই বাজে ব্যবহার করছ। কেউ এরকম ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলে না।

কেউ না বলুক, আমি বলি।

আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।

চলে যেতে চাইলে যাও। মাই ডোর ইজ ওপেন। দক্ষিণ দুয়ার খোলা।

সে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো তারপর নোভাকে চুমু খেয়ে এক বস্ত্রে বের হয়ে গেল। আমি মোটেই পাত্তা দিলাম না। যাবে কোথায়? তাকে ফিরে আসতেই হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার– সে ফিরে এল না। একদিন এবং একরাত কেটে গেল। আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। নোভা ক্রমাগত কাঁদছে, কিছুই খাচ্ছে না। আমি কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারছি না। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ করলাম। কেউ কিছু বলতে পারে না। পুলিশে খবর দিলাম।

ফার্গো শহরে অসহায় মহিলাদের রক্ষা সমিতি বলে একটি সমিতি আছে। সেখানেও খোঁজ নিলাম। আমার প্রায় মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়।

দ্বিতীয় দিন পার হ'ল। রাত এল। আমি ঠিক করলাম রাতের মধ্যে যদি কোনো খোঁজ না পাই তাহলে দেশে খবর দেব।

রাত আটটায় একটা টেলিফোন এল। একজন মহিলা এ্যাটোর্নি আমাকে জানালেন যে আমার স্ত্রী গুলতেকিন আহমেদ আমার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়েছেন। তিনি ডিভোর্সের মামলা করতে চান।

আমি বললাম, খুবই উত্তম কথা। সে আছে কোথায়?

সে তার এক বান্ধবীর বাড়িতে আছে। সেই ঠিকানা তোমাকে দেয়া যাবে না। আমি কি মামলার বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব?

মামলার বিষয়ে কথা বলার কিছুই নেই। আমাদের বিয়ের নিয়ম-কানুন খুব সহজ। এই নিয়মে আমার স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করার অধিকার দেয়া আছে। এই অধিকার বলে সে যে কোনো মুহূর্তে আমাকে ত্যাগ করতে পারে। তার জন্যে কোর্টে যাবার প্রয়োজন নেই।

তোমাদের দেশের নিয়ম-কানুন তোমাদের দেশের জন্যে। আমেরিকায় এই নিয়ম চলবে না।

www.MurchOna.com

তোমার বকবকানি শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না। তুমি কি দয়া করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেবে?

আমি তোমার অনুরোধের কথা তাকে বলতে পারি। যোগাযোগ করবার দায়িত্ব তার।

বেশ তাই কর।

আমি টেলিফোন নামিয়ে সারা রাত জেগে রইলাম–যদি গুলতেকিন টেলিফোন করে। সে টেলিফোন করল না। বিভীষিকাময় একটা রাত কাটল। ভোরবেলা সে এসে হাজির।

যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে সে রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের কেতলি বসিয়ে দিল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। কিছুই বলছি না। সে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দু'কাপ চা বানিয়ে এক কাপ আমার সামনে রেখে বলল, তোমাকে আমি একটা শিক্ষা দিলাম। যাতে ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে আর খারাপ ব্যবহার না কর। যদি কর আমি কিন্তু ফিরে আসব না।

আমি বললাম, আমেরিকা তোমাকে বদলে দিয়েছে।

হ্যাঁ দিয়েছে। এই বদলানোটা কি খারাপ?

না।

না-বলার সৎ সাহস যে তোমার হয়েছে সে জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তবে যে বিদ্রোহ এখানে আমি করতে পারলাম দেশে থাকলে তা কখনো করতে পারতাম না। দিনের পর দিন অপমান সহ্য করে পশু-শ্রেণীর স্বামীর পায়ের কাছে পড়ে থাকতে হ'ত।

আমি কি পশু-শ্রেণীর কেউ?

হ্যাঁ। নাও চা খাও। তোমার চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন? এই দুদিন কিছুই খাওনি বোধ হয়?

বলতে বলতে পশু-শ্রেণীর একজন মানুষের প্রতি গাঢ় মমতায় তার চোখে জল এসে গেল।

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি জানি এর পরেও তুমি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে, তবুও আমি বারবার তোমার কাছেই ফিরে আসব। এই দুদিন আমি একবারও আমার মেয়ের কথা ভাবিনি। শুধু তোমার কথাই ভেবেছি।

আমি মনে মনে বললাম, ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন মিছে এ ভালোবাসা।

ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন। না জন্মালে ভাব প্রকাশে আমাদের বড় অসুবিধা হ'ত।

www.MurchOna.com

ম্যারাথন কিস

চুমু প্রসঙ্গে আরেকটি গল্প বলি। গল্পের নায়ক আমার ছাত্র– বেন ওয়ালি। টিচিং অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে আমি এদের প্রবলেম ক্লাস নেই। সপ্তাহে একদিন এক ঘণ্টা থার্মোডিনারিক্সের অংক করাই এবং ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেই।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আন্ডার-গ্রাজুয়েটে যে সব আমেরিকান পড়তে আসে, তাদের প্রায় সবাই গাধা টাইপের। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে হা করে তাকিয়ে থাকে। প্রবল বেগে মাথা চুলকায়। অংক করতে দিলে শুকনো গলায় বলে, আমার ক্যালকুলেটরে ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে।

আন্ডার-গ্রাজুয়েট পড়াশোনা এদের তেমন জরুরি নয়। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য হাইস্কুলের শিক্ষাই যথেষ্ট। এদের কাছে ইউনিভার্সিটির ফুটবল টিম, বেসবল টিম পড়াশোনার চেয়ে অনেক জরুরি। মেয়েদের লক্ষ থাকে ভালো একজন স্বামী জোগাড় করার দিকে। এই কাজটি তাদের নিজেদেরই করতে হয় এবং এর জন্যে যে পরিমাণ কষ্ট এক একজন করে তা দেখলে চোখে পানি এসে যায়।

আমার সঙ্গে রুথ কোয়াভাল বলে এক আমেরিকান ছাত্রী পি-এইচ-ডি করত। এই মেয়েটি কোনো স্বামী জোগাড় করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও যে পারবে এমন সম্ভাবনাও নেই। মেয়েটি মৈনাক পর্বতের মত। সে আমকে দুঃখ করে বলেছিল, আমার যখন সতেরো-আঠারো বছর বয়স ছিল তখন আমি এত মোটা ছিলাম না। চেহারাও ভালোই ছিল। তখন থেকে চেষ্টা করছি একজন ভালো ছেলে জোগাড় করতে। পারিনি। কত জনের সঙ্গে যে মিশেছি। ওদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখার জন্যে কত কিছু করতে হয়েছে। আগেকার অবস্থা তো নেই, এখন ছেলেরা ডেটিং-এর প্রথম রাতেই বিছানায় নিয়ে যেতে চায়। না করি না। না করলে যদি বিরক্ত হয়। আমকে ছেড়ে অন্য কোনো মেয়ের কাছে চলে যায়। এত কিছু করেও ছেলে জুটাতে পারলাম না।

কেন পারলে না।

পারলাম না, কারণ আমি অতিরিক্ত স্মার্ট। সারা জীবন 'A' পেয়ে এসেছি।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রীদের একজন। ছেলেরা এ রকম স্মার্ট মেয়ে পছন্দ করে না। তারা চায় পুতুপুতু ধরনে ভ্যাদা টাইপের মেয়ে। তুমি বিদেশী, আমাদের জটিল সমস্যা বুঝতে পারবে না।

আমি আসলেই বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় এদের কোথায় যেন কী একটা হয়েছে। সবার মাথার স্ক্রু-র একটা প্যাঁচ কেটে গেছে। উদাহরণ দেই। এটি আমার নিজের চোখে দেখা।

পুরোদমে ক্লাস হচ্ছে। দেখা গেল ক্লাস থেকে দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে বের হয়ে গেল। সবার চোখের সামনে এরা সমস্ত কাপড় খুলে ফেলল। এই ভাবেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটা চক্কর দিয়ে ফেলল। এর নাম হচ্ছে স্ট্রিকিং। এরকম করল কেন? এরকম করল কারণ এরা পৃথিবী জুড়ে যে আণবিক বোমা তৈরি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল।

এদের এইসব পাগলামি সাধারণত ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে আগে দেখা দেয়। আমার ছাত্র বেন ওয়ালির মাথাতে এ রকম পাগলামি ভর করল। স্প্রিংকোয়ার্টারের শেষে ফাইন্যালের ঠিক আগে আগে আমাকে এসে বলল সে একটা বিশেষ কারণে টার্ম ফাইন্যাল পেপারটা জমা দিতে পারছে না।

আমি বললাম, বিশেষ কারণটা কি?

চুমুর দীর্ঘতম রেকর্ডটা ভাঙতে চাই। গিনিস বুকে নামটা যেন ওঠে।

আমি বেনের মুখে দিকে তাকিয়ে রইলাম। বলে কি এই ছেলে?

আমি বললাম, টার্ম ফাইন্যালের পরে চেষ্টা করলে কেমন হয়? তখন নিশ্চিন্ত মনে চালিয়ে যেতে পারবে। টার্ম ফাইন্যাল পেপার জমা না দিলে তো এই কোর্সটায় কোনো নম্বর পাবে না।

বেন বিরস মুখে চলে গেল। দু'দিন পর পেপার জমা দিয়ে দিল। আমি ভাবলাম মাথা থেকে ভূত নেমে গেছে। কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। যন্ত্রণা বাড়িয়ে লাভ নেই।

ভূত কিন্তু নামল না। আমেরিকানদের ঘাড়ের ভূত খুব সহজে নামে না। ভূতগুলিও আমেরিকানদের মতোই পাগলা। কাজেই এক বৃহস্পতিবার রাতে অর্থাৎ উইক-এন্ড শুরু হবার আগে আগে বেন রেকর্ড ভাঙার জন্য নেমে পড়ল। সঙ্গে স্বাস্থ্যবতী এক তরুণী– যার পোশাক খুবই উগ্র ধরনের। এই পোশাক না থাকলেই বরং উগ্রতাটা কম মনে হ'ত।

চুমুর ব্যাপারটা হচ্ছে মেমোরিয়াল ইউনিয়নের তিন তলায়। যথারীতি পোস্টার পড়েছে ম্যারাথন চুমু। দীর্ঘতম চুম্বনের বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হতে যাচ্ছে.. ইত্যাদি ইত্যাদি।

www.MurchOna.com

দেখলাম ব্যাপারটায় আয়োজনও প্রচুর। দুজন আছে রেকর্ড-কিপার, স্টপ ওয়াচ হাতে সময়ের হিসাব রাখছে। একজন আছেন নোটারি পাবলিক। যিনি সার্টিফিকেট দেবেন যে, দীর্ঘতম চুম্বনে কোনো কারচুপি হয়নি। এই নোটারি পাবলিক সারাক্ষণই থাকবেন কিনা বুঝতে পারলাম না। এদের মতো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এরকম একটা ফালতু জিনিস নিয়ে কী করে সময় নষ্ট করে বুঝতে পারলাম না।

বেন এবং মেয়েটিকে নাইলনের দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। কেউ সে বেষ্টনীর ভেতর যেতে পারছে না। বাজনা বাজছে। সবই নাচের বাজনা-ওয়াল্টজ। বাজনার তালে তালে এরা দু'জন নাচছে।

আমি মিনিট দশেক এই দৃশ্য দেখে চলে এলাম। এই জাতীয় পাগলামির কোনো মানে হয়?

পরদিন ভোরে আবার গেলাম। ম্যারাথন চুমু তখনো চলছে। তবে পাত্র-পাত্রী দুজন এখন সোফায় শুয়ে আছে। ঠোঁটে ঠোঁট লাগানো। বাজনা বাজছে। সেই বাজনার তালে তালে সমবেত দর্শকদের অনেকেই সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী নিয়ে খানিকক্ষণ নাচছে। রীতিমতো উৎসব।

আমি আমার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটিকে বললাম, ক্ষিধে পেলে ওরা করবে কী? ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে খাওয়া-দাওয়া তো করা যাবে না।

তরল খাবার খাবে স্ট্র দিয়ে। কিছুক্ষণ আগেই স্যুপ খেয়েছে।

আমি ইতস্তত করে বললাম বাথরুমে যাবার প্রয়োজন যখন হয় তখন কী করবে?

জানি না। বাথরুমের জন্যে কিছু সময় বোধ হয় অফ পাওয়া যায়। কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। ওদের জিজ্ঞেস কর।

আমার আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করল না। ততক্ষণে ফ্লোরে উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়ে গেছে। এক জোড়া বুড়োবুড়ি উদ্দাম নৃত্যে মেতেছে। ভয়াবহ লাফ-ঝাঁপ। তালে তালে হাত তালি পড়ছে। জমজমাট অবস্থা।

জানতে পারলাম এই বুড়োবুড়ি হচ্ছে বেন ওয়ালির বাবা এবং মা। তারা সুদূর মিনেসোটা থেকে ছুটে এসেছেন ছেলেকে উৎসাহ দেবার জন্যে। ছেলের গর্বে তাদের চোখমুখ উজ্জ্বল।

বেন ওয়ালি দীর্ঘতম চুম্বনের বিশ্ব-রেকর্ড ভাঙতে পারেনি। তবে সে খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল।

www.MurchOna.com

লাস ভেগাস

দিনটা ছিল বুধবার। জুন মাসের ষোলো বা সতেরো তারিখ। ডানবার হলের এক্সরে রুমে বসে আছি। আমার সামনে গাদা খানিক রিপোর্ট। আমি রিপোর্ট দেখছি এবং ঠাণ্ডা ঘরে বসেও রীতিমতো ঘামছি। কারণ গা দিয়ে ঘাম বের হবার মতো একটা আবিষ্কার করে ফেলেছি। পলিমার ক্লে ইন্টারেকশনের এমন একটা ব্যাপার পাওয়া গেছে যা আগে কখনো লক্ষ করা হয়নি। আবিষ্কারটি গুরুত্বপূর্ণ হবার সম্ভাবনা শতকরা ৮০ ভাগ।

আমি দেখিয়েছি যে, পলিমারের মতো বিশাল অণু ক্লে-র লেয়ারের ভেতর ঢুকে তার স্ট্রাকচার বদলে দিতে পারে। সব পলিমার পারে না, কিছু কিছু পারে। কোনো কোনো পলিমার ক্লে লেয়ারের ফাঁক বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। কেউ আবার কমিয়ে দেয়। অত্যন্ত অবাক হবার মতো ব্যাপার।

সন্ধ্যাবেলা আমি আমার প্রফেসরকে ব্যাপারটা জানালাম। তিনি খানিকক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন। ঝিম ভাঙবার পর বললেন, গোল্ড মাইন।

অর্থাৎ তিনি একটি স্বর্ণ-খনির সন্ধান পেয়েছেন। রাত দশটার দিকে তিনি বাসায় টেলিফোন করে বললেন, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির ৫৭তম অধিবেশন হবে নাভাদার লাস ভেগাসে। সেই অধিবেশনে আমরা আমাদের এই আবিষ্কারের কথা বলব।

আমি বললাম, খুবই ভালো কথা। কিন্তু এখনো ব্যাপারটা আমরা ভালোমতো জানি না। আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির মতো অধিবেশনে তাড়াহুড়া করে কিছু...

প্রফেসর আমার কথা শেষ করতে দিলেন না, ঘট করে টেলিফোন রেখে দিলেন।

পরদিন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে খুব চেষ্টা করলাম প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলতে। তিনি সেই সুযোগ দিলেন না। লেখালেখি নিয়ে খুব ব্যস্ত। যতবার কথা বলতে চাই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলেন– দেখছ একটা কাজ করছি, কেন বিরক্ত করছ। আমার কাজ নয়। এটা তোমারই কাজ।

www.MurchOna.com

সন্ধ্যাবেলা প্রফেসরের সেই কাজ শেষ হ'ল। তিনি তাঁর সমস্ত ছাত্রদের ডেকে গম্ভীর গলায় বললেন, আমার ছাত্র আহ্‌মাদ নাভাদার লাস ভেগাসে তার আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করবে। সে একটা পেপার দেবে। পেপারের খসড়া আমি তৈরি করে ফেলেছি।

আমার মাথা ঘুরে গেল। ব্যাটা বলে কী? পৃথিবীর সব বড় বড় রসায়নবিদরা জড়ো হবে সেখানে। এইসব জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে আমি কেন? এক অক্ষর ইংরেজী আমার মুখ দিয়ে বের হয় না। যা বের হয় তার অর্থ কেউ বুঝে না। আমি এ-কী বিপদে পড়লাম।

প্রফেসর বললেন, আহ্‌মাদ, তোমার মুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেন জানতে পারি?

আমি বক্তৃতা দিতে পারি না।

এটা খুবই সত্যি কথা।

আমি ইংরেজি বললে কেউ তা বুঝতে পারে না।

কারেক্ট। আমি এত দিন তোমার সঙ্গে আছি, আমি নিজেই বুঝি না। অন্যরা কী বুঝবে।

আমি খুবই নার্ভাস ধরনের ছেলে। কী বলতে কী বলব।

দেখ আহ্‌মাদ, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির অধিবেশনে কথা বলতে পারার সৌভাগ্য সবার হয় না। তোমার হচ্ছে।

এই সৌভাগ্য আমার চাই না।

বাজে কথা বলবে না। কাজটা তুমি করেছ। আমি চাই সম্মানের বড় অংশ তুমি পাও। কেন ভয় পাচ্ছ। আমি তোমার পাশেই থাকব।

আমি মনে মনে বললাম– ব্যাটা তুই আমাকে এ-কী বিপদে ফেললি।

পনেরো দিনের মধ্যে চিন্তায় চিন্তায় আমার দুপাউণ্ড ওজন কমে গেল। আমার দুশ্চিন্তার মূল কারণ হচ্ছে কাজটা আধাখেচড়াভাবে হয়েছে। কেউ যদি কাজের উপর জটিল কোনো প্রশ্ন করে বসে জবাব দিতে পারব না। এ রকম অপ্রস্তুত অবস্থায় এত বড় বিজ্ঞান অধিবেশনে যাওয়া যায় না। ব্যাটা প্রফেসর তা বুঝবে না।

প্রফেসর তার গাড়িতে করে আমাকে লাস ভেগাসে নিয়ে গেলেন। মরুভূমির ভেতর আলো ঝলমল একটি শহর। জুয়ার তীর্থভূমি। নাইট ক্লাব এবং ক্যাসিনোতে ভরা। দিনের বেলা এই শহর ঝিম মেরে তাকে। সন্ধ্যার পর জেগে ওঠে। সেই জেগে ওঠাটা ভয়াবহ।

www.MurchOna.com

আমার প্রফেসরেরও এই প্রথম লাস ভেগাসে আগমন। তিনিও আমার মতোই ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছেন। হা হয়ে দেখছেন রাস্তার অপূর্ব সুন্দরীদের ভীড়। প্রফেসর আমার কানে কানে বললেন, এই একটি জায়গাতেই প্রসটিটিউশন নিষিদ্ধ নয়। যাদের দেখছ, তাদের প্রায় সবাই এ জিনিস। দেখবে পৃথিবীর সব সুন্দরী মেয়েরা এসে টাকার লোভে এখানে জড় হয়েছে।

কিছুদূর এগুতেই এক সুন্দরী এগিয়ে এসে বলল, সান্ধ্যকালীন কোনো বান্ধবীর কি প্রয়োজন আছে?

আমি কিছু বলবার আগেই প্রফেসর বললেন, না ওর কোনো বান্ধবীর প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি নীল চোখ তুলে শান্ত গলায় বললেন, তোমাকে তো জিগ্গেস করিনি। তুমি কথা বলছ কেন?

আমি বললাম, তোমায় ধন্যবাদ, আমার বান্ধবীর প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি বলল, সুন্দর সন্ধ্যাটা একা একা কাটাবে। এক গ্লাস বিয়ারের বদলে আমি তোমার পাশে বসতে পারি।

আমরা কথা না বলে এগিয়ে গেলাম। পথে আরো দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা হ'ল। এদের একজন মধুর ভঙ্গিতে বলল, তোমাদের কি ডেট লাগবে? লাগলে লজ্জা করবে না।

আমার প্রফেসর মুখ গম্ভীর করে আমাকে বুঝালেন,– এরা ভয়াবহ ধরনের প্রস্টিটিউট। তোমার কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত গায়ে হাত পর্যন্ত দিতে দেবে না। পত্রপত্রিকায় এদের সম্পর্কে অনেক লেখালেখি হয়েছে।

প্রফেসরের ভাব এরকম যে গায়ে হাত দিতে দিলে তিনি রাজি হয়ে যেতেন।

রাতের খাবার খেতে আমরা যে রেস্টুরেন্টে গেলাম তা হচ্ছে টপলেস রেস্টুরেন্ট। অর্থাৎ ওয়েট্রেসদের বুকে কোনো কাপড় থাকবে না। বইপত্রে এইসব রেস্টুরেন্টের কথা পড়েছি। রাস্তায় এই প্রথম দেখলাম। আমার লজ্জায় প্রায় মাথা কাটা যাবার মতো অবস্থা। মেয়েগুলিকে মনে হলো আড়ষ্ট ও প্রাণহীন। এদের মুখের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না, সবাই তাকাচ্ছে বুকের দিকে। কাজেই তারা খানিকটা প্রাণহীন হবেই। চোখের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। চোখের উপর চোখ রেখে আমরা সেই ভাষায় কথা বলি। এই সব মেয়ে চোখের ভাষা কখনো ব্যবহার করতে পারে না। এরা বড় দুঃখী।

প্রফেসর বিরক্ত মুখে আমাকে বললেন, আমাদের এই টেবিলে বসাটাই ভুল হয়েছে। এই টেবিলের ওয়েট্রেসদের বুকের দিকে তাকিয়ে দেখ। ছেলেদের বুক এরচে অনেক ডেভেলপড্ হয়। এর বুক দেখে মনে হচ্ছে প্রেইরির সমতলভূমি।

www.MurchOna.com

রাতের খাবারের পর আমরা একটা শো দেখলাম। প্রায় নগ্ন কিছু নারীপুরুষ মিলে গান বাজনা নাচ করল। একটি জাপানি মেয়ে সারা শরীর পালকে ঢেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দর্শকদের কাছে আসছে দর্শকরা একটা করে পালক তুলে নিচ্ছে। তার গা ক্রমশ খালি হয়ে আসছে। সর্বশেষ পালকটি তার গা থেকে খুলে নেবার পর সে স্টেজে চলে গেল এবং চমৎকার একটি নাচ দেখাল। যে মেয়ে এত সুন্দর নাচ জানে তার খালি গা হবার প্রয়োজন পড়ে না।

রাত বারটায় শো শেষ হবার পর আমার প্রফেসর বললেন, লাস ভেগাসে রাত শুরু হয় বারোটার পর। এখন হোটেলে গিয়ে ঘুমুবার কোনো মানে হয় না।

আমি বললাম, তুমি কি করতে চাও?

জুয়া খেলবে নাকি?

জুয়া কী করে খেলতে হয়, আমি জানি না।

আমিও জানি না। তবে স্লট মেশিন জিনিসটা বেশ মজার। নিকেল, ডাইম কিংবা কোয়ার্টার (বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা) মেশিনের ফোকরে ফেলে একটা হাতল ধরে টানতে হয়। ভাগ্য ভালো হলে কম্বিনেশন মিলে যায়, ঝনঝন শব্দে প্রচুর মুদ্রা বেরিয়ে আসে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের দুজনের নেশা ধরে গেল। মুদ্রা ফেলি আর স্লট মেশিনের হাতল ধরে টানি। দেখা গেল প্রফেসরের ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন। জ্যাক পট পেয়ে গেলেন। এক কোয়ার্টারে প্রায় একশ ডলার। তার সামনে মুদ্রার পাহাড়।

ক্যাসিনো থেকে কিছুক্ষণ পর পর বিনামূল্যে শ্যাম্পেন খাওয়ানো হচ্ছে। ক্যাসিনো যেন বিরাট এক উৎসবের ক্ষেত্র। আমি মুগ্ধ চোখে ঘুরে ঘুরে দেখলাম– ক্যাসিনোর এক একটা টেবিলে কত লক্ষ টাকারই না লেনদেন হচ্ছে। কত টাকাই না মানুষের আছে।

রাত তিনটার দিকে আমরা হোটেলে ফিরলাম। এর মধ্যে আমার প্রফেসর দু'শ ডলার হেরেছেন। আমার কাছে ছিল সত্তর ডলার, তার সবটাই চলে গেছে। আমাকে প্রফেসরের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হবে এবং তা করতে হবে আজ রাতের মধ্যেই। কারণ আমার ধারণা এই লোক আবার ক্যাসিনোতে যাবে এবং তাঁর শেষ কপর্দকও স্লট মেশিনে চলে যাবে।

রাতে এক ফোঁটা ঘুম হলো না। সমস্ত দিনের উত্তেজনার সঙ্গে যোগ হয়েছে আগামী দিনের সেশনের দুশ্চিন্তা।

হোটেলের যে ঘরে আমি আছি তা আহামরি কিছু নয়। দুটি বিছানা। একটিতে আমি অন্যটিতে থাকবে আমাদের ইউনিভার্সিটিরই এক ছাত্র, জিম। সে

এখনো ফেরেনি। সম্ভবত কোনো ক্যাসিনোতে আটকা পড়ে গেছে। রাতে আর ফিরবে না।

আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরল। চেখের সামনে পুরো দিগম্বর হয়ে সটান পাশের বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমেরিকানদের এই ব্যাপারটা আমাকে সব সময় পীড়া দেয়। একজন পুরুষের সামনে অন্য একজন পুরুষ কাপড় খুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

ডরমিটরি গোসলখানায় এক সঙ্গে অনেকে নগ্ন হয়ে স্নান পর্ব সারে। ব্যবস্থাই এরকম। হয়ত এটাকেই এরা অগ্রসর সভ্যতার একটা ধাপ বলে ভাবছে। এই প্রসঙ্গে ওদের সঙ্গে আমি কোনো কথা বলিনি। বলতে ইচ্ছা করেনি।

কেমিক্যাল সোসাইটির মিটিং-এ গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম। যা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। উৎসব ভালো। পেপারের চেয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাই প্রধান। আলাপের বিষয় একটাই– কেমিস্ট্রি।

এই বিষয়ের বড় বড় সব ব্যক্তিত্বকেই দেখলাম। রসায়নে দুই বছর আগে নোবেল পুরস্কার পাওয়া এক বিজ্ঞানীকে দেখলাম লালরঙের একটা গেঞ্জি পরে এসেছেন– সেখানে লেখা 'আমি রসায়নকে ঘৃণা করি।'

অধিবেশনটি ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এক সঙ্গে অনেক অধিবেশন চলছে। যার যেটি পছন্দ সে সেখানে যাচ্ছে।

আমাদের অধিবেশনে পঞ্চাশজনের মতো বিজ্ঞানীকে দেখা গেল। আমার আগে বেলজিয়ামের লিয়েগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী পেপার পড়লেন। তাঁকে এমনভাবে চেপে ধরা হলো যে ভদ্রলোক শুধু কেঁদে ফেলতে বাকি রাখলেন। আমি ঘামতে ঘামতে এই জীবনে যতগুলি সুরা শিখেছিলাম সব মনে মনে পড়ে ফেললাম। আমার মনে হচ্ছিল বক্তৃতার মাঝখানেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। এম্বুলেন্স করে আমাকে হাসপাতালে নিতে হবে। আমার বক্তৃতার ঠিক আগে আগে প্রফেসর উঠে বাইরে চলে গেলেন। এই প্রথম বুঝলাম চোখে সর্ষে ফুল দেখার উপমাটি কত খাঁটি। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার কোনোরকম বাধা ছাড়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শুরু হ'ল। প্রথম প্রশ্ন শুনে আমার পিলে চমকে গেল। আমি যখন বলতে যাচ্ছি– এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, ঠিক তখনই আমার প্রফেসর উদয় হলেন এবং প্রশ্নের জবাব দিলেন। ঝড়ের মতো প্রশ্ন এল, ঝড়ের মতোই উত্তর দিলেন প্রফেসর গ্লাস। আমি মনে মনে বললাম, ব্যাটা বাঘের বাচ্চা, পুরোপুরি তৈরি হয়ে এসেছে।

সেশন শেষে প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার আমার বক্তৃতা কেমন হয়েছে?

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, এত চমৎকার একটি বিষয় নিয়ে এত বাজে বক্তৃতা আমি এই জীবনে শুনিনি।

বলেই হেসে ফেললেন এবং হাসতে হাসতে যোগ করলেন, তাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ কাজটাই প্রধান, বক্তৃতা নয়।

কিভাবে সেলিব্রেট করবো?

শ্যাম্পেন দিয়ে।

আর কিভাবে?

এক বোতল শ্যাম্পেন কেনা হ'ল। ব্যাটা পুরোটা গলায় ঢেলে দিয়ে গুনগুন করে গান ধরল–

"Pretty girls are everywhere
If you call me I will be there..."

www.MurchOna.com
===

শীলার জন্ম

আমার দ্বিতীয় মেয়ে শীলার জন্ম আমেরিকায়। জন্ম এবং মৃত্যুর সব গল্পই নাটকীয়, তবে শীলার জন্ম মুহূর্তে যে নাটক হয়, তাতে আমার ভূমিকা আছে বলে গল্পটি বলতে ইচ্ছা করছে।

তারিকটা হচ্ছে ১৫ই জানুয়ারি।

প্রচণ্ড শীত পড়েছে। বরফে বরফে সমস্ত ফার্গো শহর ঢাকা পড়ে গেছে। শেষরাত থেকে নতুন করে তুষারপাত শুরু হ'ল। আবহাওয়া দপ্তর জানাল—

'নিতান্ত প্রয়োজন না হলে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বের হবে না।' আমার ঘরের হিটিং ঠিকমতো কাজ করছিল না। ঘর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। দুতিনটি কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছি। এ-রকম দুর্যোগের দিনে ইউনিভার্সিটিতে কী করে যাব তাই ভাবছি। দেশে যেমন প্রচণ্ড বৃষ্টি-বাদলার দিনে 'রেইনি ডে'-র ছুটি হয়ে যেত, এখানে স্নো ডে বলে তেমন কিছু নেই। চার ফুট বরফে শহর ঢাকা পড়ে গেছে, অথচ তারপরও ইউনিভার্সিটির কাজকর্ম ঠিকমতো চলছে।

সকালবেলার ঘুমের মতো আরামের ব্যাপার এই জগতে খুব বেশি নেই। সেই আরাম ভোগ করছি, ঠিক তখন গুলতেকিন আমাকে ডেকে তুলে ফ্যাকাশে মুখে বলল, আমার যেন কেমন লাগছে।

আমি বললাম, ঠিক হয়ে যাবে।

বলেই আমার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, তুমি বুঝতে পারছ না, এটা মনে হচ্ছে ঐ ব্যাপার।

ঐ ব্যাপার মানে?

মনে হচ্ছে...

মেয়েরা ধাঁধা খুব পছন্দ করে। আমি লক্ষ করেছি, যে-কথা সরাসরি বললেও কোনো ক্ষতি নেই সেই কথাও তারা ধাঁধার মতো বলতে চেষ্টা করে। তার ব্যথা উঠেছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এটা বুঝতে আমার দশ মিনিটের মতো লাগল। যখন বুঝলাম তখন স্পাইন্যাল কর্ড দিয়ে হিমশীতল একটা স্রোত বয়ে গেল। কী সর্বনাশ।

www.MurchOna.com

আমি শুকনো গলায় বললাম, ব্যথা কি খুব বেশি?

না, বেশি না। কম। তবে ব্যথাটা ঢেউয়ের মতো আসে, চলে যায়, আবার আসে। এখন ব্যথা নেই।

তাহলে তুমি রান্নাঘরে চলে যাবে, চা বানাও। চা খেতে খেতে চিন্তা করি প্ল্যান অব অ্যাকশন।

চিন্তা করার কী আছে? তুমি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে– ব্যস।

কথা না-বাড়িয়ে চা বানাও। আবার ব্যথা শুরু হলে মুশকিল হবে।

সে রান্নাঘরে চলে গেল। আমি প্ল্যান অব অ্যাকশন ভাবতে বসলাম। গুলতেকিন পুরো ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছে, এটা মোটেই তত সহজ না। প্রধান সমস্যা এই প্রচণ্ড দুর্যোগে তাকে হাসপাতালে নিয়ে পৌঁছানো। এ ছাড়াও ছোটখাট সমস্যা আছে, যেমন নোভাকে কোথায় রেখে যাব? কে তার দেখাশোনা করবে? হাসপাতালে গুলতেকিনকে কতদিন থাকতে হবে? এই দিনগুলিতে নোভাকে সামলাব কিভাবে?

নাও, চা খাও। চা খেয়ে দয়া করে কাপড় পর।

নোভাকে কী করব?

কিছু করতে হবে না। আমি ফরিদকে টেলিফোন করে দিয়েছি, সে এসে পড়বে।

ডাক্তারকেও তো খবর দেয়া দরকার।

খবর দিয়েছি।

কাজ তো দেখি অনেক এগিয়ে রেখেছ।

হ্যাঁ, রেখেছি। প্লিজ, চা-টা তাড়াতাড়ি শেষ কর।

চা শেষ করবার আগেই ফরিদ এসে পড়ল। সে কানাডা থেকে এম-এস করে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ-ডি করতে এসেছে। এই ছেলেটি পাকিস্তানী। পাকিস্তানী কারো সঙ্গে নীতিগতভাবেই আমি কোনো যোগাযোগ রাখি না। একমাত্র ব্যতিক্রম ফরিদ। পৃথিবীতে এক ধরনের মানুষ জন্মায় যাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে পরের উপকার করা। পরের উপকার করবার সময়টাতেই তারা খানিকটা হাসিখুশি থাকে, অন্য সময় বিমর্ষ হয়ে থাকে। আমি আমার চল্লিশ বছরের জীবনে ফরিদের মতো ভালো ছেলে দ্বিতীয়টি দেখিনি, ভবিষ্যতে দেখব সেই আশাও করি না।

নোভাকে ফরিদের কাছে রেখে আমি হাসপাতালের দিকে রওনা হলাম। বরফ ঢাকা রাস্তায় আমার ডজ পোলারা গাড়ি চলছে। পেছনের সিটে গুলতেকিন কাত

হয়ে শুয়ে আছে, মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে কাতরাচ্ছে। আমি বললাম, ব্যথা কি খুব বেড়েছে?

তুমি গাড়ি চালাও। কথা বলবে না। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাও। আমার মনে হচ্ছে বেশি দেরি নেই।

কী সর্বনাশ। আগে বলবে তো।

আমি একসিলেটরে পা পুরোপুরি দাবিয়ে দিলাম। গাড়ি চলল উল্কার গতিতে। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলেই অ্যাকসিডেন্ট না করে সেইন্ট লিউক হাসপাতালে পৌঁছতে পারলাম।

নার্স এসে দেখেশুনে বলল, এক্ষুণি ডেলিভারি হবে, চল ও-টিতে যাই।

গুলতেকিনের চিকিৎসকের নাম ড. মেলয়। ডেলিভারি তিনিই করবেন। আমেরিকান ডাক্তারদের সবার কাছেই ওয়াকি টকি জাতীয় একটি যন্ত্র থাকে। তিনি যেখানেই থাকেন তাঁর সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করা যায়। হাসপাতাল থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হ'ল। তিনি বললেন, এক মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি।

আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যখন সিগারেট ধরিয়েছি তখন হাসপাতালের মেট্রন বলল, তুমি চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

অপারেশন থিয়েটারে।

কেন?

তুমি তোমার স্ত্রীর পাশে থাকবে। তাকে সাহস দেবে।

ও খুবই সাহসী মেয়ে। ওকে সাহস দেবার কোনো দরকার নেই।

বাজে কথা বলবে না। তুমি এসো আমার সঙ্গে। ডেলিভারির সময় আমরা কাউকে ঢুকতে দেই না। শুধু স্বামীকে থাকতে বলি। এর প্রয়োজন আছে।

আমি তেমন কোনো প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি না।

যা ঘটতে যাচ্ছে তার অর্ধেক দায়ভাগ তোমার। তুমি এরকম করছ কেন?

আমি মেট্রনের সঙ্গে রওনা হলাম। ও-টিতে ঢোকার প্রস্তুতি হিসেবে আমাকে মাস্ক পরিয়ে দিল। অ্যাপ্রন গায়ে চড়িয়ে দিল। এক ধরনের বিশাল মোজায় পা ঢেকে দেয়া হলো। আমি ও-টিতে ঢুকলাম। অপারেশন থিয়েটারটি তেমন আলোকিত নয়। আমার কাছে অন্ধকার লাগল। একটা ছোট এবং যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। ফিনাইলের যে কটু গন্ধ হাসপাতালে পাওয়া যায় তেমন গন্ধও পেলাম না, তবে নেশা ধরানোর মতো মিষ্টি সৌরভ ঘরময় ছড়ানো।

গুলতেকিনকে বিশেষ ধরনের একটা টেবিলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার

www.MurchOna.com

দুপাশে দুজন নার্স। ডা. মেলয় এসে পড়েছেন, তিনি ছুরি-কাঁচি গুছিয়ে রাখছেন। তাদের প্রত্যেকের মুখে মাস্ক থাকার জন্য তাদের দেখাচ্ছিল ক্লু ক্লাক্স ক্লান-এর সদস্যদের মত। তাদের ঠিক মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল তারা যেন একদল রোবট। আমি গুলতেকিনের হাত ধরে দাঁড়ালাম।

ডেলিভারি পেইনের কথাই শুধু শুনেছি, এই ব্যথা যে কত তীব্র, কত তীক্ষ্ণ এবং কত ভয়াবহ সেই সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। এই প্রথম ধারণা হ'ল। ঘামে আমার সমস্ত শরীর ভিজে গেল। থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। গলা কাটা কোরবানীর পশুর মতো গুলতেকিন ছটফট করছে। এক সময় আমি ডাক্তারকে বললাম, আপনি দয়া করে পেইন কিলার দিয়ে ব্যথা কমিয়ে দিন। ডাক্তার নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, পেইন কিলার দেয়া যাবে না। পেইন কিলার দেয়া মাত্র কন্টাকশনের সমস্যা হবে। আর মাত্র কিছুক্ষণ।

সেই কিছুক্ষণ আমার কাছে অনন্তকাল বলে মনে হ'ল। মনে হলো আমি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমার স্ত্রীর হাত ধরে প্রতীক্ষা করছি।

একসময় প্রতীক্ষার অবসান হ'ল, জন্ম হলো আমার দ্বিতীয় কন্যা শীলার। হাত পা ছুঁড়ে সে কাঁদছে, সরবে এই পৃথিবীতে তার অধিকার ঘোষণা করছে। যেন সে বলছে, এই পৃথিবী আমার, এই গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য আমার, এই অনন্ত নক্ষত্রবীথি আমার।

গুলতেকিন ক্লান্ত গলায় বলল, তুমি চুপ করে আছো কেন, আজান দাও। বাচ্চার কানে আল্লাহর নাম শোনাতে হয়।

আমি আমার ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললাম, আল্লাহু আক্‌বর...

নার্সের হাতে একটা ট্রে ছিল। ভয় পেয়ে সে ট্রে ফেলে দিল। ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, What is happening?

তাদের কোনো কথাই আমার কানে ঢুকছে না। আমি অবাক হয়ে দেখছি আমার শিশু কন্যাকে। সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। পৃথিবীর রূপরসগন্ধ হয়তো-বা ইতিমধ্যেই তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। আমি প্রার্থনা করলাম, যেন পৃথিবী তার মঙ্গলময় হাত প্রসারিত করে আমার কন্যার দিকে। দুঃখ-বেদনার সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রগাঢ় আনন্দ বারবার আন্দোলিত করে আমার মা-মণিকে।

www.MurchOna.com

পাখি

উইন্টার কোয়াটার শুরু হয়েছে। শীত এখনো তেমন পড়েনি। ওয়েদার ফোরকাস্ট হচ্ছে দু'একদিনের মধ্যে প্রথম তুষারপাত হবে। এ বছর অন্য সব বছরের চেয়ে প্রচণ্ড শীত পড়বে,- এরকম কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। প্রাচীন মানুষেরা আকাশের রঙ দেখে শীতের খবর বলতে পারতেন। স্যাটেলাইটের যুগেও তাদের কথা কেমন করে জানি মিলে যায়।

ভোরবেলা ক্লাসে রওনা হয়েছি। ঘর থেকে বের হয়ে মনে হলো আজ ঠাণ্ডাটা অনেক বেশি। বাতাসের প্রথম ঝাপটায় মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি ফিরে এসে পার্কা গায়ে দিয়ে রওনা হলাম। পার্কা হচ্ছে এমন এক শীতবস্ত্র যা পরে শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রি নিচেও দিব্যি ঘোরাফেরা করা যায়।

হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি পায়ের সামনে চড়ুই পাখির মতো কালো রঙয়ের একটা পাখি 'চিকু চিকু' ধরনের শব্দ করছে। মনে হলো শীতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আমি পাখিটিকে হাতে উঠিয়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার আঙুলে ঠোঁট ঘষতে লাগলো। আমার মনে হলো পাখিদের কায়দায় সে বলল–তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তাকে নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। উদ্দেশ্য, আমার কন্যাকে পাখিটা দেব। সে জীবন্ত খেলনা পেয়ে উল্লসিত হবে। শিশুদের উল্লাস দেখতে বড় ভালো লাগে।

আমার কন্যা পাখি দেখে মোটেই উল্লসিত হলো না। ভয় পেয়ে চেঁচাতে লাগলো। মুগ্ধ হলো মেয়ের মা। সে বারবার বলতে লাগল– ও মা কী সুন্দর পাখি। ঠোঁটগুলো দেখ, মনে হচ্ছে চব্বিশ ক্যারেট গোল্ডের তৈরি। সে পাখিকে পানি খেতে দিল, ময়দা গুলে দিল। পাখি কিছুই স্পর্শ করল না। একটু পরপর বলতে লাগল 'চিকু চিকু'। ক্লাসের দেরি হয়ে যাচ্ছিল, আমি ক্লাসে চলে গেলাম। পাখির কথা আর মনে রইল না।

বিকেল তিনটার দিকে আমার কাছে একটা টেলিফোন এল। এক আমেরিকান তরুণী খুবই পলিশ্‌ড গলায় বলল, মি. আমেদ, তুমি কি কোনো পাখি কুড়িয়ে পেয়েছ?'

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এই খবর জানলে কোত্থেকে?

আমার বস আমাকে বললেন, আমি ফারগো পশু-পাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির অফিস থেকে বলছি।

আমি আতংকিত গলায় বললাম, পাখিকে বাসায় নিয়ে যাওয়া কি বেআইনি?

না, বেআইনি নয়। আমরা তোমার পাখিকে পরীক্ষা করতে চাই। মনে হচ্ছে ওর ডানা ভেঙে গেছে।

আমি কি পাখিকে নিয়ে আসবো?

তোমাকে আসতে হবে না, আমাদের লোক গিয়ে নিয়ে আসবে। তোমার অ্যাপার্টমেন্টের নাম্বার বল।

আমি নাম্বার বললাম। এবং মনে মনে ভাবলাম, এ–কী যন্ত্রণার পড়া গেল। বাসায় এসে দেখি পাখিটির জন্য আমার স্ত্রী কার্ডবোর্ডের একটা বাসা বানিয়েছে। নানান খাদ্যদ্রব্য তাকে দেওয়া হচ্ছে। সে কিছু কিছু খাচ্ছেও। তবে আমার কন্যার ভয় ভাঙেনি। সে মার কোল থেকে নামছে না। পাখির কাছে নিয়ে গেলেই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে।

আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম পাশের অ্যাপার্টমেন্টের এক মহিলা এসেছিলেন বেড়াতে, পাখি দেখে তিনিই টেলিফোন করেন।

পশু-পাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির লোক এসে সন্ধ্যার আগে পাখি নিয়ে গেল। রাত আটটায় টেলিফোন করে জানালো যে পাখিটার ডানা ভাঙা। এক্সরেতে ধরা পড়েছে। তাকে পশু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ডানা জোড়া লাগানো যায়। যদিও এসব ক্ষেত্রে চেষ্টা সাধারণত ফলপ্রসূ হয় না।

আমি মনে মনে ভাবলাম, এ তো দেখি ভালো যন্ত্রণা হ'ল। মুখে বললাম, আমি খুবই আনন্দিত যে পাখিটার একটা গতি হচ্ছে। পাখি নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

সাতদিন কেটে গেল। পাখির কথা প্রায় ভুলতে বসেছি, তখন টেলিফোন এল হাসপাতাল থেকে। ডাক্তার সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, ডানা জোড়া লেগেছে।

আমি বললাম, ধন্যবাদ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

পাখিটি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। আমার মেয়ে এই পাখি ঠিক পছন্দ করছে না। সে উলের কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে পাখিটাকে মেরে ফেলতে পারে বলে আমার ধারণা।

তাহলে তো বিরাট সমস্যা হ'ল।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

কী সমস্যা?

দেখ, এটা হচ্ছে মাইগ্রেটরি বার্ড। শীতের সময়ে গরমের দেশে উড়ে চলে যায়। সমস্যাটা হলো ফারগোতে শীত পড়ে গেছে। এই গোত্রের পাখি সব উড়ে চলে গেছে। একমাত্র তোমার পাখিটিই যেতে পারেনি।

এখন করণীয় কী?

ছ'মাস পাখিটাকে পালতে হবে। গোটা শীতকালটা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আমি তোমাকে আগেই বলেছি আমার পক্ষে সম্ভব না।

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, কোন কুক্ষণে জানি এই পাখি ঘরে এনেছিলাম।

একদিন পর আবার পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির বড়-কর্তার টেলিফোন, আমেদ, তুমি নাকি তোমার পাখি নিতে রাজি হচ্ছ না?

এটা আমার পাখি না। বনের পাখি। খানিকক্ষণের জন্যে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম।

পাখিটির এই দুঃসময়ে তুমি তার পাশে দাঁড়াবে না? এই মাইগ্রেটরি পাখি যাবে কোথায়?

আমি খাঁটি বাংলা ভাষায় বললাম, জাহান্নামে যাক।

তুমি কী বললে?

বললাম যে তোমরা একটা ব্যবস্থা কর। আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমার মেয়ে পাখি পছন্দ করে না। আমি বরং এই ছ'মাস পাখিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে যা খরচ হয় তা দিতে রাজি আছি।

ভদ্রলোক বললেন, দেখি কী করা যায়। বাকি দিনগুলি আতংকের মধ্যে কাটতে লাগলো। টেলিফোন বাজলেই চমকে উঠি, ভাবি এই বুঝি পশুপাখিওয়ালারা নতুন ঝামেলা করছে।

দিন দশেক পার হ'ল। আমি হাঁফ ছেড়ে ভাবলাম, যাক আপদ চুকেছে। তখন আবার টেলিফোন। সেই পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতি। তবে এবার তাদের গলায় আনন্দ ঝরে পড়ছে।

আমেদ, সুসংবাদ আছে।

কী সুসংবাদ?

তোমার পাখির একটা গতি করা গেছে।

তাই নাকি? বাহ্ কী চমৎকার।

www.MurchOna.com

আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সিয়াটল ওয়াশিংটনে এই পাখি এখনো আছে, সিয়াটলে শীত এখনো তেমন পড়েনি। কাজেই পাখিরা মাইগ্রেট করেনি।

বল কী?

আমরা তোমার পাখিটি সিয়াটল পাঠিয়ে দিচ্ছি। সিয়াটলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে, সে অন্য পাখিদের সঙ্গে মিশে মাইগ্রেট করবে।

অসাধারণ।

আগামী মঙ্গলবার পাখিটি সিয়াটল যাচ্ছে। তুমি বেলা তিনটায় গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশনে চলে আসবে। শেষবারের মতো তোমার পাখিটাকে হ্যালো বলবে।

অবশ্যই বলব।

সিয়াটল ফার্গো থেকে তিন হাজার মাইল দূরে। পাখিটাকে খাঁচায় করে গ্রে হাউন্ড বাসের ড্রাইভারের হাতে তুলে দেয়া হলো। আমি হাত নেড়ে পাখিটাকে বাই জানালাম।

মনে মনে বললাম, এই আমেরিকানরাই মাইলাই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। বোমা ফেলে হিরোশিমা নাগাশাকিতে। কী করে তা সম্ভব হয় কে জানে।

www.MurchOna.com

ক্যাম্পে

আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল আমেরিকানরা জাতি হিসাবে আধাপাগল। এদের রক্তে পাগলামি মিশে আছে। এমন সব কাণ্ডকারখানা করে যা বিদেশী হিসেবে বিস্মিত হওয়া ছাড়া আমাদের কিছু করার থাকে না। যেমন ওদের ক্যাম্পিং–এর ব্যাপারটা ধরা যাক। আগে ক্যাম্পিং বিষয়ে কিছুই জানতাম না। কেউ আমাকে কিছু বলেও নি নিজেই লক্ষ করলাম, সামারের ছুটিতে দলবল নিয়ে এরা কোথায় যায়। ফিরে আসে কাকতাড়ুয়া হয়ে, গায়ের চামড়া খসখসে, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, চুল উস্কুখুস্কু। ওজনও অনেক কমে গেছে। সেই কারণেই হয়ত সবাইকে খানিকটা লম্বা দেখায়। কোথায় গিয়েছিলে জিজ্ঞেস করলে বলে, –ক্যাম্পে।

সেটা কি?

ক্যাম্পিং কি তুমি জান না?

না।

আমার 'না' শুনে তারা এমন একটি ভঙ্গি করে– যেন আমার মতো জংলি এ দেশে কেন এল তা তারা বুঝতে পারছে না।

খোঁজ নিয়ে জানলাম প্রতিটি আমেরিকান পরিবার বছরে খানিকটা জংগলে কাটায়। তাঁবুটাবু নিয়ে কোনো-এক বিজন বনে চলে যায়। একে তারা বলে প্রকৃতির কাছাকাছি চলে যাওয়া।

ল্যাবরেটরিতে আমার সঙ্গে কাজ করে কোয়াভাল। সে তার ছেলে বন্ধুকে নিয়ে ক্যাম্পিং-এ গেল। ফিরে এল হাতে এবং পায়ে গভীর ক্ষতচিহ্ন নিয়ে। গিজলি বিয়ার (প্রকাণ্ড ভালুক) নাকি তাদের তাঁবু আক্রমণ করেছিল। ভয়াবহ ব্যাপার। অথচ রুথ কোয়াভাল এমন ভাব করছে যেন জীবনে এরকম ফান হয়নি। আমি মনে মনে বললাম, বদ্ধ উন্মাদ।

উন্মাদ রোগ সম্ভবত ছোঁয়াচে, কারণ পরের বছর আমি নিজেও ক্যাম্পিং-এ যাব বলে ঠিক করে ফেললাম। দেখাই যাক ব্যাপারটা কি। আমার দ্বিতীয় মেয়েটির বয়স তখন তিন মাস। ফার্গো শহরে যে কটি বাঙালি পরিবার সে সময় ছিল সবাই আমাকে আটকাবার চেষ্টা করল। তাদের যুক্তি– এত বাচ্চা একটা

www.MurchOna.com

মেয়ে নিয়ে এরকম পাগলামির কোনো মানে হয় না। মানুষের উপদেশ আমি খুব মন দিয়ে শুনি, তবে উপদেশ মতো কখনো কিছু করি না। কাজেই চল্লিশ ডলার দিয়ে ইউনিভারসিটি থেকে একটা তাঁবু ভাড়া করলাম, একটা এলুমিনিয়ামের নৌকা ভাড়া করলাম, আর ভাড়া করলাম ক্যাম্পিং-এর জিনিসপত্র। সেই সব জিনিসপত্রের মধ্যে আছে কুড়াল, ফার্স্ট এইড বক্স, সাপে কাটার অষুধ এবং কী আশ্চর্য একটা হ্যারিকেন। খোদ আমেরিকাতেও যে কেরোসিনের হ্যারিকেন পাওয়া যায় কে জানত।

যথাসময়ে গাড়ির ছাদে নৌকা বেঁধে রওয়ানা হয়ে গেলাম। গায়ে ক্যাম্পিং-এর পোশাক– হাফ প্যান্ট এবং বস্তার মতো মোটা কাপড়ের প্ল্যাপ দেয়া শার্ট, মাথায় ক্রিকেট আম্পায়ারদের টুপির মতো ধবধবে সাদা টুপি। গাড়ি চলছে ঝড়ের গতিতে। বনে যাবার এই হচ্ছে নিয়ম। স্পিডিং-এর জন্য পুলিশ অবশ্যই গাড়ি থামাবে, তবে যখন বুঝবে এই দল ক্যাম্পিং-এ যাচ্ছে তখন কিছু বলবে না। ক্যাম্পিং-এর প্রতি সবারই কিছুটা দুর্বলতা আছে।

ফার্গো শহর থেকে দু'শ দশ কিলোমিটার দূরে এটা ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে গাড়ি থামালাম। সমস্ত আমেরিকা জুড়ে অসংখ্য ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড আছে। ব্যক্তিমালিকানায় এইসব পরিচালিত হয়। টাকার বিনিময়ে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে ঢোকা যায়। সেখানে ছোটখাটো একটা অফিস থাকে। বিজন জংলি জায়গা হলেও অফিসটা খুব আধুনিক হয়। টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকে, ছোটখাটো বার থাকে, গ্রোসারি শপ এবং বেশ কিছু ভেন্ডিং মেশিন থাকে। সাধারণত স্বামী-স্ত্রী মিলে অফিস এবং দোকানপাট দেখাশোনা করেন।

আমার গাড়ি ঢোকা মাত্রই ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডের ওয়ার্ডেন বিশালদেহীএক আমেরিকান বের হয়ে এল এবং অনেকটা মুখস্থ বক্তৃতার মতো বলল, তুমি চমৎকার একটি জায়গায় এসেছ। এর চেয়ে ভালো ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড নর্থ আমেরিকায় আর নেই। আমরা তুলনামূলকভাবে টাকা বেশি নিই।, তবে এক রাত কাটালেই বুঝতে পারবে কেন নিই। এমন অপূর্ব দৃশ্য তুমি কোথায়ও পাবে না। তোমার সামনে সল্ট হ্রদের নীল জলরাশি,পেছনে গভীর বন।এ ছাড়াও তুমি পাচ্ছ আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ, যেমন খবরের কাগজ এবং ফ্ল্যাস টয়লেট...

ভদ্রলোকের বক্তৃতার মাঝখানেই আমি বললাম, কত দিতে হবে?

দেখা গেল টাকার পরিমাণ আসলেই অনেক বেশি।হ্রদে নৌকা ভাসানোর জন্য ফী দিতে হলো, মাছ কেনার জন্য পারমিট কিনতে হলো ... নানা ফ্যাকড়া।

ঝামেলা মিটিয়ে রওয়ানা হলাম জায়গা বাছতে। কোথায় তাঁবু ফেলব সেই

www.MurchOna.com

জায়গা। ওয়ার্ডেনের স্ত্রী (উনার সাইজও কিংকং-এর মতো) আমাকে সাহায্য করতে নিজেই এগিয়ে এলেন। হ্রদের পাশে এসে চোখ জুড়িয়ে গেল। কাচের মতো স্বচ্ছ জল। দশ ফুট নিচের পাথরের খণ্ডটিও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হ্রদ যত না সুন্দর পেছনের অরণ্য তার চেয়েও সুন্দর। যে কোনো সুন্দর জিনিসের সঙ্গে খানিকটা বিষণ্নতা মেশানো থাকে। আমার মন বিষণ্ন হয়ে গেল। গুলতেকিন বলছে– এত সুন্দর। এত সুন্দর।

হ্রদের কাছাকাছি তাঁবু খাটাবার জায়গা ঠিক করে কিংকং ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানালাম। ভদ্রমহিলা যাবার আগে বলে গেলেন, ক্যাম্পিং-এর যাবতীয় জিনিসপত্র নামমাত্র মূল্যে তাঁদের কাছে ভাড়া পাওয়া যাবে। তবে তারা চেক গ্রহণ করেন না। পেমেন্ট হবে ক্যাশে।

সকাল এগারটার মতো বাজে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে, বাতাসে ঘাসের বিচিত্র গন্ধ, চারদিকে নিঝঝুম। ফ্লাক্স ভর্তি করে চা এনেছিলাম। চা শেষ করে প্রবল উৎসাহে তাঁবু খাটাতে লেগে গেলাম। তাঁবুর সঙ্গে একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়েল আছে– কোন খুঁটি কিভাবে পুঁততে হয়, তাঁবুর কোন আংটা কোন খুঁটিতে যাবে সব পরিষ্কার করে লেখা। কাজটা খুবই সহজ মনে হ'ল। ঘন্টা খানেক পার হবার পর বুঝলাম কাগজপত্রের কাজটা যত সহজ মনে হচ্ছিল আসলে তত সহজ নয়। তাঁবুর একটা দিক যখন কোনো মতে দাঁড়ায় তখন অন্য দিক ঝুলে পড়ে। সেইটা ঠিক করতে যখন যাই তখন গোটা তাঁবু মাটিতে শুয়ে পড়ে। আমার স্ত্রী এই দু ঘন্টায় পঞ্চাশবারের মতো ঘোষণা করল যে, আমার মতো অকর্মণ্য মানুষ সে আর দেখেনি। সে হলে দশ মিনিটের মাথায় নাকি তাঁবু ঠিক করে ফেলত। আমি তাকে তার প্রতিভা প্রমাণ করার সুযোগ দিলাম। এবং আরো এক ঘণ্টা নষ্ট হ'ল। দেখা গেল তাঁবু খাটানোয় তার প্রতিভা আমার মতই।

আমাদের তাঁবু কেমন খাটানো হয়েছে দেখার জন্য ওয়ার্ডেনের স্ত্রী বিকেলের দিকে এলেন এবং বললেন, সামান্য ফিসের বিনিময়ে তাঁবু খাটানোর কাজটা তাঁরা করে দেন।

ফী দেওয়া হলো এবং চমৎকার তাঁবু তারা খাটিয়ে দিল। দুপুরে আমাদের কিছু খাওয়া হয়নি। খিদেয় প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। বন থেকে কুড়াল দিয়ে কাঠ কেটে এনে আগুনে মাংস ঝলসে খাওয়াই হচ্ছে নিয়ম।

কাঠ যোগাড় হলো, কিন্তু কিছুতেই আগুন ধরানো গেল না। কেরোসিন ঢেলে দিলে আগুন জ্বলে ওঠে, খানিকক্ষণ জ্বলে তারপর আর নেই। আমি ওয়ার্ডেনের

স্ত্রীকে (মিসেস সিমসন) গিয়ে বললাম, আপনি কি সামান্য ফীসের বিনিময়ে আমাদের চুলাটা ঘরিয়ে দিবেন?

ভদ্রমহিলা আমার রসিকতায় খুবই বিরক্ত হলেন এবং গম্ভীর গলায় বললেন, কোরোসিন কুকার পাওয়া যায়। তার একটি নিতে পার।

দশ ডলার দিয়ে কেরোসিন কুকার ভাড়া করলাম। দুপুরে লাঞ্চ শেষ হলো সন্ধ্যার আগে আগে। আমাদের মতো প্রচুর ক্যাম্পযাত্রী এখান এসেছে, তবে তারা সবাই চলে গেছে বনের দিকে। জলের দেশের মানুষ বলেই আমরাই একমাত্র জলের কাছাকাছি আছি। বনের চেয়ে জল আমাকে বেশি আকর্ষণ করে।

সন্ধ্যায় নৌকায় খানিকক্ষণ বেড়ালাম। আমেরিকান নিয়ম অনুযায়ী সবার জন্য লাইফ জ্যাকেট ভাড়া করতে হলো– আরো কিছু টাকা পেলেন মিসেস সিমসন। নৌকায় থাকতে থাকতে চাঁদ উঠে গেল। বিশাল চাঁদ। পঞ্জিকা দেখে রওয়ানা হই নি। পাকে চক্রে পূর্ণিমার মধ্যে পড়ে গেছি। হ্রদের নিস্তরঙ্গ জলে চাঁদের ছায়া, দূরে বনরাজি, পাখপাখালির ডাক, অদ্ভূত পরিবেশ। আমি চিরকাল শহরবাসী, কাজেই পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। বারবার মনে হচ্ছে স্বর্গের যে সব বর্ণনা ধর্মগ্রন্থগুলিতে আছে সেই স্বর্গ কি এর চেয়েও সুন্দর?

তাঁবুতে ফিরলাম সন্ধ্যা মিলাবার অনেক পরে। গুলতেকিন রাতের খাবার রাঁধতে বসল। আমি বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে বের হলাম। সে বলল, এই বনে কি বাঘ আছে?

আমি বললাম, আছে।

সে বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, বাঘ আমাদের কখন খেয়ে ফেলবে বাবা?

জগতের সত্যগুলি শিশুরা খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। কখনই তেমন বিচলিত হয় না। শিশুদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে।

দুর্বাঘাসের চাদরে আদিগন্ত ঢাকা। বড় গাছগুলির অধিকাংশের নাম আমি জানি না। উইলি, ওক এবং ইউক্লিপ্‌টাস চিনতে পারছি। চাঁদের আলোয় চেনা গাছগুলিকেও অচেনা লাগছে।

এক সময় আমাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল তার জন্য আমার প্রাচ্যদেশীয় চোখ প্রস্তুত ছিল না। এক দল তরুণ-তরুণী বনে ভেতর ছোটাছুটি করছে। তাদের গায়ে কাপড়ের কোনো বালাই নেই।

আমি শুনেছি আমেরিকানরা গভীর বনে প্রবেশ করার পর সভ্যতার শিকল– কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে। ফিরে যায় আদম এবং হাওয়ার যুগে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা যার নাম। এই দৃশ্য নিজের চোখে কখনও দেখব তা ভাবিনি।

দৃশ্যটি আমার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক বা অশ্লীল মনে হলো না। বরং মনে হলো এটাই স্বাভাবিক, এটাই হওয়া উচিত।

আমার মেয়ে বলল, বাবা ওদের কি খুব গরম লাগছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, চল আমরা ফিরে যাই।

আমি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলাম। কত রাত তা জানা হলো না, গাড়ি দেখতে ইচ্ছে করল না। মেয়ে দুটি তাঁবুতে ঘুমাচ্ছে। আমি এবং গুলতেকিন তাঁবুর বাইরে বসে আছি। স্বামী-স্ত্রীরা প্রেমিক-প্রেমিকার মতো ভালোবাসাবাসির কথা কখনো বলে না। সেই রাতে আমরা বিশ্বের আগের সময়ে কেমন করে যেন ফিরে গেলাম। পাশে বসা তরুণীটিকে অচেনা মনে হতে লাগল। বারবার মনে হচ্ছিল—এত আনন্দ আছে পৃথিবীতে।

ভোরবেলায় সূর্যোদয় দেখা আমার কখনো হয়ে ওঠে না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার অনেক রাত ঘুমুতে যাবার পরেও জেগে উঠলাম সূর্য ওঠার আগে।

সূর্যোদয়ের দৃশ্যটি এত সুন্দর কখনো ভাবিনি। আগে জানতাম না, সুর্যটাকে ডিমের কুসুমের মতো দেখায়, জানতাম না ভোরবেলায় সুর্য এত বড় থাকে। এই সূর্য আকাশে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে, তাও জানা ছিল না।

সকালে নাশতা হলো দুধ এবং শিরিয়েলের। নাশতার পর দমকল নিয়ে মাছ ধরতে বের হলাম। আমেরিকায় বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে চাইলে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছ থেকে লাইসেন্স করতে হয়। লাইসেন্সের ফী পনের ডলার। লাইসেন্স করা ছিল, তারপরও বুড়ি সিমসনকে পাঁচ ডলার দিতে হ'ল। এটা নাকি লেক রক্ষণাবেক্ষণের ফী। বড়শি ফেলে মূর্তির মতো বসে থাকার কাজটি খুব আনন্দদায়ক হবে মনে করার কোনো কারণ নেই— তবু যেহেতু লাইসেন্স করেছি কাজেই বসে রইলাম। শুনেছিলাম আমেরিকান লেকভর্তি মাছ, টোপ ফেলতে হয় না, সুতা ফেললেই হয়, সুতা কামড়ে মাছ উঠে আসে। বাস্তবে সে রকম কিছু ঘটলো না। আমি পুরো পরিবার নিয়ে মাছ ধরার আশায় ঝাঁ-ঝাঁ রোদে তিন ঘন্টা কাটিয়ে দিলাম। মাছের দেখা নেই এক সময় বুড়ি সিমসন এসে উদয় হলেন এবং গম্ভীর গলায় বললেন, লেকের কোন জায়গায় মাছ টোপ খায় এবং কখন কিভাবে বড়শি ফেলতে হয় সেই বিষয়ে তাদের একটি বুকলেট আছে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে তা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয়? কিনলাম বুকলেট এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ। বিশাল এক নরদারর্ণ পাইক ধরে ফেললাম। এই আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ মৎস শিকার। আমার বড় মেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বারবার জিজ্ঞেস

করতে লাগল, বাবা এটা কি তিমি মাছ? বাবা, আমরা কি একটা তিমি মাছ ধরে ফেলেছি?

দুপুরে লাঞ্চ হলো সেই মাছ। ওয়েস্টার্ন ছবির কায়দায় আগুনে ঝলসিয়ে লবণ ছিটিয়ে খাওয়া। অন্য সময় এই মাছ আমি মুখেও দিতে পারতাম না। কিন্তু পরিবেশের কারণে সেই আগুনে ঝলসানো অখাদ্যকেও মনে হলো স্বর্গের কোনও খাবার।

লাঞ্চ শেষ হবার আগেই একটা দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। জানা গেল ন'বছর বয়সী একটা ছেলে দলছুট হয়ে বনে হারিয়ে গেছে। ছেলেটির বাবা-মা ভাইবোন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। বনে হারিয়ে যাবার ঘটনা নতুন কিছু না।

টিভি এবং খবরের কাগজে প্রায়ই এরকম খবর আসে। গত বছর উনিশ বছর বয়সী একটা মেয়ে মন্টানার এক বনে হারিয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করা হয় তের দিন পরে। সে এই তের দিন ব্যাঙ, সাপ-খোপ লতাপাতা খেয়ে বেঁচে ছিল। কেউ কেউ ইচ্ছে করেই বনে থেকে যায়। তেত্রিশ দিন পর হারিয়ে যাওয়া এক দম্পতিকে খুঁজে বের করার পর তারা বলেন– নাগরিক সভ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে তারা বনে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা ভালোই আছেন। শহরে ফিরতে চান না।

ন বছর বয়সী শিশুটির নিশ্চয়ই এরকম কোনো সমস্যা নেই। সে নিশ্চয়ই আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে। ক্যাম্পে সাজসাজ রব পড়ে গেল এস্টেট পুলিশকে খবর দেওয়া হলো। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে দুটি হেলিকপ্টার বনের উপর দিয়ে চক্রাকারে উড়তে লাগল। হেলিকপ্টার থেকে জানানো হলো বাচ্চাটিকে দেখা যাচ্ছে। একটা ফাঁকা জায়গায় আছে, নিজের মনে খেলছে। ভয়ের কিছু নেই।

বাচ্চাটিকে যখন উদ্ধার করা হলো, সে গম্ভীর গলায় বলল, আমি হারাব কেন? আমার পকেটে তো কম্পাস আছে।

দু'দিন থাকবার পরিকল্পনা নিয়ে গিয়েছিলাম, এক সপ্তাহ থেকে গেলাম। মিসেস সিমসন একদিন এসে বললেন, তোমরা আর থেকো না। বেশিদিন থাকলে নেশা ধরে যাবে। আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে না। এই আমাদের দেখ, বছরের পর বছর এই জায়গায় পড়ে আছি। ঘণ্টা খানিকের জন্যও শহরে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মিসেস সিমনস বললেন, সতেরো বছর আগে আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে ক্যাম্পিং-এ এই জায়গায় এসেছিলাম। এতই ভালো লাগল যে, লিজ নিয়ে ক্যাম্পিং স্পট বানালাম। তারপর থেকে এখানেই

www.MurchOna.com

আছি। বছরে তিনটা মাস লোকজনের দেখা পাই, তারপর দুজনে একা একা কাটাই।

কষ্ট হয় না?

না। বনের অনেক রহস্যময় ব্যাপার আছে। তোমরা যারা দু'একদিনের জন্য আস, তারা তা ধরতে পার না। আমরা পারি। পারি বলেই..

মিসেস সিমসন তাঁর কথা শেষ করলেন না। আমি বললাম, রহস্যময় ব্যাপারগুলি কি?

ঐ সব তোমরা বিশ্বাস করবে না। ঐ প্রসঙ্গ বাদ থাক।

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বনের দিকে তাকালেন। রহস্যময় বন হয়ত কানে কানে তাঁকে কিছু বলল। দেখলাম তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মিসেস সিমসন বললেন, একটা মজার ব্যাপার কি জান? সমুদ্র মানুষকে আকর্ষণ করে। এত যে সুন্দর সমুদ্র তার পাশেও তিন চার দিনের বেশি মানুষ থাকতে পারে না। আর বন মানুষকে আকর্ষণ করে। মানুষকে সে চলে যেতে দেয় না। পুরোপুরি গ্রাস করতে চেষ্টা করে। কাজেই তোমরা চলে যাও।

আমরা চলে গেলাম।

সব মিলিয়ে সাত দিন ছিলাম। মিসেস সিমসন তিন দিনের ভাড়া রাখলেন। শান্ত গলায় বললেন, তোমরা তিন দিন থাকতে এসেছিলে সেই তিন দিনের রেন্ট-ই আমি রেখেছি। বাকি দিনগুলি কাটিয়েছ অতিথি হিসাবে। বনের অতিথি। বন তোমাদের আটকে রেখেছে। কাজেই সেই চার দিনের ভাড়া রাখার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

www.MurchOna.com

নামে কিবা আসে যায়

'সামার হলিডে' শুরু হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সবার মনই এই সময় খানিকটা তরল অবস্থায় থাকে। অত্যন্ত কঠিন অধ্যাপককেও এই সময় নরম এবং আদুরে গলায় কথা বলতে দেখা যায়।

আমার অধ্যাপকের নাম জোসেফ এডওয়ার্ড গ্লাস্‌লাস নামের সার্থকতা বুঝানোর জন্যই হয়তো ভদ্রলোক কাচের মতো কঠিন এবং ধারালো। সামার হলিডের তারল্য তাঁকে স্পর্শ করেনি। ভোর ন'টায় ল্যাবে এসে দেখি সে একটা বিকারের কপার সালফেটে সলুসন বানিয়ে খুব ঝাঁকাচ্ছে। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে, ভোরবেলা গ্লাসের সঙ্গে দেখা হলে সারাটা দিন খারাপ যাবে।

গ্লাসকে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রবাদের কারণে নয়। মন খরাপ হলো কারণ ব্যাটার আজ থেকে ছুটিতে যাবার কথা। যায়নি যখন তখন বুঝতে হবে সে এই সামারে ছুটিতে যাবে না। ছুটির তিন মাস আমাকে জ্বালাবে। কারণ জ্বালানোর জন্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ল্যাবে নেই। সবাই ছুটি নিয়ে কেটে পড়েছে।

আমি প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রাণ গলায় বললাম,—হাই।

গ্লাস আনন্দে সব ক'টা দাঁত বের করে বলল, তুমি আছো তাহলে। থ্যাংকস। এসো দু'জনে মিলে এই সল্যুশানটার ডিফারেনসিয়েল রিফ্রেকটিভ ইনবেক্স বের করে ফেলি।

আমি বললাম, এটা সম্ভব না। আমি আমার নিজের কাজ করবো। এর মধ্যে তুমি আমাকে বিরক্ত না করলে খুশি হবো।

বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকারা আমার জবাব শুনে হয়তো আঁতকে উঠেছেন। আমার পি-এইচ-ডি গাইড এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রায় ঈশ্বরের মতো ক্ষমতাবান একজন অধ্যাপকের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলা যায় কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে না, তবে আমেরিকান চরিত্র সম্পর্কে যাদের কিছুটা ধারণা আছে, তারাই বুঝবেন আমার জবাব হচ্ছে যথাযথ জবাব।

www.MurchOna.com

প্রফেসর গ্লাস খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখে বলল, হ্যামাদ, এটা সামান্য কাজ। এক ঘন্টাও লাগবে না।

আমি বললাম, আমাকে হ্যামাদ ডাকছ কেন? আমার নাম হুমায়ুন আহমেদ। হ্যামাদটা তুমি পেলে কোথায়?

'নাম নিয়ে তুমি এত যন্ত্রণা করো কেন হ্যামাদ? নামে কিবা যায় আসে? আমি একজন ওল্ডম্যান। তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি কাজটা করে নিতে। আর তুমি নাম নিয়ে যন্ত্রণা শুরু করে দিলে।'

আমি ডিফারেনসিয়েল রিফ্রেকাটিভ ইনডেক্স বের করে দিলাম। ঝাড়া পাঁচ ঘন্টা লাগলো। কোনো কিছুই হাতের কাছে নেই। সবাই ছুটিতে। নিজেকে ছুটাছুটি করে প্রত্যেকটি জিনিস জোগাড় করতে হয়েছে।

প্রফেসর গ্লাস আমার পাশেই চুরুট হাতে বসে খুব সম্ভব আমাকে খুশি রাখবার জন্যই একের পর এক রসিকতা করছে। রসি্কতাগুলোর সাধারণ নাম হচ্ছে ডার্টি জোকস। ভয়াবহ ধরনের অশ্লীল।

বিকেল পাঁচটায় ল্যাব বন্ধ করে বাসায় ফিরবার আগে আগে গ্লাসের কামরায় উঁকি দিলাম। গ্লাস হাসি মুখে বলল, কিছু বলবে হ্যামাদ।

হ্যাঁ, বলবো। আগেও কয়েকবার বলেছি। আজও বলবো।

তোমার নামের উচ্চারণের ব্যাপার তো?

হ্যাঁ।

উচ্চারণ করতে পারি না বলেই তো একটু এলোমেলো হয়ে যায়। এতে এতো রাগ করবার কী আছে? আমেরিকানদের জিহ্বা শক্ত।

আমেরিকানদের জিহ্বা মোটেই শক্ত নয়। অনেক কঠিন উচ্চারণ এরা অতি সহজেই করে। তোমরা যখন কোনো ফরাসি রেস্টুরেন্টে যাও তখন খাবারের ফরাসি নামগুলো খুব আগ্রহ করে উচ্চারণ করো না?

গ্লাস গম্ভীর চোখে তাকিয়ে রইলো। কিছু বললো না।

আমি বললাম, এসো আমার সঙ্গে। চেষ্টা করো, বলো হুমায়ূন।

গ্লাস বললো, হেমেন।

আমি বললাম, হলো না, আবার বলো হুমায়ুন। হু-মা-য়ু-ন।

গ্লাস বললো, মায়ান।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। আমেরিকায় পা দেবার পর থেকে যে জিনিসটি আমাকে পীড়া দিচ্ছে সেটা হচ্ছে শুদ্ধভাবে এরা বিদেশীদের নাম বলতে চায় না। ভেঙে-চুরে এমন করে যে রাগে গা জ্বলে যায়। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির

মিজানুল হককে বলে হাকু। হাকু পারলে হক বলতে অসুবিধা কোথায়? অন্য বিদেশীরা এই ব্যাপারটি কিভাবে নেয় আমি জানি না। আমার অসহ্য বোধ হয়।

হংকংয়ের চাইনিজ ছাত্রদের দেখেছি এ ব্যাপার খুবই উদার। তারা আমেরিকানদের উচ্চারণ সাহায্য করার জন্য নিজেদের চাইনিজ নাম পাল্টে পড়াশোনার সময়টার জন্যে একটা আমেরিকান নাম নিয়ে নেয়। যার নাম চ্যান ইয়েন সে হয়তো খণ্ডকালীন একটা নাম নিলো, মি. ব্রাউন। দীর্ঘ চার বছরের ছাত্রজীবনে সবাই ডাকবে মি. ব্রাউন। যদিও তার আসল নাম চ্যান ইয়েন। হংকংয়ের চাইনিজগুলো এই কাজটি কেন করে কে জানে। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে দার্শনিকের মতো বলল,–ভুল উচ্চারণে আসল নাম বলার চেয়ে শুদ্ধ উচ্চারণে নকল নাম বলা ভালো। তাছাড়া নাম আমেরিকানদের কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা হচ্ছে ফাজিলের দেশ। নামের মধ্যেও এরা ফাজলামি করে। তাই না?

নাম নিয়ে যে এরা যথেষ্ট ফাজলামি করে সে সম্পর্কে সন্দেহের কারণ নেই। এরা পশুর নামে নাম রাখে যেমন, Mr. Fox, Mr. Lion, Mr. Lamb. এরা কীট-পতঙ্গের নামে নাম রাখে যেমন, Mr. beetle (গুবরে পোকা)। একটা নাম পেয়েছিলাম যার বাংলার মানে– ষাঁড়ের গোবর (Mr. bull dung Junior)। অবশ্যি বাংলা ভাষাতেও খাদা, গেদা, নাম রাখা হয়। তবে সেসব নাম নিয়ে আমরা বড়াই করি না। আমেরিকানরা করে। আমি একজন আন্ডার-গ্রাজুয়েট ছাত্র পেয়েছিলাম সে খুব বড়াই করে বললো– আমার নাম Back Bison (বাইসনের পাছা)।

ধরাকে সরা জ্ঞান করার একটা প্রবণতা আমেরিকানদের আছে। ঢাকা শহরে একবার এক আমেরিকানকে খালি গায়ে হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছি। গাড়িতে একজন বাঙালি তরুণী এবং দুইজন বাঙালি যুবক। আমি জানি না, তবে আমার বিশ্বাস আমেরিকানটির খালি গায়ে গাড়ি চালানোর যুক্তি বোধহয় এদেশের গরম। আমাদের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতায় এই আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়, এটা তারা জেনেও এই কাজ করবে। ভাবটা এরকম, আমরা কোনো কিছুই পরোয়া করি না। এরা যখন আমাদের দেশে আসবে তখন আমাদের আচার-আচরণকে সম্মান করবে এটা আমার বিশ্বাস আশা করবো। তারা যখন তা করবে না তখন মনে করিয়ে দেবো যে তারা যা করছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা প্রায় কখনোই তা করি না। সাদা চামড়া দেখলে এখনো আমাদের হুঁশ থাকে না। যাক পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

আমি খুব যে একজন বিপ্লবী ধরনের ছেলে তা নয়। বড় বড় অন্যায় দেখি

www.MurchOna.com

কিন্তু তেমন কোনো সাড়াশব্দ করি না। সব সময় মনে হয় প্রতিবাদ অন্যেরা করবে আমার ঝামেলায় যাবার দরকার নেই। তবু বিকৃত উচ্চারণে বিদেশীদের নাম বলাটা কেন জানি শুরু থেকেই সহ্য হলো না। একটা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম যাতে আমেরিকানরা শুদ্ধ নামে ডাকার একটা চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরের কাগজে চিঠি লিখলাম, আমার যুক্তি আমেরিকানরা ইচ্ছে করে বিদেশীদের ভুল উচ্চারণে ডাকে। উদাহরণ হচ্ছে, শীলা নামটা সঠিক উচ্চারণ না করতে পারার কোনোই কারণ নেই। এর কাছাকাছি নাম তাদের আছে। কিন্তু যেই তারা দেখবে এই নামটা একজন বিদেশীর, অমনি উচ্চারণ করবে– শেইল (Sheila), এর মানে কী?

সাত বছর ছিলাম আমেরিকায়। এই সাত বছরে অনেক চেষ্টা করলাম ওদের দিয়ে শুদ্ধভাবে আমার নামটা বলাতে। পারলাম না। ফল এই হলো যে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রটে গেল 'হামাম' নামের এই ছেলের মাথায় খনিকটা গণ্ডগোল আছে। তবে ছেলে ভালো।

বিদেশের পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে আসছি। আমার দেশে ফিরে যাওয়া উপলক্ষে প্রফেসর গ্লাস তার বাড়িতে একটা পার্টি দিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, এই পার্টিতে প্রথমবারের মতো সে শুদ্ধ উচ্চারণ করলো। আমার দীর্ঘদিনের আন্দোলনের সুন্দর পরিণতি। আমার ভালো লাগার কথা। আনন্দিত হবার কথা। কেন জানি ভালো লাগলো না।

গ্লাস গাড়িতে করে আমাকে পৌঁছে দিচ্ছে।

আমি বললাম, এই তো সুন্দর করে তুমি আমার নাম বলতে পারছো। আগে কেন বলতে পারতে না?

গ্লাস খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললো, বিদেশীদের আমরা একটু আলাদা করে দেখি। আমরা তাদের রহস্যময়তা ভাঙতে চাই না। তাদের অন্য রকম করে ডাকি। অন্য কিছু না।

অধ্যাপক গ্লাসের কথা কতটুকু সত্যি আমি জানি না। সে যেভাবে ব্যাপারটাকে দেখেছে অন্যরাও সেভাবে দেখেছে কিনা তাও জানি না। গ্লাসের কথা আমার ভালোই লাগলো। আমি হাসিমুখে বললাম, তুমি আমাকে তোমার মতো করেই ডাকো।

বিদায় নিয়ে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে গ্লাস বললো, হামান, ভালো থেকো এবং আগলি আমেরিকানদের কথা মনে রেখো।

মে ফ্লাওয়ার

www.MurchOna.com

দেশের বাইরে বেড়াতে যাবার সুযোগে আনন্দিত হন না– এমন মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প। আমি সেই খুব-অল্পদের একজন। বাইরে যাবার সামান্য সম্ভাবনাতেই আমি আতঙ্কগ্রস্ত হই। আতঙ্কগ্রস্ত হবার কারণ আছে– এখন পর্যন্ত আমি কোনো বিদেশ যাত্রা নির্বিঘ্নে শেষ করতে পারি নি।

একবার কিছু লেখকের সঙ্গে চীন গিয়েছিলাম। আমাদের দলনেতা ফয়েজ ভাই। তিনি সারাক্ষণ আমাকে গার্ড দিয়ে রাখছেন যাতে হারিয়ে না যাই। তাঁর ধারণা প্রথম সুযোগেই আমি হারিয়ে যাব। হারালাম না তবে চোখে খোঁচা লাগিয়ে মহাবিপদ ঘটালাম। ডাক্তার দু'টি চোখ ব্যান্ডেজ করে বন্ধ করে দিলেন। পুরো অন্ধ। লেখকরা মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমি তাঁদের পেছনে তাদের হাত ধরে ধরে হাঁটছি। এই হচ্ছে আমার চীন দেখা।

পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে গিয়ে কি ঝামেলায় পড়েছিলাম একটু বলে নেই। সাতদিনের জন্যে গিয়েছি বোম্বে। এলিফেন্ট গুহা, অজন্তা ইলোরা সব দেখা হলো। কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই হলো। এখন দেশে ফিরব। রাত তিনটায় প্লেন; বাংলাদেশ বিমান। বলা তো যায় না, আমার যা কপাল প্লেন যদি আগে-ভাগে চলে আসে এই ভয়ে রাত ন'টা থেকে এয়ারপোর্টে বসে আছি। সঙ্গে টাকা-পয়সা যা ছিল সব শেষ মুহূর্তের বাজারে শেষ করা গেল। এখন বিমানের জন্যে অপেক্ষা। যথাসময়ে ইংল্যান্ড থেকে বিমান এলো। বোর্ডিং পাস নিতে গেছি। বাংলাদেশ বিমানের লোকজন বলল, এথেন্স থেকে প্লেন ওভার বুকিং হয়ে এসেছে, আপনাকে নেয়া যাবে না। আমি আঁৎকে উঠে বললাম, সে কি, চব্বিশ ঘণ্টা আগেই তো টিকিট ওকে করানো।

"বললাম তো যাত্রী বোঝাই। কিচ্ছু করা যাবে না।"

প্লেন আমাকে রেখে চলে গেল। শীতের রাত। সঙ্গে একটা পয়সা নেই। এখানে কাউকে চিনিও না। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে.....

এইসব তো ছোটখাটো বিপদ, ইংল্যান্ডের হিথ্রো বিমানবন্দরে একবার মহাবিপদে পড়েছিলাম। দুই কন্যা এবং স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরছি। পাসপোর্ট যাতে নিরাপদে থাকে সেই জন্যে গুলতেকিনের হ্যান্ডব্যাগে

www.MurchOna.com

রাখা আছে। [গুলতেকিন, আমার স্ত্রীর নাম। এই ভয়াবহ নাম তার দাদা রেখে গেছেন। বিয়ের পর বদলাতে চেয়েছিলাম, পারি নি।]

লন্ডনে ছ'ঘণ্টার যাত্রাবিরতি। আমি মহানন্দে সিগারেট টানছি। গুলতেকিন বলল, মুখের সামনে সিগারেট টানবে না তো। বমি আসছে। অন্য কোথাও গিয়ে সিগারেট শেষ করে আসো। আমি বিমর্ষ মুখে উঠে গেলাম। এদিক-ওদিক ঘুরছি। এই উদ্দেশ্যহীন ঘুরাই আমার কাল হলো এক সময় দেখি– আমি এয়ারপোর্টের বাইরে। ভেতরে ঢুকতে গেলাম আরতো ঢুকতে পারি না, যতই বলি– আমি একজন ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার ভুল করে বাইরে চলে এসেছি, ততই তাদের মুখ অন্ধকার হয়। আমাকে নিয়ে গেল পুলিশের কাছে, মৈনাক পর্বতের মতো সাইজ। কথা বলছে না তো মেঘ গর্জন করছে।

"তুমি বলছ, তুমি ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার?"

আমি বিনয়ে গলে গেলাম। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে বিনয়। আমি মধুর গলায় বললাম, ইয়েস স্যার।

"দেখি তোমার পাসপোর্ট!"

"পাসপোর্ট আমার সঙ্গে নেই।"

"বিনা পাসপোর্টে তুমি সিকিউরিটি এলাকা অতিক্রম করে বের হলে কি করে?"

"আমি জানি না স্যার। হাঁটতে হাঁটতে কি করে যেন চলে এসেছি।"

"তোমার দেশ কোথায়?"

"বাংলাদেশ।"

"ও আই সি।"

এমন ভাবে "ও আই সি" বলল যাতে মনে হতে পারে পৃথিবীর সব ভয়াবহ ক্রিমিনালদের জন্মভূমি হচ্ছে বাংলাদেশ। আমি গলায় মধুর পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আপনি যদি আমাকে ট্রানজিট এরিয়াতে নিয়ে যান তাহলেই আপনার সব সন্দেহের অবসান হবে। আমার স্ত্রী দুই মেয়ে নিয়ে সেখানে আছে। তার হ্যান্ডব্যাগে আমার পাসপোর্ট।

"এসো তুমি আমার সঙ্গে।"

আমি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রওনা হলাম। মনে হলো বিপদ কেটেছে। কিন্তু না বিপদ কাটবে কোথায়, বিপদের সবে শুরু। সে আমাকে ছোট একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিল। হতভম্ব হয়ে লক্ষ করলাম এটা একটা হাজত। ব্যাটা ফাজিল, আমাকে হাজতে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

www.MurchOna.com

পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমার বিদেশভীতির উৎস ধরে ফেলেছেন। আমার এই বিদেশাতংকের কারণেই ইউ. এস. আই. এস.-এর জনৈক কর্মকর্তা যখন টেলিফোন করে বললেন, আপনি কি কিছুদিনের জন্যে আমেরিকা বেড়াতে যেতে আগ্রহী?

আমি খুবই বিনয়ের সঙ্গে বললাম, জি না।

"কেন বলুন তো?"

"আমি ঐ দেশে ছ'বছর থেকে এসেছি।"

"সে তো অনেক দিন আগের কথা। এখন যান আপনার ভালো লাগবে। পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে লেখকরা আসছেন। আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশ থেকে আপনি যান।"

"কত দিনের ব্যাপার?"

"অল্পদিন– এক মাস।"

"এক মাস হলে ভেবে দেখি।"

"ভাবাভাবির কিছু নেই। আমরা ব্যবস্থা করছি– আপনার নাম পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।"

তাঁরা যথাসময়ে যোগাযোগ করলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানালেন– প্রোগ্রামে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে– এক মাস নয় থাকতে হবে প্রায় তিনমাস।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তিন মাস কি করে থাকব?

আমার বিদেশ যাত্রার সংবাদে কয়েকজনকে খুব উল্লসিত মনে হলো। তাদের অন্যতম আমার কনিষ্ঠ কন্যা বিপাশা। সে ঘোষণা করল, আমিও বাবার সঙ্গে যাব। আমার জন্যে টিকিট কাটার দরকার নেই। আমি বাবার কোলে বসেই যেতে পারব।

সে তার ছোট স্যুটকেস অতি দ্রুত গুছিয়ে ফেলল; টুথব্রাশ, সাবান, তোয়ালে। তার কাণ্ড দেখে অন্যরা হাসছে কিন্তু কষ্টে আমার কান্না পাচ্ছে– কি করে এদের ছেড়ে থাকব? কি করে কাটবে প্রবাসের দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী?

আমার প্রকাশকদের একজন কাকলী প্রকাশনীর সেলিম সাহেবকেও আমার বিদেশ যাত্রায় খুব আনন্দিত মনে হলো। তিনি দুই ভাঁড় দৈ নিয়ে উপস্থিত হলেন। কোনোরকম আনন্দের ব্যাপার হলেই তিনি তাঁর দেশের বাড়ির মোষের টক দৈ নিয়ে উপস্থিত হন। অতি অখাদ্য সেই দৈ দেখলেই হৃৎকম্প হয়, তবু ভদ্রতা করে বলি– অসাধারণ।

সেলিম সাহেব দৈ-এর ভাঁড় রাখতে রাখতে হাসি মুখে বললেন, স্যার শুনলাম আপনি আমেরিকা যাচ্ছেন। শুনে বড় ভালো লাগছে।

www.MurchOna.com

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ভালো লাগছে কেন বলুন তো?

সেলিম সাহেব লাজুক ভঙ্গিতে বললেন, ফিরে এসে হোটেল গ্রেভার ইনের মতো একটা বই লিখে ফেলবেন। আমি ছাপব।

আমি তাঁর আনন্দের কারণ এতক্ষণে বুঝলাম, আমেরিকান অভিজ্ঞতা নিয়ে হোটেল গ্রেভার ইন নামে কিছু স্কেচধর্মী লেখা লিখেছিলাম। সেই বই পাঠকরা আগ্রহ নিয়ে পড়েছে। এবং সেলিম সাহেব হচ্ছেন বইটির প্রকাশক।

"স্যার আপনি যাওয়ার আগে আগে আরো দৈ দিয়ে যাব। আমার ছোট ভাইকে দেশে পাঠিয়েছি ও নিয়ে আসবে।"

"থ্যাংকস।"

"অনেকেই এই দৈ পছন্দ করে না। একমাত্র আপনাকেই দেখলাম আগ্রহ করে খান। ভালো জিনিসের মর্যাদা খুব কম মানুষই বোঝে।"

আমি শুকনো গলায় বললাম, 'খুবই খাঁটি কথা।'

"বই-এর নামটা কি দিয়ে যাবেন? নাম দিয়ে গেলে কভার করে রাখতাম।"

"বইটির নাম হোটেল মে ফ্লাওয়ার।"

"হোটেল মে ফ্লাওয়ার?"

'হ্যাঁ, যে ডরমিটরিতে থাকব তার নাম মে ফ্লাওয়ার..."

"আর বলতে হবে না বুঝতে পেরেছি– তাহলে কভার করে ফেলি?"

"করে ফেলুন। আরেকটা কথা সেলিম সাহেব, ঐ দৈটা না আনলে হয় না?"

বাঙালির বিদেশ যাত্রার প্রথম প্রস্তুতি হচ্ছে স্যুটকেস ধার করা। নিজেদের যত ভালো স্যুটকেসই থাকুক বিদেশ যাত্রার আগে অন্যের কাছে স্যুটকেস ধার করতে হবে। এটাই নিয়ম।

গুলতেকিন অবশ্যি নিয়মের ব্যতিক্রম করল– স্যুটকেস কিনে আনল। হুলস্থুল ধরনের বিশাল এক বস্তু। আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, এটা কি?

সে বিরক্ত হয়ে বলল, সব সময় রসিকতা ভালো লাগে না। একটু বড় সাইজ কিনেছি তাতে হয়েছে কি! স্যুটকেস হলো ঘড়ির মতো, যত ছোট তত দাম বেশি। বেশি দাম দিয়ে ছোট জিনিস কেন কিনব?

"কিছু মনে করো না গুলতেকিন, এই বস্তু এরোপ্লেনের দরজা দিয়ে ঢুকবে না। দরজা কেটে ঢুকাতে হবে।"

"দরজা কেটে ঢুকাতে হলে দরজা কেটে ঢুকাবে। আর এই নাও তোমার হ্যান্ডব্যাগ।"

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

হ্যান্ডব্যাগ দেখেও আমি চমৎকৃত হলাম। সেই হ্যান্ডব্যাগে নানান জায়গায় গোটা ত্রিশেক পকেট। আমি বিস্ময় মাখা গলায় বললাম, অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস তোমার চোখে পড়ে। এইটা তাহলে হ্যান্ডব্যাগ? ধরব কোথায়? হাতল বা কাঁধে ঝুলাবার ফিতা কোনোটাই তো দেখছি না।

দেখা গেল ঐ হ্যান্ডবাগে হাতে নেবার বা কাঁধে ঝুলাবার ব্যবস্থা নেই। বগলে নিয়ে ঘুরতে হবে। তাই সই।

যথাসময়ে হ্যান্ডব্যাগ বগলে নিয়ে এবং পর্বতপ্রমাণ স্যুটকেস টানতে টানতে এয়ারপোর্টে উপস্থিত হলাম। যিনি বোর্ডিং কার্ড দেন তিনি বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে বললেন, এই স্যুটকেস আপনার? কোত্থেকে কিনেছেন বলুন তো?

বিমান আকাশে উড়ল এবং এক সময় বিমানবালার গলায় শুনতে পেলাম–তীস্ হাজার ফুট উছতায়– অর্থাৎ আমরা ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায় ভ্রমণ করছি। বাংলাদেশ বিমান এই অদ্ভুত উচ্চারণের বাংলা কোত্থেকে জোগাড় করেছে কে জানে। বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক মরহুম আবু হেনা মোস্তফা কামালের এই বিষয়ে একটি থিওরি আছে। তিনি মনে করেন এই উচ্চারণ ওরা পেয়েছে পাকিস্তানিদের কাছ থেকে। এক সময় পি.আই.এর কোনো বাঙালি বিমানবালা ছিল না। উর্দুভাষী বিমানবালারা অনেক কষ্টে এইভাবে বাংলা বলত। সেই থেকে এটাই হয়ে গেল বিমানের স্টান্ডার্ড বাংলা উচ্চারণ। পাকিস্তানি ভূত এত সহজে ঘাড় থেকে নামবার নয়। এখনকার বাঙালি বিমানবালারা অনেক কষ্টে উর্দু উচ্চারণে বাংলা রপ্ত করে। এই উচ্চারণ এদের অনেক ত্যাগ এবং তিতিক্ষায় শিখতে হয়। ওদের ট্রেনিং-এর এটাই সবচে' শক্ত পার্ট।

হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছলাম ভোরবেলা। বিমান থেকে নেমে ট্রানজিট লাউঞ্জে যাবার আগেই বিপদে পড়ে গেলাম। বিপদে পড়ব জানা কথা, এত আগে পড়ব বুঝতে পারিনি। সম্ভবত আমাকে ড্রাগ ডিল্যারদের মতো দেখাচ্ছিল। জনৈক মেয়ে পুলিশ এগিয়ে এসে নিখুঁত ভদ্রতায় বলল, তুমি কি আমার সঙ্গে একটু আসবে?

আমি গেলাম তার সঙ্গে।

"তোমার বগলের এই ব্যাগে কি আছে?"

"আমি জানি না কি আছে।"

"তোমার ব্যাগ অথচ তুমি জানো না?"

"আমার স্ত্রী ব্যাগ গুছিয়ে দিয়েছে। কাজেই আমি জানি না কি আছে।"

"ব্যাগ খুলো।"

খুললাম। প্রথম যে জিনিস বের হয়ে এলো তা হচ্ছে গোটা পঞ্চাশেক

www.MurchOna.com

প্যারাসিটামল ট্যাবলেট। আমার দীর্ঘদিনের সহচর– মাথাব্যথাকে বশে রাখার জন্যে তিন মাসের সাপ্লাই। মহিলা পুলিশের চোখে-মুখে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল। এই ঝিলিকের অর্থ হলো–"পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে।"

"তুমি কি দয়া করে ব্যাখ্যা করবে এগুলি কি?"

"এগুলি হচ্ছে মাথা ধরার অষুধ। কমার্শিয়াল নেম প্যারাসিটামল। এক ধরনের এনালজেসিক। ক্যামিকেল কম্পোজিশন এসিটামিনোফেন।"

"এগুলি তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"আমেরিকায়।"

"আমেরিকায় কি এ ধরনের অষুধ পাওয়া যায় না?"

"পাওয়া যায় নিশ্চয়ই, তবু নিয়ে যাচ্ছি।"

"কি করবে?"

"খাব।"

"দেখি তোমার পাসপোর্ট।"

দিলাম পাসপোর্ট। সে অতি মনোযোগে পাতা উল্টে দেখতে লাগল। যেন এটা জাল পাসপোর্ট। দেখা গেল আমার মতো আরো দুর্ভাগা আছে। সিলিটে এক পরিবার ধরা খেয়েছে। বাবা-মা এবং ছ'টি নানান সাইজের ছেলেমেয়ে। এদের একজনের হাতে পলিথিনের কাগজে মোড়া বিশাল আকৃতির দুটি মানকচু। পরিবারের কর্তা করুণ গলায় ক্রমাগত বলছে– আই ব্রিটিশ, ফ্যামিলি ব্রিটিশ। অল চিলড্রেন বর্ন ব্রিটিশ। আই ব্রিটিশ কান্ট্রি লিভ থার্টি ইয়ার।–

যে পুলিশ অফিসার ওদের নিয়ে এসেছে সে এইসব কথাবার্তায় মোটেই কান দিচ্ছে না। সে সবার হাত থেকে পাসপোর্ট নিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে অন্য একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। পরিবারের কর্তা আমাকে বললেন, ওরা আফনারে দরল কি কারণ?

আমি বললাম, এখনো বুঝতে পারছি না।

"ভাইছাব, মনে মনে দুয়া ইউনুস পড়েন। এরা বড় হারামি জাত।"

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

দরিদ্র দেশে জন্মগ্রহণের অনেক যন্ত্রণা।

মাঝরাতে আমেরিকার আইওয়া স্টেটের ছোট্ট শহর সিডার রেডিস-এ বিমান থামল। প্রায় দশ বছর পর এই দেশে আসছি। চারদিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু দশ

www.MurchOna.com

বছরে কি পরিবর্তন হলো তা দেখার তেমন আগ্রহ বোধ করছি না। আমেরিকা কতটুকু বদলালো তা দিয়ে আমার কি? আমার দেশে দশ বছরে কিছুই হয় নি এই আমার চিন্তা। চারদিকে তাকানোর উদ্দেশ্য– দেখা কেউ আমাকে নিতে এলো কি না। না এলে খুব চিন্তার কথা। অচেনা শহরে ট্যাক্সি ভাড়া করে হোটেলে উঠতে হবে। তাও দুপুর রাতে। পকেটে একশ' ডলারের একটা নোট, তা দিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া এবং হোটেল ভাড়া হবে কি-না কে জানে। কাউকে দেখতে পেলাম না। এটাই স্বাভাবিক। আজ উইক এন্ডের রাত। আমেরিকানরা হৈচৈ করে ছুটি কাটাচ্ছে। কার দায় পড়েছে মাঝরাতে এয়ারপোর্টে এসে বসে থাকার?

আমি পুরো পরিস্থিতি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্যে ভেন্ডিং মেশিন থেকে গরম কফি কিনলাম। সিগারেট ধরাব কি না বুঝতে পারছি না। সিগারেট খাওয়া এখানে ড্রাগ খাওয়ার মতো হয়ে গেছে। সব জায়গায় নো স্মোকিং। সিগারেট ধরালেও সমস্যা– চারদিক এত ঝকঝক-তকতকে ছাই ফেলব কোথায়? যেখানে সেখানে ছাই ফেলার এবং ওয়াক থু বলে থুথু ফেলার যে মজা তা এরা কোনোদিন জানবে না।

"কিছু মনে করবে না। তুমি কি বাংলাদেশের লেখক ড. হুমায়ূন?"

আমি চমকে তাকালাম।

ইন্ডিয়ান-আমেরিকানদের মতো দেখতে বিশাল দেহী এক যুবক দাঁড়িয়ে। মাথায় টেক্সানদের হ্যাট। মুখ হাসি হাসি। আমি হাসি মুখে মাথা নাড়লাম।

"আমার নাম লেম। আমি আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের সঙ্গে জড়িত। আমি তোমাকে নিতে এসেছি।"

"ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে আমি তোমার উইক এন্ড মাটি করেছি।"

"তা করেছ। আমি অনেকক্ষণ থেকেই তোমাকে লক্ষ করছি। তুমি যে লেখক বুঝতে পারি নি। তোমার চেহারা লেখকদের মতো নয়।"

"লেখকদের চেহারা কেমন থাকে বলো তো?"

লেম হাসতে হাসতে বলল, "তাও তো জানি না। তোমার লাগেজ কোথায়?"

আমি আমার স্যুটকেস দেখিয়ে দিলাম। লেম বিস্ময় মাখা গলায় বলল, "হলি কাউ! এটা স্যুটকেস?"

"হ্যাঁ।"

"আমি ছোট গাড়ি নিয়ে এসেছি। এই জিনিস গাড়িতে ঢুকবে না। এটা বরং এখানে থাক। ভোরে বড় গাড়ি করে নিয়ে যাব।"

"বেশ তো, তাই করো।"

"আমরা যাব আইওয়া সিটিতে। তোমাকে তোমার আস্তানায় নামিয়ে দিয়ে চলে যাব। ভোরবেলা আবার এসে অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব।"

"ধন্যবাদ।"

"তুমি কি বাংলায় লেখালেখি করো?"

"হ্যাঁ।"

"বাংলায় লেখালেখি করেন এমন লেখক এই প্রোগ্রামে খুব বেশি আসেননি। একজন শুধু এসেছিলেন, দু'বার এসেছিলেন।"

"তাঁর নাম কি?"

"সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তুমি কি তাঁকে চেনো?"

"খানিকটা চিনি তবে তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত।"

আমরা গাড়িতে উঠলাম। লেম বলল, "দয়া করে সিট বেল্ট বেঁধে নাও। আইওয়া রাজ্যে সিট বেল্ট না বাঁধলে সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের জরিমানা।"

আমি সিট বেল্ট বাঁধলাম। গাড়ি ঝড়ের গতিতে উড়ে চলল। বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান হাইওয়ে। এই হাইওয়েতে গুলতেকিন এবং আমার বড় মেয়ে নোভাকে নিয়ে কত না ঘুরা ঘুরেছি। এক শীতের রাতে ক্রমাগত গাড়ি চালানোর রেকর্ড করব ভেবে সারারাত গাড়ি চালিয়েছিলাম। এক মুহূর্তের জন্যেও না থেমে ফার্গো থেকে গিয়েছিলাম মন্টানার বনভূমিতে।

আমি পুরানো আমেরিকা দেখার চেষ্টা করছি। কুয়াশা পড়েছে। তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাছপালা বা পাহাড়-পর্বত চোখে পড়ছে না। মনে হচ্ছে প্রেইরির সমভূমি।

"লেম!"

"ইয়েস প্লিজ।"

"তোমাদের এটা কি সমভূমি? ফ্ল্যাট ল্যান্ড?"

"না। এটাকে বলে রোলিং কান্ট্রি। ঢেউ-এর মতো উঁচু নিচু। আইওয়া হচ্ছে— পৃথিবীর সেরা কর্ন প্রডিউসিং এলাকা।"

লেম গাড়ির রেডিও চালু করে দিল। ভুলেই গিয়েছিলাম রাতের বেলা হাইওয়েতে গাড়ি নিয়ে নামলে এরা অবশ্যই রেডিও চালু রাখে। যাতে চলন্ত

www.MurchOna.com

গাড়িতে ঘুমিয়ে না পড়ে। চোখ এবং কান থাকে সজাগ। রেডিওতে একটি মেয়ে অত্যন্ত মিষ্টি গলায় গাইছে–

"I will love you on Tuesday."

মেয়েটি তার প্রেমিককে শুধু মঙ্গলবারে ভালোবাসতে চায় কেন? সপ্তাহের অন্যদিনগুলি কি দোষ করল? এই ভাবতে ভাবতে ঝিমুনী ধরে গেল।

"হুমায়ূন। নামো আমরা এসে গেছি।"

চোখ কচলাতে কচলাতে গাড়ি থেকে নামলাম। আধো অন্ধকার, আধো ছায়ায় মেপল এবং বার্চ গাছে ঢাকা বিশাল লাল ইটের দোতলা দালানের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হুহু করে বইছে শীতের হাওয়া। বিকট শব্দে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। আমেরিকান ঝিঁ ঝিঁ পোকা বড় বেশি শব্দ করে। আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, এইখানে থাকব?

"হুঁ।"

"আমি একা?"

"হ্যাঁ।"

"সে কি–আমাকে তো বলা হয়েছিল যে ফ্লাওয়ারের কথা।"

"তুমি দেরি করে এসেছ তাই যে ফ্লাওয়ার তোমাকে দেয়া যায় নি। আমরা তোমার জন্যে এই বাড়ি ভাড়া করেছি। বাড়ি তোমার পছন্দ হবে। দেড়শ' বছরের পুরানো বাড়ি। এক সময় স্কুল হাউস ছিল। ছোট ছোট বাচ্চারা পড়ত। তুমি শুনে খুশি হবে এই বাড়ি হিস্টোরিক্যাল প্রিজার্ভেশন পুরস্কার পেয়েছে। আমরা অনেক খুঁজে পেতে এই বাড়ি বের করেছি।"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "থ্যাংকস। কিন্তু বাড়িতে ঢুকে আমার কাঁপুনি ধরে গেল। এই নির্জনপুরীতে একা থাকব কি করে? ভয়েই তো মারা যাব। ভূত প্রেত আছে কি-না কে জানে। পুরানো বাড়ি ভূতদের খুব প্রিয় হয় বলে জানি।"

"হুমায়ূন বাড়ি পছন্দ হয়েছে তো?"

"হয়েছে। কিন্তু কথা হলো– ভূত-প্রেত নেই তো?"

লেম কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "থাকতেও পারে। পুরানো বাড়ি বুঝতেই পারছ। গুড নাইট, স্লিপ টাইট।"

স্লিপ টাইট মানে? ভয়ে আমার আত্মা শুকিয়ে গেল। ঘুমুতে গেলাম ঘরের সব ক'টা বাতি জ্বালিয়ে। বলাই বাহুল্য ঘুম এলো না। আমার তিন কন্যা এবং কন্যাদের মা'র জন্য বড্ড মন কেমন করতে লাগল। কেন বোকার মতো ওদের

ছেড়ে এসেছি। কি আছে এখানে? একা একা এই ভুতুড়ে বাড়িতে নিশিযাপনের কোনো মানে হয়?"

শেষ রাতের দিকে মনে হলো কাঠের মেঝেতে পা টেনে টেনে কে যেন হাঁটছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে– কেউ বোধ হয় বাথরুমের দরজা খুলে বের হচ্ছে সেখান থেকে। পরিষ্কার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পেলাম। আমি ভয়ে আধমরা হয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম– Who is there? ইংরেজিতে বললাম কারণ আমেরিকান ভূত বাংলা নাও বুঝতে পারে। প্রশ্ন করে আরো ভয় পেয়ে গেলাম কারণ ভূত যদি সত্যি সত্যি প্রশ্নের উত্তর দেয় তাহলে হার্টফেল করে মরে যাওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। মেঝেতে হেঁটে আসার শব্দ। আমার শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি নিশ্চিত এখন কেউ কোমল গলায় বলবে– হে বিদেশী আমি এখানে বড়ই নিঃসঙ্গ। আমি খানিকক্ষণ তোমার সঙ্গে এই জীবনের হতাশা ও বেদনা নিয়ে কথা বলতে চাই। তুমি কি দয়া করে বাতি নিভিয়ে দেবে?

তেমন কিছু হলো না। পদশব্দ দরজার কাছে থেমে গেল। ঘুমানোর চেষ্টা করা বৃথা। আমি হাত বাড়িয়ে কবিতার বই টেনে নিলাম। কবিতা পড়ে যদি ভূতের ভয় কাটানো যায়। হিথ্রো বিমানবন্দরে এক গাদা বই কিনেছি। তার মধ্যে পণ্ডিত নেহেরুর প্রিয় কবি রবার্ট ফ্রস্ট আছেন। যার 'Stopping by woods on a snowing evening' কবিতার প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি তিনিই প্রথম আকৃষ্ট করেন।

কবিতা আমার প্রিয় বিষয় নয় তবু এই ভয়ংকর রাতে কবিতাই আমাকে উদ্ধার করল। পড়তে পড়তে ভূতের ভয় কেটে গেল।

"The woods are lovely dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep."

পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে পঁয়তাল্লিশ জন লেখক একত্র হয়েছেন। সবাই পরিণত বয়স্ক। অনেকেরই চুল-দাড়ি ধবধবে সাদা। নিজেকে এদের মধ্যে খুবই অল্প বয়স্ক লাগছিল। যদিও ভালো করেই জানি মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে। উনিশ বছরের যুক্তিহীন আবেগময় যৌবন পেছনে ফেলে এসেছি অনেক অনেক আগে।

www.MurchOna.com

লেখকদের কাউকেই চিনি না। কারো কোনো বইও আগে পড়ি নি। তবে ভাবভঙ্গিতে যা বুঝলাম যাঁরা এসেছেন সবাই তাঁদের দেশের অতি সম্মানিত লেখক। সবার লেখাই একাধিক বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। প্রোগ্রামটির পরিচালক প্রফেসর ক্লার্ক ব্লেইস নিজেও আমেরিকার নাম করা ঔপন্যাসিকদের একজন। তাঁর একটি উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে আমেরিকার একটি বড় ফ্লিম কোম্পানি এই মুহূর্তে ছবি তৈরি করছে।

প্রফেসর ক্লার্ক বুড়ো মানুষ। ধবধবে শাদা দাড়ি– ঋষি ঋষি চেহারা। এক পর্যায়ে তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে চমকে দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, কেমন আছ হুমায়ূন?

উত্তর দেব কি, হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি। প্রফেসর ক্লার্ক আমার বিস্ময় খুব উপভোগ করলেন বলে মনে হলো। আমি কিছু বলার আগেই আমাকে আরো চমকে দিয়ে বললেন, "আমি সম্পর্কে তোমাদের জামাই হই।"

এর মানে কি? কি বলছেন উনি? আমাকে বেশিক্ষণ হতচকিত অবস্থায় থাকতে হলো না। প্রফেসর ক্লার্ক তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করলেন। ইংরেজিতে বললেন, আমি একটি বাঙালি মেয়ে বিয়ে করেছি, কাজেই আমি তোমাদের জামাই। আমার স্ত্রীর নাম ভারতী মুখোপাধ্যায়। কোলকাতার মেয়ে।

"বলো কি?"

"খুব অবাক হয়েছ?"

"তা হয়েছি।"

"বাংলাদেশের কোন জায়গায় তোমার জন্ম?"

"ময়মনসিংহ।"

"ভারতীর দেশও ময়মনসিংহ– মজার ব্যাপার না?"

"হ্যাঁ খুবই মজার ব্যাপার।"

"তোমার সঙ্গে আমার আরো কিছু মিল আছে। কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম তুমি Ph.D করেছ নর্থ ডেকোটা থেকে। আমার জন্মও নর্থ ডেকোটায়। এসো আমরা কফি খেতে খেতে গল্প করি।"

কফির মগ হাতে তিনি দল ছেড়ে বাইরে গেলেন, আমি গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। তিনি গলার স্বর নামিয়ে বললেন, ওয়াশিংটন থেকে টেলেক্স করে তোমার পারিবারিক দুর্ঘটনার খবর আমাকে জানিয়েছে। আমি খুবই দুঃখিত। তবু তুমি যে এসেছ এতেও আনন্দ পাচ্ছি। বাংলাদেশ থেকে এই প্রথম ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামে কাউকে পেলাম।

"আগে আর কেউ আসেন নি?"

"না। তবে তোমাদের কবি জসীমুদ্দিনের মেয়ে হাসনা ছিল। সে অবশ্য রাইটিং প্রোগ্রামে ছিল না। সে ছিল আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তুমি কি তাকে চেনো?"

"না আমি চিনি না। আমার চেনাজানার গণ্ডি খুবই সীমিত।"

"ভারতীর সঙ্গে আমি তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। ও এখন আছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেও অধ্যাপনা করে। ভারতী এলে তোমাকে দেখিয়ে দেবে কোন গ্রোসারিতে হলুদ, মরিচ, ধনিয়া পাওয়া যায়। ও সব জানে।"

"ধন্যবাদ প্রফেসর ব্লেইস।"

"তুমি তো অনেক দিন পর এ দেশে এলে, কেমন লাগছে?"

"এখনো বুঝতে পারছি না।"

"খুব শীত পড়বে কিন্তু। গরম কাপড় কিনে নিও। কোনোরকম অসুবিধা হলে আমাকে জানিও। আমি জানি বাঙালিরা মুখচোরা ধরনের হয়। আমেরিকায় যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমেরিকানদের মতোই থাকবে।"

আমরা লেখদের দলে ফিরে এলাম। লেখকদের মধ্যে একজন শাড়ি পরা মহিলা। সম্ভবত ভারতের কবি গগন গিল। এগিয়ে গেলাম– না গগন গিল নন ইনি শ্রীলংকার কবি জেন, উনি সঙ্গে তাঁর স্বামীকে নিয়ে এসেছেন। স্বামী বেচারাকে মনে হলো স্ত্রীর প্রতিভায় মুগ্ধ। হাঁ করে সারাক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। কবি জেন-এর কথা বলা রোগ আছে। মনে হয় অনেকক্ষণ কথা বলার কাউকে পাচ্ছিলেন না, আমাকে পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন। কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ খুলে এক তাড়া কাগজ বের করে বললেন আমি 'গোয়া' নিয়ে একটি কবিতা লিখেছি। এসো তোমাকে পড়ে শোনাই। শুনতে আপত্তি নেই তো?

প্রথম আলাপেই অভদ্র হওয়া যায় না, আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম। ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি শুরু করলেন ইংরেজি কবিতা। সেই কবিতাও মহাভারতের সাইজের, শেষ হতে চায় না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেল। এ কি বিপদে পড়লাম। চোখে-মুখে আগ্রহের ভাব ধরে রাখতে হচ্ছে। যাতে আমাকে দেখে মনে হয় কবিতার প্রতিটি শব্দ আমাকে অভিভূত করছে। এ বড় কঠিন অভিনয়। এক সময় কাব্য পাঠ শেষ হলো। জেন উজ্জ্বল মুখে বললেন,

"কেমন লাগল বলো তো?"

"অসাধারণ।"

www.MurchOna.com

"থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। তোমার কি ধারণা কবিতাটা একটু অদ্ভুত?"

"কিছুটা অদ্ভুত তো বটেই।"

"সবাই তাই বলে। জানো, আমি সহজ করে লিখতে চাই কিন্তু মাঝামাঝি এসে সুররিয়েলিস্টিক হয়ে যায়। মনে হয় অন্য কেউ যেন আমার মাঝে কাজ করে। সে আমাকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেয়।"

ভদ্রমহিলার স্বামী বললেন, "ওগো তুমি হুমায়ূনকে ঐ কবিতাটা শোনাও–ঐ যে কার্ফ্যুর রাতে তুমি রাস্তায় হাঁটছিলে।"

জেন সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় কবিতা বের করলেন। আয়তনে সেটি প্রথমটির দ্বিগুণ। দ্বিতীয় কবিতা শুনলাম তারপর তৃতীয় কবিতা শুনলাম এবং শুকনো মুখে বললাম আমি এখন একটু করিডোরে যাব। আমাকে সিগারেট খেতে হবে।

ভদ্রমহিলা এবং তার স্বামী কবিতার গোছা নিয়ে অন্য একজনের কাছে ছুটে গেলেন। আমি সিগারেট ধরিয়ে অলস ভঙ্গিতে করিডোর ধরে হাঁটছি। করিডোরের শেষ প্রান্তে বিরস মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ইন্দোনেশীয় ঔপন্যাসিক তোহারি। আহমেদ তোহারি। ছোটখাটো মানুষ, দেখলেই স্কুলের নবম শ্রেণীর বালক বলে ভ্রম হয়। নতুন দাড়ি-গোঁফ গজানোর কারণে যে বালক বিব্রত এবং লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার রোগ যাকে সম্প্রতি ধরেছে।

আহমেদ তোহারি তাঁর দেশে অতি জনপ্রিয়। তাঁর পাঁচটি উপন্যাস জাপানি ভাষায় অনূদিত ও সমাদৃত হয়েছে। সম্প্রতি তিনি তাঁর দেশের সবচে' বড় সাহিত্য পুরস্কারটি পেয়েছেন। বয়স ৪১, আমি নিজের পরিচয় দিতেই আনন্দিত হবার ভঙ্গি করলেন। তাঁর ইংরেজি জ্ঞান, ইয়েস এবং নো'র চেয়ে একটু বেশি তবে খুব বেশি না। নিজেকে প্রকাশ করতে তাঁর প্রচুর সময় লাগে। মনে হলো এই নিয়েও তিনি বিব্রত। নিজেকে অন্যদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার এটিও একটা কারণ হতে পারে।

আহমেদ তোহারি বললেন, "তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো?"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "কি সাহায্য?"

"তুমি কি একটা ভালো কম্পাস কিনে দেবার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে? কম্পাস না থাকায় নামাজ পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। কাবার দিক ঠিক করতে পারছি না।"

"অবশ্যই কম্পাস কেনার ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করব। তবে আমি কি তোমাকে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"হ্যাঁ পারো।"

www.MurchOna.com

"তুমি যখন জাকার্তা থেকে বিমানে করে ওয়াশিংটন এসেছ তখন তোমাকে কুড়ি ঘণ্টা বিমানে থাকতে হয়েছে। এই সময়ে কয়েকবার নামাজের সময় হয়েছে, কাবা শরীফ তখন ছিল তোমার নিচে। সেই সময় নামাজ কি ভাবে পড়েছ?"

তোহারি জবাব না দিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুসলমান হয়ে এই কথা বলব তা তিনি সম্ভবত কল্পনা করেন নি। আমারো বেশ খারাপ লাগল। এই কূটতর্কের কোনোই প্রয়োজন ছিল না।

অপরাধ বোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে নিজেই একটা ভালো কম্পাস কিনে আনলাম। সেই রাতে লেখকদের সম্মানে ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক বিশাল এক পার্টির আয়োজন করেছে। ফরম্যাল ডিনার। খানার চেয়ে পিনার আয়োজন বেশি। অবাক হয়ে দেখি আহমদ তোহারি রেড ওয়াইন নিয়ে বসেছেন এবং বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে খাচ্ছেন। আমি তাঁর পাশে জায়গা করে বসলাম এবং মধুর স্বরে বললাম, "তুমি মদপান করছ ব্যাপারটা কি?"

তোহারি বললেন, "মদপান দোষের নয়। মওলানা জালালুদ্দিন রুমি মদপান করতেন।"

"ও আচ্ছা। আমাদের প্রফেট কিন্তু করতেন না।"

তোহারি আমার কথাবার্তা পছন্দ করলেন না। গ্লাস নিয়ে উঠে চলে গেলেন। আমার অপমানিত বোধ করার কথা কেন জানি তা করলাম না। বরং মজা লাগল।

আমার বাঁ পাশে বসেছেন চৈনিক ঔপন্যাসিক জং ইয়ং। দেখেই মনে হয় খুব হাসি-খুশি মানুষ। কথা বলতে গিয়ে দেখলাম তাঁর ইংরেজি জ্ঞান 'ইয়েসে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'ইয়েস' ছাড়া অন্য কোনো ইংরেজি শব্দ তিনি এখনো শিখে উঠতে পারেন নি বলে মনে হলো। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার কিছু নমুনা দেই।

"আমার নাম হুমায়ূন। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বাংলাদেশ– তোমরা যাকে বলো মানছালা।"

"ইয়েস।" [মুখ ভর্তি হাসি। মনে হলো আমার পরিচয় পেয়ে খুব আনন্দিত।]

"তুমি কি শুধু উপন্যাসই লেখো? না কবিতাও লেখো?"

"ইয়েস।" [আবার হাসি, খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে।]

"আজকের পার্টি তোমার কেমন লাগছে?"

"ইয়েস। ইয়েস।" [হাসি এবং মাথা নাড়া। মনে হলো আমার সঙ্গে কথা বলে তিনি খুব আরাম পাচ্ছেন।]

ভারতীয় মহিলা কবি গগন গিলের সঙ্গে দেখা হলো এই পার্টিতেই। লেখকদের মধ্যে তিনিই সবচে' কমবয়েসি। চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হবে না।

www.MurchOna.com

অত্যন্ত রূপবতী। মেরুন রঙের সিল্কের শাড়িতে তাঁকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। ভদ্রমহিলার হাতে মদের গ্লাস, নির্বিকার ভঙ্গিতে ভুসভুস করে সিগারেট টানছেন। শাড়ি পরা কোনো মহিলার মদ পান এবং সিগারেট টানার দৃশ্যের সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই বলে খানিকটা অস্বস্তি লাগছে, যদিও জানি অস্বস্তি লাগার কিছুই নেই। পুরুষরা যা পারে ওরাও তা পারে ওরা বরং আরো বেশি পারে, ওরা গর্ভধারণ করতে পারে আমরা পুরষরা তা পারি না।

পার্টির শেষে আমি আহমদ তোহারিকে কম্পাসটা দিলাম। তিনি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমার কাছ থেকে এটা তিনি আশা করেন নি বলে মনে হলো। মানুষের বিস্মিত মুখের ছবি– বড়াই চমৎকার। আমার দেখতে খুব ভালো লাগে।

"তোহারি তোমার জন্যে আমার সামান্য উপহার। উপহারটি কাজে লাগলে আমি খুশি হব।"

লেখকরা খুব আবেগপ্রবণ হন এই কথা বোধ হয় মিথ্যা নয়, তোহারি 'মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড' 'মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। সবাই ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল, একজন পুরুষ অন্য একজন পুরুষকে জড়িয়ে ধরেছে এই দৃশ্য তাদের কাছে খুব রুচিকর নয়।

নিজের আস্তানা ভুতুড়ে বাড়িতে ফিরছি তবে ভূতের হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা করে ফিরছি। স্টিফান কিং-এর একটি ভৌতিক উপন্যাস কিনে নিয়েছি। বিষে বিষক্ষয়ের মতো ভূতে ভূতক্ষয়।

বাসায় ফিরে দেখি স্টিফান কিং-এর উপন্যাস কেনার দরকার ছিল না। ফিলিপাইনের ঔপন্যাসিক রোজেলিও সিকাটকে আমার এখানে দিয়ে গেছে। তিনিও দেরিতে এসেছেন বলে মে ফ্লাওয়ারে জায়গা হয় নি।

রোজেলিও সিকাটের বয়স পঞ্চাশ তবে দেখায় তার চেয়েও বেশি। মাথায় চুল সবই সাদা। দাঁত বাঁধানো। অল্প কিছু দাড়িগোঁফ আছে। মুখের গঠন অনেকটা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো। চেইন স্মোকার।

সিকাট ইউনিভার্সিটি অব ফিলিপাইনের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। নিজ দেশে তাঁর খ্যাতি তুঙ্গ স্পর্শী। তাঁকে অত্যন্ত বিরক্ত মনে হলো। আমাকে বললেন, এদের কারবারটা দেখলে? এরা আমাকে মে ফ্লাওয়ারে জায়গা দেয় নি– এই বাড়িতে নির্বাসন দিয়েছে।

"নির্বাসন বলছ কেন?"

"নির্বাসন না তো কি? সব লেখকরা দল বেঁধে মে ফ্লাওয়ারে আছেন আর আমি কি-না এখানে।"

www.MurchOna.com

"বাড়িটা কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না?"

"পছন্দ হবে না কেন? পছন্দ হয়েছে। বাড়ি খুবই সুন্দর। কিন্তু প্রশ্নটা হলো নীতির। তুমি সম্ভবত জানো না এর আগে চারজন লেখককে এই বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছিল। চারজনই অস্বীকার করেছেন।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ তাই। রোমানিয়ার কবি মির্চাকে (মির্চা কাৰ্ত্তেরেষকু) এই বাড়ি দেয়া হলে তিনি ওদের মুখের ওপর বলেছেন– এটা একটা 'Ghetto এই Ghetto-তে আমি থাকব না। আমাকে আপনারা বুখারেস্টের প্লেনে তুলে দিন।"

"তুমিও ওদের তাই বলো।"

"অবশ্যই বলব। রাগটা ঠিকমত উঠছে না। রাগ উঠলেই বলব। আমাকে দেখে মনে হয় না কিন্তু আসলে আমি খুবই রাগী মানুষ। জার্মানিতে আমি একবার মারামারি পর্যন্ত করেছি।"

"সে কি!"

"এক জার্মান যুবক আমাকে দেখে তামাশা করে কি সব বলছিল, দাঁত বের করে হাসছিল, গদাম করে তার পেটে ঘুসি বসিয়ে দিলাম। এক ঘুসিতে ঠাণ্ডা।"

আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এখানে অবশ্য তেমন কিছু করা যাবে না।

"করা যাবে না কেন?"

"করা যাবে না কারণ আসার আগে আমি আমার স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি– রাগারাগি করব না। আমি আবার তাকে খুবই ভালোবাসি।"

"তাই বুঝি?"

"হ্যাঁ। সে বড়ই ভালোমেয়ে এবং রূপবতী।"

"একই সঙ্গে রূপবতী এবং ভালোমেয়ে সচরাচর হয় না– তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান।"

"বুঝলে হুমায়ূন, আমার স্ত্রীর এক ধরনের ইএসপি ক্ষমতা আছে। আমি যখন লেখালেখি করি তখন সে বুঝতে পারে– কখন আমি কফি চাই, কখন খাবার চাই। ঠিক সময়ে কফি উপস্থিত হয়। ঠিক সময়ে খাবার।'

"বড় চমৎকার তো!"

"একবার সে কি করল জানো? তার সমস্ত জমানো টাকা এবং গয়না বিক্রির টাকা একত্র করে ফিলিপাইনের পাহাড়ি অঞ্চলে পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট একটা বাড়ি কিনল। যাতে ঐ বাড়িতে বসে নিরিবিলি আমি আমার লেখার কাজ চালিয়ে যেতে পারি। আমি

www.MurchOna.com

প্রতি বছর ঐ পাহাড়ি বাড়িতে একনাগাড়ে একা একা তিন মাস থাকতাম। নিজেই রান্না করে খেতাম সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একনাগাড়ে লিখতাম।"

"তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে থাকত না?"

"ও থাকবে কি করে? ওর ঘর-সংসার আছে না? ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ওদের কে দেখাশোনা করবে?"

"ঐ বাড়িটি কি এখনো আছে?"

"না বিক্রি করে দিয়েছি। এক সময় খুব অভাবে পড়লাম, বিক্রি করে দিলাম। এখনো ঐ বাড়ির জন্যে আমার মন কাঁদে। অনেকক্ষণ তোমার সঙ্গে গল্প করলাম। যাই এখন কাজ করি। আমি একটা জাপানি উপন্যাস টেগালগ ভাষায় অনুবাদ করছি– Snow country কাওয়াবাতার লেখা।"

সিকাট টাইপ রাইটার নিয়ে বসলেন। তিনি টেগালগ ভাষায় লিখেন ঠিকই ব্যবহার করেন ইংরেজি টাইপ রাইটার। কারণ টেগালগ ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। তাদের ভরসা রোমান হরফ। একই ব্যাপার তোহারির বেলাতেও। তিনিও নিজের ভাষাতে লেখেন ব্যবহার করেন ইংরেজি বর্ণমালা। অধিকাংশ আফ্রিকান দেশেই এই অবস্থা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা আরো গভীর। তারা সরাসরি ইংরেজি বা ফরাসি ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করেন। সেনেগালের শিশু-সাহিত্যিক লিখেন ফরাসি ভাষায়, কোনো আফ্রিকান ভাষায় নয়। শ্রীলংকার কবি জেন কখনো সিংহলি বা তামিল ভাষায় লিখেননি। লিখেছেন ইংরেজিতে। নাইজেরিয়ার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাট্যকার ওলে সোয়েংকা (Wole Soyinka) লেখালেখি করেন ইংরেজি ভাষায়। নিজের ভাষায় না।

বাংলা ভাষার লেখক হিসেবে আমি মহাভাগ্যবান। অন্যের ভাষায় আমাকে লিখতে হচ্ছে না, অন্যের হরফ নিয়েও আমাকে লিখতে হচ্ছে না। আমার আছে প্রিয় বর্ণমালা। এই বর্ণমালা রক্ত ও ভালোবাসা দিয়ে পৃথিবীর বুকে গেঁথে দেয়া হয়েছে।

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেন স্টুডেন্ট এডভাইজারকে এখানে ক'জন বাংলাদেশী ছাত্র আছে জানতে চেয়ে এটি চিঠি লিখেছিলাম, ফরেন স্টুডেন্ট এডভাইজার দু'দিন পরে চিঠি লিখে পাঁচজন বাংলাদেশী আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রের তালিকা পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিতে লিখলেন– মোট ছ'জন বাংলাদেশী ছাত্র পড়াশোনা করে, তোমাকে পাঁচজনের নাম এবং টেলিফোন নাম্বার পাঠানো হলো।

www.MurchOna.com

ষষ্ঠ জনের নাম পাঠালাম না কারণ তার ব্যক্তিগত ফাইলে লেখা আছে তার সম্পর্কে কোনো তথ্য কাউকে জানানো যাবে না।

তালিকায় সবার প্রথম যার নাম তাকেই টেলিফোন করলাম। আহসান উল্লাহ আমান। আমি বাংলা ভাষায় বললাম, আমার নাম এই, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি–

সে নিখুঁত আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, আমি বাংলায় কথা বলা ভুলে গেছি– কাজেই ইংরেজিতে বলছি।

আমি হতভম্ব! বলে কি এই ছেলে তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে বললাম, বাংলায় কথা বলা ভুলে গিয়েছ?

"ইয়েস, টোটেলি ফরগটন।"

"ভুলে যাওয়া বিচিত্র কিছু না– বড়ই কঠিন ভাষা। আশা করি ভুলতে তোমাকে খুব কষ্ট করতে হয়নি।"

"অনেক দিন বাইরে আছি তো এই জন্যে ভুলে গেছি।"

"শুনে বড় ভালো লাগল।"

"আমি কি কিছু করতে পারি আপনার জন্য?"

"না। তুমি কিছু করতে পারো না। ভাবছিলাম আমি তোমার জন্যে কিছু করতে পারি কি-না। মনে হচ্ছে তাও সম্ভব নয়।"

"আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছি না। দয়া করে ইংরেজিতে বলুন।"

"আজ থাক অন্য আরেক দিন বলব।"

টেলিফোন নামিয়ে হতভম্ব হয়ে বসে আছি– সিকাট এসে বললেন, তোমার কি হয়েছে?

"কিছু হয় নি। কিছুক্ষণ আগে একজন বাংলাদেশী ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছে সে বলল সে বাংলা ভাষা ভুলে গেছে।"

"তুমি তার ঠিকানা জোগাড় করো। তারপর আমাকে নিয়ে চলো, আমি ঘুসি দিয়ে তার নাক ফাটিয়ে দিয়ে আসব। না না ঠাট্টা না, মারামারির ব্যাপারে আমি খুব এক্সপার্ট– জার্মানিতে কি করেছিলাম তোমাকে তো বলেছি, একেবারে হৈচৈ পড়ে গেল। এম্বেসি ধরে টানাটানি।"

আমি নানানভাবে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম– হয়তো এই ছেলের জন্ম হয়েছে এখানে, কোনোদিন বাংলায় কথা বলার সুযোগ হয় নি... হতেও তো পারে। বাংলাদেশের কোনো ছেলে কিছুদিন আমেরিকা বাস করে নিজের ভাষাকে অস্বীকার করবে তা হতেই পারে না।

www.MurchOna.com

কিংবা কে জানে হয়তো পারে। এই দেশ খুব সহজেই মানুষকে বদলে দেয়। চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। নয়তো কেন এত এত শিক্ষিত ভদ্রঘরের চমৎকার ছেলেরা বাসন মেজে দিন পার করাতেই আনন্দ এবং জীবনের পরম লক্ষ্য খুঁজে পায়। কি আছে এ দেশে? সাজানো-গোছানো শহর, চমৎকার মল, চোখ ধাঁধানো হাইওয়ে? এই কি সব?

একটি আমেরিকান পরিবারের জীবনচর্যা চিন্তা করলে কষ্ট হয়। ওরা কি হারাচ্ছে তা বুঝতে পারে না। আমরা যারা বাইরে থেকে আসি- বুঝাতে পারি কিংবা বোঝার চেষ্টা করি।

একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করা যাক।

সর্বাধুনিক একটি হাসপাতালে শিশুটির জন্ম হলো। বিশ্বের সেরা ডাক্তাররা জন্মলগ্নে শিশুটির পাশে থাকলেন। সে বাসায় ফিরল কিন্তু মায়ের কোলে ফিরল না। তার আলাদা ঘর। আলাদা খাট। কেঁদে বুক ভাসালেও মা তাকে খাবার দেবেন না। ঘড়ি ধরে খাবার দেবেন। সে বড় হতে থাকবে নিজের আলাদা ঘরে। এতে নাকি তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হবে।

শিশু একটু বড় হলো। বাবা-মায়ের কাছে নয় বেশিরভাগ সময় তাকে এখন থাকতে হচ্ছে বেবি কেয়ার কিংবা বেবি সিটারদের কাছে।

তার চার-পাঁচ বছর বয়স হবা মাত্র শতকরা ৮০% ভাগ সম্ভাবনা সে দেখবে তার বাবা-মা আলাদা হয়ে গেছেন। এই ঘটনায় তারা যেন বড় রকমের শক না পায় তার জন্যেও ব্যবস্থা করা আছে। স্কুলের পাঠ্য তালিকায় বাবা-মা আলাদা হয়ে যাবার সমস্যা উল্লেখ করা আছে।

শিশুটির বয়স বারো পার হওয়া মাত্র স্কুল থেকে তাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। এটি নতুন হয়েছে। যাতে যৌন রোগে আক্রান্ত না হয় সেই ব্যবস্থা। বয়োসন্ধি বয়সে যখন তারা মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তনে হতচকিত সেই সময়টা তাদের কাটাতে হবে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর খোঁজে যাদের পরবর্তী সময়ে বিয়ে করবে। কি ভয়াবহ সেই অনুসন্ধান। একটি মেয়েকে অসংখ্য ছেলের মধ্যে ঘুরতে হবে যাতে সে পছন্দমতো কাউকে খুঁজে পায়। সময় চলে যাবার আগেই তা করতে হবে। প্রতিযোগিতা- ভয়াবহ প্রতিযোগিতা।

উনিশ-কুড়ি বছর বয়স হলো- বেরিয়ে যেতে হবে বাড়ি থেকে। এখন বাঁচতে হবে স্বাধীনভাবে। নিজের ঘর চাই। নিজের গাড়ি চাই। কোনো একটি চাকরি দ্রুত প্রয়োজন।

চাকরি পাওয়া গেল। তাতেও কোনো মানসিক শান্তি নেই। চাকরি সবই

www.MurchOna.com

অস্থায়ী। কাজ পছন্দ হলো না তো বিদায়। সংসার প্রতিপালন করতে হচ্ছে এক ধরনের অনিশ্চয়তায়। অনিশ্চয়তায় বাস করতে করতে অনিশ্চয়তা চলে আসছে তাদের আচার-আচরণে। তাদের কোনো কিছুই একনাগাড়ে বেশিদিন ভালো লাগে না। কাজেই ইস্ট থেকে ওয়েস্ট। ওয়েস্ট থেকে নর্থে। এক স্ত্রীকেও বেশি দিন ভালো লাগে না। গাড়ির মতো স্ত্রী বদল হয়।

এই করতে করতে সময় ফুরিয়ে যায়। আশ্রয় হয় ওল্ড হোম। জীবনের পরিণতি। এক সময় মৃত্যুবরণ করতে হয়। মৃত্যুর পর দেখা যায় তারা তাদের ধন-সম্পদ উইল করে দিয়েছে প্রিয় বিড়ালের নামে, কিংবা প্রিয় কুকুরের নামে।

আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় যা বুঝেছি তা হলো এদের প্রায় সবার চিন্তা-ভাবনা সীমাবদ্ধ। বস্তুকেন্দ্রিক। একটি মেয়ের জীবনের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হলো চিয়ার লিডার হবে। ফুটবল খেলার মাঠে স্কার্ট উচিয়ে নাচবে। স্কার্টের নিচে তার সুগঠিত পদযুগল দেখে দর্শকরা বিমোহিত হবে। এই তার সবচেয়ে বড় চাওয়া। একটি ছেলে চাইবে মিলিওনিয়ার হতে।

এই অতি সভ্য (?) দেশে আমি দেখি মেয়েদের কোনো সম্মান নেই। একজন মহিলাকে তারে দেখবে একজন উইম্যান হিসেবেই। একটি মেয়ের যে মাতৃরূপ আছে যা আমরা সব সময় দেখি ওরা তা দেখে না। একটি মেয়ে যতদিন পর্যন্ত শারীরিকভাবে আকর্ষণীয় ততদিন পর্যন্তই তার কদর।

যা কিছু হাস্যকর, তার সবই এদের ভাষায়– মেয়েলী, এফিমিনেট। শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি এই দেশে মেয়েরা একই যোগ্যতায় একই চাকরিতে পুরুষদের চেয়ে কম বেতন পান। বিমানের ক্যাপ্টেন যদি মহিলা হন তাহলে বিমানের যাত্রীদের তা জানানো হয় না। ক্যাপ্টেন পুরুষ হলে তবেই শুধু বলা হয়– আমি অমুক তোমাদের বিমানের ক্যাপ্টেন। মহিলা ক্যাপ্টেনের কথা বলা হয় না। কারণ মহিলা বিমানের দায়িত্বে আছেন জানলেই যাত্রীরা বেঁকে বসতে পারে। আমাদের দেশে মেয়েদের অবস্থা খারাপ তবু একজন মহিলা ডাক্তার একজন পুরুষ ডাক্তারের মতোই বেতন পান। কম পান না।

আমরা আমাদের দেশে একজন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধানের কথা চিন্তা করতে পারি। ভাবতে পারি। ওরা তা পারে না। আসছে একশ' বছরেও এই আমেরিকায় কোনো মহিলা প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট হবে না। অতি সুসভ্য এই দেশ তা হতে দেবে না।

জাতির শরীর যেমন আছে আত্মাও আছে। এই দেশের শরীরের গঠন চমৎকার কিন্তু আত্মা? এর আত্মা কোথায়?

আজ থেকে ৭০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা এসেছিলেন। নিউইয়র্ক থেকে চিঠি লিখছেন তাঁর আদরের কন্যা মীরা দেবীকে। সেই চিঠিতে আমেরিকার ব্যাপারে তাঁকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখা যায়, তাঁর চিঠির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি...

> এখানে মানুষের জন্যে মানুষের চিন্তা আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে উদ্বোধিত। এখানে টানাটানি-কাড়াকাড়ি হট্টগোলের ভেতরও বিশ্বমানবের দর্শন পাওয়া যায়। সেই বিরাট পুরুষের দর্শনেই নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ- দুঃখের আন্দোলনকে তুচ্ছ করে দেয়। আমাদের দেশে মানুষ অত্যন্ত ছোট হয়ে আছে কেবল যে তার জীবনের ক্ষেত্র ছোট, তা নয় তার চিন্তার আকাশ সঙ্কীর্ণ..."

[পত্রাবলী মীরা দেবীকে লেখা, ১৯০৬-৩৭, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সনৎ কুমার বাগচি কর্তৃক সংকলিত।]

মজার ব্যাপার হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পনের বছর পরই আমেরিকা সম্পর্কে তাঁর মত বদলান। তিনি তাঁর কন্যা মীরা দেবীকে আমেরিকা যেতে অনুৎসাহিত করে লিখেন–

> কল্যাণীয়াসু,
>
> মীরু, এখানে মেয়েদের বেশিদিন থাকার ক্ষতি আছে। তার কারণ এখানকার সমাজ সঙ্কীর্ণ এবং যারা আছে তারা অনেকেই নীচের স্তরের মানুষ। এখানে লোকের সংসর্গ অল্প কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়াতে মানুষকে বিচার করবার আদর্শ নেবে যায় এবং লোক পরিচয়ের শক্তি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। কলকাতায় সমাজের আদর্শ এখানকার চেয়ে প্রশস্ত এবং উপরের শ্রেণীর। যেটা খেলো এবং vulgar এখানে থাকতে থাকতে সেটা সয়ে যায় এবং তার হেয়তা বুঝতেই পারিনে। অল্প বয়সে, বিশেষত মেয়েদের পক্ষে এটা অত্যন্ত মুস্কিলের। এখানে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার সুবিধা আছে কিন্তু সামাজিক শিক্ষার জায়গা এটা নয়– অথচ যৌবনারম্ভে সেই শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। বুড়িকে নিয়ে যদি তুই এখানে দীর্ঘকাল থাকিস তাহলে তাতে বুড়ির ক্ষতি হবে, এখন সে কথা বুড়ি না বুঝতে পারলেও এর পরে তা অনুতাপের কারণ ঘটতে পারে। কলকাতায় আমাদের যে সমাজ সেই সমাজের সঙ্গে বুড়িকে মিলিয়ে দিতে হবেই, নইলে সে তার নিজের ও বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে জানবে না।
>
> মাঝে শরীর খারাপ হয়েছিল এখন সেরে উঠেছি। যেতে হবে দূরে,

www.MurchOna.com

ঘুরতে হবে বিস্তর, ফিরতে মাসখানেক লাগবে– তার পরে কলকাতায় তোদের একবার দেখে আসব। আমার মাটির ঘরের ভিৎ দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠছে।

ইতি ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫

বুড়িকে পদ্যে একটা চিঠি কিছুকাল পূর্বে লিখেছিলুম–পদ্যে সে তার জবাব দেবার চেষ্টা যেন না করে এই আমার সানুনয় অনুরোধ।

এই প্রসঙ্গে আরেকজনের উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। ইনি হচ্ছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মহান ঔপন্যাসিক আলেকজান্ডার সোলঝনিৎসিন। নিজ দেশ ছেড়ে গণতন্ত্রের স্বাধীন ভূমি আমেরিকাতে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন। হার্বার্ড বিশ্ববিদালয়ের ৩২৭তম কমেন্সমেন্ট অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই বক্তৃতায় তিনি আমেরিকা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রসঙ্গে তাঁর মোহভঙ্গের কথা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেন। পুরো বক্তৃতাটি তুলে দিতে পারলে ভালো হতো আমি অল্পকিছু অংশ তুলে দিলাম–

> There are teliltale symptoms by which history gives warning to a threatened or perishing society. Such are, for instance, a decline of the arts or a lack of great statesmen. Indeed, sometimes the warnings are quite explicit and concrete. The center of your democracy and of your culture is left without electric power for a few hours only, and all of a sudden crowds of American citizens start looting and creating hovoc. The smooth surface film must be very thin, then, the social system quite unstable and unhealthy.

অধ্যাপক ক্লার্ক ব্লেইস দুপুরে তাঁর সঙ্গে খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছেন। ভারতী মুখোপাধ্যায় কেলিফোর্নিয়া থেকে ফিরে এসেছেন– এই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গেও দেখা হবে। ক্লার্ক এসে নিয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম রাজপ্রাসাদের মতো বিশাল বাড়ি দেখব– তা নয়, ছোট্ট বাড়ি। ভারতী মুখোপাধায়ের সঙ্গেও দেখা হলো। শাড়ি পরা বাঙালি মেয়ে। এককালে ডাকসাইটে রূপসী ছিলেন তা বোঝা যায়। রূপের খানিকটা এখনো ধরে আছে। তিনি নিজেও একজন ঔপন্যাসিক। সাহিত্য চর্চা করেন ইংরেজি ভাষায়। তাঁর লেখা একটা উপন্যাস 'জেসমিন' আমেরিকায় বেস্ট সেলার হয়েছে। অবশ্যি এই উপন্যাসে তিনি ভারতকে ছোট করে দেখিয়ে পশ্চিমের জয়গান করেছেন।

ভেবেছিলাম মন খুলে কথাবার্তা বলা যাবে– তা সম্ভব হলো না। কারণ আমার সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন শ্রীলংকার কবি জেন এবং তাঁর স্ত্রী প্রতিভায় মুগ্ধ স্বামী। বলাই বাহুল্য জেন সঙ্গে করে একগাদা কবিতা নিয়ে এসেছেন এবং ক্রমাগত পড়ে যাচ্ছেন। এক সময় তিনি প্রাকৃতিক নিয়মেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন– ভাবলাম এইবার হয়তো কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে, তা পাওয়া গেল না। জেন-এর স্বামী তখন আসরে নামলেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর যে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে সেই সব বলতে লাগলেন। জেন স্বামীকে উস্কে দিচ্ছেন– "দেবীর সঙ্গে দেখা হবার গল্পটা বলো হানি।" "হানি, প্রিকগনিশন ড্রিমের ঐ অসাধারণ গল্পটা বলো।"

ভদ্রলোক অদ্ভুত সব গল্প শোনাতে লাগলেন। বিংশ শতাব্দীতে– আমেরিকায় বসে এইসব গাঁজাখুরী গল্প শোনার কোনো মানে হয় না। কিন্তু যেহেতু আমরা সভ্য মানুষ– কান পেতে শুনে যাই। ভদ্রলোকের একটি কাহিনী হলো– দেবি স্বরস্বতীর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ। এক দুপুরে তিনি তাঁর গ্রামের রাস্তায় হাঁটছিলেন। বয়স খুবই কম–ন'-দশ। কোথাও লোকজন নেই। হাঁটতে হাঁটতে পুরোনো এক মন্দিরের কাছে চলে এলেন। মন্দিরের কাছে এসেই মিষ্টি ফুলের গন্ধে চমকে উঠলেন। তারপর দেখেন মন্দিরের ভেতর থেকে দেবী সরস্বতী বের হয়ে হাত ইশারা করে তাঁকে ডাকছেন।

আমি গল্পের এক পর্যায়ে উঠে গিয়ে অধ্যাপক ক্লার্কের ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগলাম। সমস্ত ঘর ভর্তি ছোট ছোট ফ্রেম বাঁধানো প্রাচীন সব গ্রন্থের পৃষ্ঠা। ক্লার্ক বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোনটা কি। এর মধ্যে আছে মূল শাহনামা গ্রন্থের এক পৃষ্ঠা যা তিনি তিন হাজার ডলার দিয়ে কানাডা থেকে কিনেছেন। দু'হাজার বছর আগের কোরআন শরীফের একটি পৃষ্ঠা। মোগল আমলের কিছু গ্রন্থের মলিন পাতা। সবই অতি যত্নে সংরক্ষিত।

খাবার ডাক পড়ল।

আশা করেছিলাম ভাত-ডাল-মাছ এইসব থাকবে। তা না, পিজা ডিনার। সেই পিজাও ঘরে বানানো নয়– দোকান থেকে কিনে আনা। পিজা খাচ্ছি এবং শ্রীলংকার ভদ্রলোকের অলৌকিক গল্প শুনছি। জেনের কবিতার মতো উনার গল্পও অফুরান।

প্রফেসার ক্লার্ক এক পর্যায়ে বললে, "আমরা হুমায়ূনের গল্প শুনি।"

আমি বললাম, "আমার তো কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই কি গল্প বলব?"

"আমেরিকা প্রসঙ্গে অভিজ্ঞতার গল্প শুনি। ভেতর থেকে নিজেদের দেখা

www.MurchOna.com

কঠিন। বাইরে থেকে দেখা সহজ। আমি এক বছর কোলকাতায় ছিলাম। তার ওপর ভিত্তি করে একটি বই লিখেছি- 'Nights and Days and Calculta' তোমাকে একটা কপি দেব। এখন তুমি বলো তুমি যে নর্থ ডেকোটায় ছিলে, কি দেখেছ? বরফ ছাড়া কি দেখেছ?"

আমি নর্থ ডেকোটায় এক হাসপাতালে আমার মেজ মেয়ে শীলার জন্মের গল্পটি শুরু করলাম। তার জন্মমুহূর্তে আমাকে শীলার মা'র পাশে হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। শিশু জন্মের এই ভয়াবহ ব্যাপারটাই প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। আমি চলে গিয়েছিলাম এক ধরনের ঘোরের রাজত্বে। মনে হচ্ছিল চোখের সামনে যা দেখছি তা সত্যি নয় স্বপ্ন। স্বপ্ন ভঙ্গ হলো গুলতেকিনের কথায়, তুমি এরকম করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বাচ্চার কান্না শুনতে পাচ্ছ না? আজান দাও। আমি বিকট শব্দে আজান শুরু করলাম। ডাক্তার এবং নার্সদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল- এই বাঙাল কি করছে?

একটা মজার গল্প। যাদেরকেই এই গল্প করেছি তারাই প্রাণ খুলে হেসেছে। এখানে ভিন্ন ব্যাপার হলো। দেখি কবি জেন-এর চোখ ছলছল করছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি কেঁদে ফেলবেন। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আমি এমন মানবিক গল্প এর আগে শুনিনি। আমি অভিভূত। এই নিয়ে একটি কবিতা না লেখা পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না। আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেছে। দেখো হুমায়ূন দেখো।

তিনি তাঁর হাত আমার সামনে এগিয়ে দিলেন। সেই হাতে কোনো লোম নেই কাজেই লোম খাড়া হলো কি হলো না তা বুঝতে পারলাম না তবে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম- একটা মজার গল্প বলে এ কি বিপদে পড়লাম।

এই ঘটনার দিন সাতেক পরের কথা। সন্ধ্যাবেলা প্রেইরি বুক স্টোরে কবিতা পাঠের আসর বসেছে। কবিতা শুনতে গিয়েছি। প্রথম কবিতা পাঠ করলেন পোলিশ কবি ও গল্পকার পিটার। তারপর উঠে দাঁড়ালেন জেন। গম্ভীর গলায় বললেন-

"আমি যে কবিতাটি পাঠ করব তা উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদকে। তাঁর একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প শুনে আবেগে অভিভূত হয়ে আমি কবিতাটি লিখি।"

সব দর্শক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকদের দিকে আমাকে নড করতে হলো। জেন কবিতা পাঠ শুরু করলেন- আবার তাঁর চোখে পানি এসে গেল। এবং আশ্চর্য আমার নিজের চোখও ভিজে উঠল। এই অতি আবেগপ্রবণ কবির কবিতাটি পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে হুবহু তুলে দিচ্ছি। একজন

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

কবি আমার সামান্য একটি গল্প শুনে কবিতা লিখে আমাকে উৎসর্গ করেছেন এই আনন্দও তো কম নয়।

DESH

[POEM FOR HUMAYAUN]

Beside your wife's bed side awaiting the birth
Of your child you uttered the name of God
Many times
Allah-U-Akbar-
This was not your country
You were fare away but is one ever apart
For those gods who are so intimate
A part of your life?
You will nevr be alone here
Even in the snowy deserts of winter
Or when the trees shed all the leaves in Fall,
When you pray for the safety of mother Of child,
The gods have a way of following you
And you of taking them with you
Just as, over the oceans, you carry
A Litlle of the Desh, the earth of your
Country and when you are lonely, touch it
As you would its fields, its rivers and its trees
And feel that this is your home,
It is where you belong.
I also remember your words, friend,
"My mother told me, fill your palm
with some soil of the Desh
when my daughter was born
Or else, the baby will cry for the soil"

But those, tear won't they irrigate
The arid earth of our lives?

www.MurchOna.com

সন্ধ্যা থেকে টিভির সামনে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তুষার পড়ছে না তবে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে নেমে গেছে। ঘরে হিটিং-এর ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থা কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। আমেরিকানরা একটি নির্দিষ্ট দিনে হিটিং চালু করে– সেই দিন আসার এখনো দেরি আছে। শীতে কাঁপছি, মনটাও খারাপ হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগে বাসায় টেলিফোন করেছিলাম– ছোট মেয়ে টেলিফোন ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল– বাবা, আম্মা আমাকে মেরেছে।

"কেন মেরেছে মা?"

"শুধু শুধু মেরেছে।"

বলেই আমার অতি আদরের মেয়ে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি তের হাজার মাইল দূরে। হাত বাড়িয়ে তাকে আদর করতে পারছি না। আমার নিজের চোখও ছলছল করতে লাগল, কোমল গলায় বললাম–

"তোমার জন্যে কি কি আনতে হবে আরেকবার বলো মা।"

সে ধরা গলায় বলল, কিছু আনতে হবে না, তুমি এসে আমাকে আদর করো।

আমি মন খারাপ করে টেলিফোন রেখে টিভির সামনে এসে বসেছি। ভালো প্রোগ্রাম হচ্ছে– সিচুয়েশন কমেডি কিন্তু মন দিতে পারছি না। বারবার মনে হচ্ছে– কেন এলাম এই দেশে, কি প্রয়োজন ছিল?

আমেরিকা দেখা? আমেরিকা জানা? কি হবে আমেরিকা দেখে এবং জেনে?

নিজের দেশে এবং নিজের দেশের মানুষকে কি আমি ঠিকমত জানতে পেরেছি? বা সত্যিকার অর্থে জানার চেষ্টা করেছি?

টেলিফোন বাজছে। উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম। ঢাকা থেকে গুলতেকিন টেলিফোন করেছে।

"শোনো, বুঝতে পারছি মেয়ের সঙ্গে কথা বলে তোমার মন খারাপ হয়েছে। এই জন্যেই টেলিফোন করলাম। তোমার মেয়ে শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। আমি তাকে সামান্য বকা দিয়েছিলাম– বড় যন্ত্রণা করে। মাঝে মাঝে ওদের বকা দেয়ার অধিকার তো আমার আছে। আছে না?"

"অবশ্যই আছে।"

"তোমার মন ভালো হয়েছে তো?"

"হয়েছে। টেলিফোন করার জন্যে ধন্যবাদ।"

"থাক, আমেরিকানদের মতো ফর্মাল হবার দরকার নেই। খাওয়া-দাওয়া করেছ?"

www.MurchOna.com

"এখনো করিনি– রান্না শুরু করব।"

"আজকের মেনু কি?"

"ভাত এবং ডিমভাজা।"

"তুমি তো মনে হচ্ছে আমেরিকান সব ডিম খেয়ে শেষ করে ফেলছ।"

"কি করব বলো ডিম ছাড়া তো আর কিছু রাঁধতে পারি না।"

আবার টিভির সামনে এসে বসলাম। এখন প্রোগ্রামগুলি ভালো লাগছে। ভাঁড়ামো ধরনের রসিকতাতেও প্রচুর হাসি পাচ্ছে। রাত দশটার দিকে ডিম ভাজতে গেলাম। এখানকার প্রোগ্রামের একটি বড় অংশ হচ্ছে নিজের সংসার গুছিয়ে নিজের মতো করে থাকা। ঘুরে বেড়ানো। মাঝে মাঝে লেখকদের প্যানেল ডিসকাশন। ইচ্ছে করলে সেখানে যাওয়া যায় ইচ্ছা না করলে যাওয়ার দরকার নেই। লেখকরা নিজেদের লেখা সম্পর্কে বলেন, কবিতা পড়েন বা গল্প পড়ে শোনান। সবই খুব ঘরোয়া ভঙ্গিতে। কোনোদিন আসর বসে কফি শপে, কোনোদিন আইসক্রিম শপে, কোনোদিন পথের মোড়ে।

একদিন আমাদের বাড়ির লনে আসর বসল। বার্বিকিউ হচ্ছে, বিয়ার খাওয়া হচ্ছে– এর মধ্যেই গল্প পাঠের আসর। পাঠ করা হবে বাংলাদেশের গল্প। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনয় কলায় পড়াশোনা করছে এমন একজনকে ঠিক করা হলো আমার ১৯৭১ উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ পড়ে শোনানোর জন্যে। সম্ভবত আমার পড়ার ওপর ওদের আস্থা নেই। উপন্যাসটির অনুবাদ করেছেন ঢাকা কলেজের ইংরেজি ভাষার অধ্যাপিকা রহিমা খাতুন। খুব সুন্দর অনুবাদ। পাঠও খুব চমৎকার হলো। এত ভালো হবে আমি নিজেও ভাবিনি। আমি অবশ্যি সব সময়ই নিজের লেখার ভক্ত। আজ যেন আরো ভালো লাগছে।

সিকাট তার একটি এক অঙ্কের নাটক অভিনয় করে দেখালেন। একটিই চরিত্র। কুড়ি মিনিটের অভিনয়। মূল নাটক টেগালোগ ভাষায় লেখা– অভিনীত হলো ইংরেজি ভাষায়। সবাই খুব আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে দেখলেন। পলিটিক্যাল নাটক। লেখা হয়েছে মার্কোসের সময়কে বিদ্রূপ করে।

সিকাট অভিনয় শেষে মার্কোসের আমলের নৃশংসতার একটি গল্পও বললেন– ফিলিপাইনে একবার একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান হবে। বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা। মার্কোস হুকুম দিলেন নতুন একটি ভবন তৈরি করতে হবে এবং তা করতে হবে এক মাসের মধ্যে। ভবন তৈরি শুরু হলো– দিনরাত কাজ হচ্ছে। এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ছাদ ধসে পড়ল। পঞ্চাশ জনের মতো শ্রমিক আটকা পড়ে গেল। বেশিরভাগই মারা গেল তবে কিছু আহত হয়েও ভেতরে রইল। ওদের উদ্ধার

www.MurchOna.com

করতে হলে আরো দিন সাতেক লাগবে। অথচ হাতে সময় নেই। মার্কোস হুকুম দিলেন উদ্ধারের দরকার নেই। যথাসময় কাজ শেষ হওয়া চাই। হলোও তাই।

শিউরে উঠতে হয় গল্প শুনে। আমরা কোথায় আছি? কোন জগতে বাস করছি? এই কি আমাদের সভ্যতা? আমরা মধ্যযুগীয় নৃশংসতার কথা বলি– এই যুগের নৃশংসতা কি মধ্যযুগের চেয়ে কিছু কম? মনে তো হয় না।

পার্টি পুরোদমে চলছে। বার্বিকিউ হচ্ছে, বিয়ার খাওয়া হচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশের লেখকই কি পানীয়ের প্রতি বিশেষ মমতা পোষণ করেন? অবস্থাদৃষ্টে তাই মনে হচ্ছে। ব্রাজিলের লেখক রেইমুন্ডু ক্যারেরো পুরো মাতাল হয়ে পড়েছেন বলে মনে হলো। আবোলতাবোল বকছেন এবং লাফালাফি করছেন। খানিকক্ষণ পর পর আমার দিকে তাকিয়ে হুংকার দিচ্ছেন– Bangladesh! Bangladesh! প্যালেস্টাইনের মহিলা কবিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। সেই বেচারির পুরো ব্যাপারটি হেসে উড়িয়ে দেয়া ছাড়া কিছু করার রইল না। অন্য মহিলারাও খানিকটা শংকিত বোধ করছেন।

ভারতীয় কবি গগন গিল আমার কাছে এগিয়ে এসে শুকনো গলায় বললেন, হুমায়ূন খুব বিপদে পড়েছি।

"কি বিপদ?"

"ঐ চেক কবি আমাকে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে। কি করব বুঝতে পারছি না।'

"কি ঝামেলায় ফেলেছে?"

"ও বলছে তোমার ড্রেস অসম্ভব সুন্দর। আমাকে তুমি এরকম একটা ড্রেস পরিয়ে দাও। ঐ ড্রেস পরে আমি পরবর্তী পার্টিতে যাব। আমি তাকে বলেছি এই ড্রেসটার নাম শাড়ি, এটা মেয়েদের পোষাক। তুমি পুরুষ মানুষ। তোমার জন্যে নয়। সে মানছে না। সে বলছে– তোমরা মেয়েরা তো আমাদের শার্ট-প্যান্ট পরছ। আমরা তোমাদের একটা ড্রেস পরলে অসুবিধা কি? তা ছাড়া পুরুষ-রমণীর কোনো ভেদাভেদ আমার কাছে নেই।'

"এই অবস্থা হলে ওকে একটা শাড়ি পরিয়ে ছেড়ে দাও। প্রচুর ছবি তুলে দেশে নিয়ে যাও। ছবি দেখে সবাই মজা পাবে।"

"তুমি কি সত্যি তাই করতে বলছ?"

"হ্যাঁ বলছি।"

আমি নিজে কখনো মনে করি না একজন লেখক অন্য দশজনের চেয়ে আলাদা কিছু। কোনো লেখকই হয়তো তা মনে করেন না তবে নিজেদের

www.MurchOna.com

খানিকটা আলাদা করে দেখানোর ইচ্ছা তাদের থাকে না তাও বোধ হয় সত্যি না। সচেতনভাবে না হলেও অবচেতন একটি বাসনা বোধ হয় থেকেই যায়। নিজেকে আলাদা করে দেখানোর এই প্রবণতাটি প্রকাশ পায় লম্বা চুলে, লম্বা দাড়িতে কিংবা বিচিত্র পোশাক-আশাকে। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাধর মানুষকেও আলখাল্লা বানিয়ে পরতে হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে আর্জেন্টিনার লেখক এনরিখে বুটির কথা বলি। চমৎকার মানুষ। মাথা ভর্তি ঘনকালো চুল। হঠাৎ এক সকালে দেখি পুরো মাথা কামিয়ে বসে আছেন। কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করতেই বললেন, কিছু করার ছিল না। ঘরে বসে বোর হচ্ছিলাম। কাজেই মাথাটা কামিয়ে ফেললাম।

দেখলাম তিনি মাথা পেতে বসে আছেন, অন্য লেখকরা কামানো মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন। এনরিখে বুটি বিমলানন্দে হাসছেন। পুরো ব্যাপারটায় মনে হলো তিনি খুব মজা পাচ্ছেন।

রাতে মে ফ্লাওয়ারের হল ঘরে আমার লেখা ধারাবাহিক টিভি নাটক অয়োময়ের একটি পর্ব। (চতুর্থ পর্ব, এই পাগলকে নৌকায় করে গ্রামের বাইরে ফেলে দিয়ে আসা হয়) দেখানো হলো। প্রজেকশন টিভির মাধ্যমে বড় পর্দায় সিনেমার মতো করে দেখা। সাব টাইটেল নেই, কাহিনী বোঝা খুব মুশকিল। অবশ্যি এটা বক্তৃতা এবং লিখিতভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে আগেই বলে দেয়া হয়েছে তবু মনে হলো অধিকাংশ দর্শক বেশ কনফিউজড। অনেকেই দুটি বৌ নিয়ে অবাক। দু'জন বৌ কি করে থাকে? পাগলকে চিকিৎসা না করে গ্রামের বাইরে ফেলে দিয়ে আসার ব্যাপার কি সত্যি ঘটে?

কিছু আমেরিকান ছাত্র– যারা লেখক নয় তবে ক্রিয়েটিভ রাইটিং-এর ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স নিচ্ছে কি করে লেখক হওয়া যায়– তারা অয়োময়ে মির্জার দুই বৌ নিয়ে আমাকে কঠিন আক্রমণ করল। তাদের ধারণা এটা এসেছে মুসলিম কালচার থেকে। ইসলাম ধর্মে চার বিয়ের বিধান– কাজেই এই ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ে বহু বিবাহ ঢুকে পড়েছে। উঠে এসেছে তাদের সাহিত্যে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললাম– আমার তো মনে হয় প্রকৃতিই বহু বিবাহ সমর্থন করে। তাকিয়ে দেখো জীব জগতের দিকে একটি পুরুষ নেকড়ে অনেক ক'টি মেয়ে নেকড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বন্য মহিষ, বাইসন, সিংহ, শেয়াল সবার বেলায় এই নিয়ম। মানুষ তো এক অর্থে পশু, তার বেলাতেই হবে না কেন? প্রকৃতি এটা চায় বলেই মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি। কূট তর্কে হারিয়ে দিলাম ঠিকই কিন্তু আমি তো

www.MurchOna.com

জানি তর্কে ফাঁক আছে। জীবজগতে অনেক প্রাণী আছে যাদের বেলায় উল্টো নিয়ম– একটি মেয়ে প্রাণীর পেছনে থাকে এক ঝাঁক পুরুষ, যেমন রানী মৌমাছি।

তর্কে জেতার আনন্দ আছে তবু মনটা একটু খারাপ হলো কারণ অয়োময়ে বহু বিবাহকে সহজ এবং স্বাভাবিক নিয়মে উপস্থিত করা হয়েছে। তার জটিলতাকে তুলে ধরা হয় নি। এই নাটক দেখলে যে কোনো পুরুষ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতে পারেন– দুটি বৌ থাকা তো মন্দ না।

একজন আধুনিক মানুষ হিসেবে এই জাতীয় ধারণাকে আমি অবশ্যই প্রশ্রয় দিতে পারি না।

আমেরিকানরা খুব জরিপের ভক্ত।

সব কিছুরই জরিপ হয়ে যাচ্ছে। জরিপ চালাচ্ছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। টাকার বিনিময়ে তারা জরিপ করে দেবে। হেন বিষয় নেই যার ওপরে তারা জরিপ করে নি। প্রেসিডেন্ট বুশ এই কাজটি করেছেন এতে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ল না কমল? কতটুক বাড়ল বা কতটুক কমল? হয়ে গেল জরিপ। কিছু মজার জরিপের উদাহরণ দিচ্ছি।

ক) শতকরা ৪ ভাগ আমেরিকান মহিলা প্যান্টি পরে না।[১]

খ) শতকরা ৪ ভাগ আমেরিকান মহিলার কোনো ব্রা নেই।[২]

গ) শতকরা ৫ ভাগ আমেরিকান রাতে একা বাড়িতে থাকতে ভয় পায়।[৩]

ঘ) শতকরা ৬ ভাগ আমেরিকান মহিলা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঘুমুতে যান।[৪]

ঙ) শতকরা ১৬ ভাগ আমেরিকান মনে করে ফুসফুস হচ্ছে পরিপাক যন্ত্র।[৫]

চ) শতকরা ২৫ ভাগ আমেরিকান মনে করে সূর্য হচ্ছে একটি গ্রহ।[৬]

ছ) শতকরা ৮৩ ভাগ আমেরিকান মনে করে বাচ্চাদের শক্ত মার দিয়ে মাঝে মাঝে শাসন করা উচিত।[৭]

১·২. [এই দু'টি জরীপ করেছেন Fair child সংস্থা। "The costomer speaks about her werdrobe" Fair child publication, 1978]

৩. [Public opinion February/March, 1986]

৪. [The Harper index, 1987]

৫. [A national survey of public peraptions of Digestive health anol Diseaes. National Digeotive disease education program, 1984]

৬. [Contemporary cosmological Beliefs social studeies of scieva, 1987]

৭. [General social sarveys, 1972-1987, University of Chicago.]

সবার ধারণা আমেরিকানরা খুব বকবক করে। এই ধারণা হয়েছে আমেরিকান ট্যুরিস্টদের দেখে। ট্যুরিস্টরা সত্যি সত্যি বকবক করে। এরা বাড়ি থেকে বের হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে 'ফান' করার জন্যে। এই বকবকানি সম্ভব ফানের অংশ। ওদের নিজ ভূমিতে ওরা মুখবন্ধ জাতি। অন্তত আমার তাই মনে হয়। অপ্রয়োজনের কোনো কথা বলবে না। বেশির ভাগ কথাবার্তাই 'আজকের আবহাওয়া অসাধারণ'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তর্ক করতে এরা তেমন পছন্দ করে না। কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার সময় হঠাৎ যদি ওরা কথা বন্ধ করে দেয় তাহলে বুঝতে হবে ওরা এই মত সমর্থন করছে না।

ওরা নিতান্ত আপনজনের কাছেও খুলে কিছু বলে না বলেই আমার ধারণা। একা একা থাকতে হবে। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ করতে হবে। যৌথ বলে কিছু নেই। ব্যক্তিসত্তা নামক সোনার হরিণ খুঁজতে খুঁজতে এক সময় ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার শিকার এদের হতে হয়। দেখা দেয় মানসিক সমস্যা। ছুটে যায় কাউন্সিলারদের কাছে। কাউন্সিলার হচ্ছে সাইকিয়াট্রিস্ট। কাউন্সিলার কি করেন? তেমন কিছুই করেন না। মন দিয়ে রুগীর কথা শুনেন এবং মোটা অংকের টাকা নেন। এতেই রুগীর রোগ সেরে যায়। কথা বলতে হয় টাকা দিয়ে। সাইকিয়াট্রিস্টদের ব্যবসা এই দেশে রমরমা। যতই দিন যাচ্ছে ব্যবসা বাড়ছে। সবারই সমস্যা।

সমস্যা হবে নাইবাকেন?

আমাদের গোপন কথা বা দুঃখের কথা বলার কত অসংখ্য মানুষ আছে। মা-বাবা আছেন, খালা-খালু আছেন, চাচা-চাচি আছেন। বন্ধুবান্ধবরা তো আছেই। ওদের তো এসব কিছু নেই। নিজের বাড়িতেই এদের শিকড় নেই আর খালার বাড়ি।

আমাদের একটি টিনএজার ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে আমরা তেমন মাথা ঘামাই না। কারণ আমরা জানি সে কোথায় গেছে– মামার বাড়ি গেছে আর যাবে কোথায়? আসুক ফিরে তারপর ধোলাই দেয়া হবে।

ধোলাই দেয়া হয় না। কারণ ঐ ছেলে বাড়িতে একা ফিরে না, বড় মামাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে। যাতে শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে।

ছেলের মামা গম্ভীর গলায় বলেন, ছেলে মানুষ একটা অপরাধ করে ফেলেছে, বাদ দিন দুলাভাই।

ছেলের বাবা হুংকার দিয়ে ওঠেন, না না এইসব বলবে না, এই হারামজাদাকে আজকে আমি খুন করে ফেলব। কত বড় সাহস বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

"আহা থাক না– ছেলেমানুষ।"

www.MurchOna.com

"ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ বলবে না পনেরো বছরের ধাড়ি কুলাঙ্গার।" বলতে বলতে বাবা রাগ সামলাতে না পেরে ছেলের গালে চড় বসিয়ে দিলেন। ছুটে এলেন ছেলের মা, ছুটে এলো বোনেরা। ভাইকে আগলে ধরল। ইতিমধ্যে খবর পৌঁছে গেছে। আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী জড় হচ্ছে। বিরাট কেতলিতে চা বসানো হয়েছে। বাবাকে দেখা যাচ্ছে অসময়ে কোট গায়ে দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছেন।

মা বললেন, "এই অবেলায় কোথায় যাচ্ছ?"

বাবা জবাব দিলেন না কারণ তিনি যাচ্ছেন নিউ মার্কেট। পাবদা মাছ কিনতে। টমেটো দিয়ে পাবদা মাছ তাঁর ছেলের বড়ই পছন্দ।

এ ধরনের মানবিক দৃশ্য কি এখানে কল্পনা করা যায়?

কখনোই না। এখানে অসংখ্য ছেলে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে যায়। ন'বছর দশ বছর বয়স–অভিমানী শিশু। যাবে কোথায়? যাবার জায়গা নেই। কোনো পার্কে, কোনো শপিং মলের কোনে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে থাকে। পথচারীরা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। জিজ্ঞেস করলেও লাভ নেই– ক্রন্দনরত শিশু অপরিচিত কাউকে কিছুই বলবে না। কারণ অতি অল্প বয়সেই তাকে শেখানো হয়েছে– Never talk to strangers অপরিচিত কারো সঙ্গে কথা বলবে না।

এক সময় পুলিশ আসে। অভিমানী শিশুকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। বাড়িতে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়তো নিশ্চয়ই খুব সুখের নয়। অথচ শিশুদের জন্যে আইন-কানুন খুবই কড়া। শিশুদের মারধর করলে চাইল্ড এবিউজ আইনে বাবা-মা'র জেল-জরিমানা দুইই হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে চাইল্ড এবিউজ মামলার একটি গল্প বলি। ঘটনার স্থান– ওয়াশিংটনের সিয়াটল। একটি ভারতীয় পরিবার। তাদের সর্ব কনিষ্ঠ শিশুটি খাট থেকে পড়ে হাত ভেঙে ফেলেছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তাররা প্লাস্টার করে দিলেন।

কিছুদিন পর আবার বাচ্চাটিকে হাসপাতালে আনা হলো– সে গরম পাতিলে হাত দিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে। চিকিৎসা করে সুস্থ করা হলো।

কিছুদিন পর আবার সমস্যা। শিশুটি দোতলার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে পা ভেঙে ফেলেছে।

ডাক্তাররা চিকিৎসা করে পা ঠিক করলেন কিন্তু বাচ্চাটিকে বাবা-মা'র কাছে ফেরত দিলেন না। বললেন, তোমরা শিশু মানুষ করার জন্যে উপযুক্ত নও। একে পালক দিয়ে দেয়া হবে।

www.MurchOna.com

ফোস্টার প্যারেন্টস (পালক বাবা-মা) একে মানুষ করবে। সরকার থেকে মামলা দায়ের করা হলো।

এখানে আমি প্রায়ই গাড়ি দেখি যার পেছনে স্টিকার "তুমি কি তোমার শিশুকে আজ জড়িয়ে ধরেছ?"

এই স্টিকারের তেমন কিছু মূল্য আছে কি?

আমেরিকায় শিশু জন্ম হার আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে।

বাবা-মা'রা শিশু মানুষ করার কঠিন দায়িত্বে যেতে চাচ্ছেন না। শিশু মানুষ হয় পরিবারে সেই পরিবারই ভেঙে পড়ছে– কে নেবে শিশুর যন্ত্রণা? জীবনকে উপভোগ করতে হবে। আনন্দ খুঁজে বেড়াতে হবে। শিশু মানেই বন্ধন।

বিয়ে এখনকার তরুণ সমাজে খুব আকর্ষণীয় কিছু নয়। কারণ সেখানেও বন্ধন। একটি মাত্র তরুণীর সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দিতে হবে– কি ভয়ংকর। তারচে' অনেক ভালো লিভিং টুগেদার। একটি এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে পছন্দের তরুণ তরুণীরা একত্রে বসবাস। যদি কোনো কারণে বনিবনা না হয় জিনিসপত্র ভাগাভাগি করে সরে পড়ো দু'দিকে। সাধু ভাষায় বলা চলে– "গেল ফুরাইল। মোকদ্দমা হইল ডিসমিস।" এখানে সবাই দ্রুত মামলা ডিসমিস করতে চায়। মামলা বাঁচিয়ে রাখতে চায় না।

আজ হ্যালোইন।

হ্যালোইন এদের একটি চমৎকার উৎসব। উৎসবের উৎপত্তি কোথায় জানি না।

কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছি কিছু বলতে পারেনি। আমেরিকানদের সাধারণ জ্ঞান সীমাবদ্ধ। খুবই সীমাবদ্ধ। হ্যালোইন ব্যাপারটি কি জিজ্ঞেস করা মাত্র অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলে– ও হ্যালোইন হচ্ছে ফান নাইট। খুব ফান হয়। বাচ্চারা নানা রকম ভূতের মুখোশ পরে বের হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে– 'Treat or tricks' তখন ওদের চকলেট-লজেন্স এইসব দিতে হয়। বাড়ি সাজাতে হয়– কুমড়ো দিয়ে।

এর সবই জানি, আমার প্রশ্ন ছিল এই উৎসবটা শুরু হলো কিভাবে? হঠাৎ আমেরিকানদের কেন মনে হলো ভূতপ্রেতের জন্যে একটা রাত থাকবে? কেউ জানে না।

বইপত্র ঘেঁটে দেখলাম অক্টোবরের ৩১ তারিখে সন্ধ্যায় এই দিবস উদযাপন

www.MurchOna.com

করা হয়। এটি একটি ধর্মীয় উৎসব, All saint's day (Allhallows)-র পূর্ব দিবস। সব সিরিয়াস বিষয় নিয়ে রসিকতা করা আমেরিকানদের মজ্জাগত। এই দিনটিকে ওরা রসিকতার দিন করে নিয়েছে। সেই রঙ্গ-রসিকতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার উদাহরণ দেয়া যাক– হ্যালোইনের ফান পরিপূর্ণ করার জন্যে নিউইয়র্কে প্রতি বছর কিছু দরিদ্র মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। কিছু বাড়িঘরে আগুন দেয়া হয়। এই হলো ফানের নমুনা।

আমাদের বাড়িতে বাচ্চাকাচ্চারা ভূত সেজে আসবে তা মনে হয়নি তবু কিছু চকলেট কিনে রেখে দিলাম। যদি আসে?

না আসারই কথা। বাড়ির উঠোনে কোনো কুমড়ো সাজানো নেই। এর মানে এই বাড়িতে এমন কেউ থাকে যে হ্যালোইন সম্পর্কে জানে না।

তবু দেখি দুটি ছোট ছোট বাচ্চা এসে উপস্থিত। একজন সেজেছে কচ্ছপ অন্য একজন ডাইনী বুড়ি। প্রত্যেকের হাতে চকলেট সংগ্রহের জন্যে তিনটি ব্যাগ। ব্যাগের রং লাল, সাদা এবং সবুজ। ওরা গম্ভীর মুখে বলল– Treat or tricks আমি চকলেট দিলাম। ওরা দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। ছোট জন বলল, কোন রঙের ব্যাগে নিব, সাদাটায়? বড় জন বলল, না লালটায়। জিজ্ঞেস করে জানলাম– সবুজ রঙের ব্যাগে ওরা নেয় পরিচিত মানুষদের দেয়া চকলেট। যাদের খুব ভালো করে চেনে। যাদের অল্প চেনে তাদের চকলেট সাদা রঙের ব্যাগে। যারা একেবারেই অপরিচিত তাদেরগুলি থাকবে লাল রঙের ব্যাগে। এই ব্যাগের চকলেট খাওয়া যাবে না। বাবা-মা'রা প্রথম পরীক্ষা করে দেখবেন। পরীক্ষার পর যদি বলেন– "খাও।" তাহলেই খাওয়া। অধিকাংশ সময়ই খেতে দেন না। ডাস্টবিনে উপুড় করে ফেলে দেন।

এই সাবধানতার কারণ– আমেরিকা হলো বিচিত্র এবং ভয়ংকর মানসিকতার লোকজনদের বাস। সাধারণ মানুষদের মধ্যে লুকিয়ে আছে পিশাচ শ্রেণীর কিছু মানুষ। পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে ভাবছেন পিশাচ শ্রেণীর লোকজন শুধু আমেরিকায় থাকবে কেন? সব দেশেই আছে। ভয়াবহ ক্রাইম তো বাংলাদেশেও হয়। ঐ তো 'বিরজাবালা' পরিবারকে হত্যা করা হলো। যে মানুষটি করল সে কি পিশাচ নয়?

অবশ্যই পিশাচ।

তবে এখানে যেসব কাণ্ডকারখানা হয় তা সব রকম ব্যাখ্যার অতীত। পিশাচরাও এসে লজ্জা পেয়ে যায়।

সম্প্রতি নিউইয়র্কে ঘটে গেছে এমন একটি ঘটনা বলি। ৯১১ নাম্বারে একটি

www.MurchOna.com

টেলিফোন এলো। এটি পুলিশের নাম্বার। এই নাম্বারে টেলিফোন পেলেই পুলিশ সচকিত হয়ে ওঠে। এক ভদ্রলোক কাঁদতে কাঁদতে টেলিফোন করেছেন। তার শিশু বাচ্চাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দোলনায় ঘুমুচ্ছিল– হঠাৎ দেখা গেল সে নেই।

পুলিশ বলল, "তোমার স্ত্রী কোথায়?"

"এইখানেই আছে।"

"তোমরা কি সারাক্ষণ ঘরেই ছিলে?"

"হ্যাঁ ঘরেই ছিলাম। আমি টিভিতে বেইসবল দেখছিলাম। আমার স্ত্রী রান্নাঘরে রান্না করছিল। এক সময় শোবার ঘরে গিয়ে দেখে বাচ্চা নেই।"

"ঘরে আর কেউ ছিল না?"

"না। তবে..."

"তবে কি?"

"আমাদের একটা বিশাল জার্মান শেফার্ড কুকুর আছে। আমার ধারণা..."

"থামলে কেন বলো..."

"আমার ধারণা কুকুরটা বাচ্চাটাকে খেয়ে ফেলেছে।"

"কি বলছ তুমি?"

পুলিশ তৎক্ষণাৎ ছুটে এলো। এক্সরে করে দেখা গেল সত্যিই কুকুরটির পেটে বাচ্চাটির হাড়গোড় দেখা যাচ্ছে। কুকুরকে মেরে তার পেট কেটে হাড়গোড় বের করা হলো। সেই সব পাঠানো হলো পোস্ট মর্টেমের জন্যে।

পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে বলা হলো– হ্যাঁ কুকুর বাচ্চাটিকে খেয়ে ফেলেছে। তবে কামড়ে কামড়ে খায়নি। বাচ্চাটিকে ধারালো ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে কুকুরটিকে খাওয়ানো হয়েছে।

বাচ্চাটির বাবা তখন অপরাধ স্বীকার করল।

সে বলল– বাচ্চাটি কেঁদে কেঁদে খুব বিরক্ত করছিল। কাজেই সে রাগ করে আছাড় দিয়েছে। এতে বাচ্চাটি মরে গেছে। তখন পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে কুচি কুচি করে কেটে কুকুর দিয়ে খাইয়ে ফেলেছে।

বাংলাদেশের পাঠক, পাঠিকা, এমন মানুষ কি আছে আমাদের দেশে?

আরো একটি ঘটনা বলি, এটিও নিউইয়র্কের। একত্রিশ বছর বয়েসি একটি মেয়ে। বাবার সঙ্গে থাকে। কি কারণে বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া হলো। বাবা তাকে খুন করে ফেলল। এখানেই ঘটনার শেষ না– ঘটনার শুরু। খুন করার পর সে তার মেয়েকে কেটেকুটে রান্না করে ফেলল। পুলিশ যখন তাকে এসে ধরল তখন সে রান্না করা মেয়েকে খেয়ে প্রায় শেষ করে এনেছে।

www.MurchOna.com

এইসব ভয়ংকর অপরাধীদের বিচার কী এদেশে হয় না? অবশ্যই হয়। তবে মৃত্যুদণ্ড প্রায় কখনোই হয় না। সভ্যদেশে মৃত্যুদণ্ড অমানবিক। আমেরিকার অল্প কিছু স্টেট ছাড়া সব স্টেটেই মৃত্যুদণ্ড নেই। সাধারণত জেল হয়। বেশিদিন জেল খাটতেও হয় না। পাঁচ বছর জেল খাটার পর প্যারোলে মুক্তি।

খুনিরা প্যারোলে মুক্তি পেয়ে জেলের বাইরে এসেই আবার খুন করে। ভয়ংকর সব খুনিরা এই দেশে প্রায় 'ন্যাশনাল হিরো'। একজন খুনি তের কি চৌদ্দটা মেয়েকে খুন করে নিজের বাড়ির বেইসমেন্টে পুঁতে রেখেছিল। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া মাত্র হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। নাগরিকরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল বের করল। বর্বর মৃত্যুদণ্ড দেয়া চলবে না। মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল কর-ইত্যাদি। একটি সুন্দরী মেয়ে এই খুনির প্রেমে পড়ে গেল। তাদের বিয়েও হয়ে গেল। ন্যাশনাল টিভি খুনির নানান ধরনের ইন্টারভ্যু প্রচার করল। কি বলব এদের?

এরাই যখন আমাদের দেশ নিয়ে নাক সিটকে কথা বলে তখন রাগে গা জ্বলে যায়। জনি কার্সন বলে এক লোক আছে। গভীর রাতে সে টিভিতে 'টক শো' দেয়। অর্থাৎ মজার মজার কথা বলে লোক হাসায়। খুবই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এই ব্যাটা বদমাশ প্রায়ই বাংলাদেশ নিয়ে রসিকতা করে। এনবিসি টিভিতে একটা রসিকতা করল। আবর্জনা ফেলা নিয়ে রসিকতা। আবর্জনা বোঝাই একটা জাহাজ তখন দু'মাস ধরে সমুদ্রে ঘুরছে। কোনো দেশ সেই জাহাজ বোঝাই আবর্জনা রাখতে রাজি নয়। জনি কার্সন বলল, "এটা নিয়ে সবাই চিন্তিত কেন? আবর্জনা বাংলাদেশে ফেলে দিয়ে এলেই হয়। এরা খুব আগ্রহ করেই আবর্জনা রাখবে।"

রসিকতা শুনে 'টক শোতে' উপস্থিত আমেরিকানরা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। বড় মজার রসিকতা।

জনি কার্সন সাহেব, আপনি খুবই রসিক মানুষ কিন্তু দয়া করে জেনে রাখুন– আমরা আমাদের বাচ্চাদের কেটে কুচি কুচি করে কুকুরকে খাইয়ে ফেলি না। আমাদের দেশে কোনো এইডস নেই। সমকামিতা ব্যাপারটি ভয়াবহ ব্যাধি হিসেবে আমাদের দেশে উপস্থিত হয়নি। আমরা অতি দরিদ্র এই কথা সত্যি; দু'বেলা খেতে পারি না এও সত্য। অভাবের কারণে জাল-জুয়াচুরি কেউ কেউ করে, এও সত্য– তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্যি আমরা আমাদের আত্মাকে হারাই নি। আমরা দুঃখে-কষ্টে জীবনযাপন করি এবং এর মধ্যেই আত্মাকে অনুসন্ধান করি। খাঁচার ভেতর যে অচিন পাখি আসা-যাওয়া করে সেই পাখিটাকে বোঝার চেষ্টা করি। বিশ্বাস করুন কার্সন সাহেব আমরা করি।

www.MurchOna.com

আমাদের গাড়ির ড্রাইভার এলেকসি– ১৯/২০ বছরের যুবক। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই বয়সে আমেরিকান যুবকরা দৈত্যের মতো বিশাল হয়। এলেকসি সে রকম নয়– শিশু শিশু চেহারা, রোগা-পাতলা। লক্ষ্য করলাম তার বাঁ কানে দুল। বাঁ কান ফুটা করে দুল পরার ব্যাপারটি এই বয়েসি আরো অনেক যুবকদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। নতুন কোনো ফ্যাশান কি? ফ্যাশানের ব্যাপারটি সাধারণত মেয়েদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়– এবার দেখি ছেলেদেরও ধরেছে। সব ফ্যাশানের 'শানে নজুল' আছে। বাঁ কানে দুল পরার ফ্যাশানের শানে নজুল কি? কয়েকজন আমেরিকানকে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলতে পারল না। বলতে না পারারই কথা। আমেরিকানদের জিজ্ঞেস করা আর গাছকে জিজ্ঞেস করা একই ব্যাপার। এরা কিছুই জানে না। জানার ব্যাপারে তেমন আগ্রহও নেই।

একজন বলল, কানে দুল পরা এসেছে মিডিল ইস্ট থেকে। মিডিল ইস্ট-এর যাযাবররা কানে দুল পরে।

অন্য একজন বলল, খুব সম্ভব এটা এসেছে রক স্টারদের কাছ থেকে। কোনো একজন রকস্টার হয়তো কানে দুল পরে শো করেছিল এই থেকে চালু হয়ে গেছে। তুমি তো জানোই রকস্টার হচ্ছে আমেরিকান যুবকদের সবচে' বড় আইডল।

তৃতীয় একজন গলার স্বর নিচে নামিয়ে বলল, ওরা হমোসেকচুয়েল। বাঁ কানে দুল হচ্ছে ওদের চিহ্ন। এই দেখে একজন অন্যজনকে চেনে।

এদের কারো কথাই বিশ্বাস হলো না। সরাসরি এলেকসিকে জিজ্ঞেস করলাম। সে হাসি মুখে বলল, "তোমার কি কানে দুল পরা পছন্দ নয়? আমাকে কি ভালো দেখাচ্ছে না?"

"খুবই ভালো দেখাচ্ছে। দুটি কানে পরলে আরো ভালো লাগত। একটি কানে পরায় সিমেট্রি নষ্ট হয়েছে।"

"দু'কানে পরা নিয়ম নয়।"

"নিয়মটা এসেছে কোত্থেকে?"

"জানি না।"

কথা এর বেশি এগুল না। কে জানে সমকামিতার সঙ্গে বাঁ কানে দুল পরার কোনো সম্পর্ক আছে কি-না। থাকতেও পারে।

আমেরিকান সমাজের যে ক'টি ভয়াবহ সমস্যা আছে। সমকামিতা তার একটি। এইডস নামক ভয়াবহ ব্যাধি যার ফসল।

পনেরো বছর আগে লাস ভেগাসে লেবারেচি নামের একজন প্রবাদ পুরুষের

www.MurchOna.com

একটি শো দেখেছিলাম। ভদ্রলোক হাতের দশ আঙুলে দশটি হীরার আংটি পরে স্টেজে এলেন। কোন আংটি কে তাকে উপহার দিয়েছেন তা বললেন। [একটি ইরানের শাহ, একটি ইংল্যান্ডের রানী-] তারপর নানান রসিতার ফাঁকে ফাঁকে পিয়ানো বাজিয়ে শুনালেন। দু'ঘটার অনুষ্ঠান- দু'ঘণ্টা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন। অনুষ্ঠান শেষে তাঁকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেয়া হলো। সমস্ত দর্শক দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন। আমিও তাদের একজন।

এবার এসে শুনি প্রবাদ পুরুষ লেবারেচি এইডসে মারা গেছেন। ভদ্রলোক ছিলেন সমকামী।

আমি থাকতে থাকতেই বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপিত হলো। মিউজিয়ামের পেইন্টিং কাগজ দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। ভাস্কর্য মুড়ে দেয়া হলো কাপড়ে। কারণ এইডস নামক ভয়াবহ ব্যধির প্রধান শিকার- শিল্পী, গায়ক, কবি-সাহিত্যিকরা। সমকামিতার ব্যাপারটি নাকি তাদের মধ্যেই বেশি। ক্রিয়েটিভিটির সঙ্গে যৌন বিকারের কোনো যোগ কি সত্যি আছে?

এই বিষয় নিয়ে লিখতে ভালো লাগছে না। লেখার মতো চমৎকার কোনো বিষয়ও পাচ্ছি না। এখানকার প্রোগ্রামের একটি দিক হচ্ছে- আইওয়াতে যেসব লেখা হয়েছে তার অংশ বিশেষ পাঠ। কিছুই লিখতে না পারার কারণে পাঠ করার মতো কোনো অংশই আমার কাছে নেই। আমি সম্ভবত একমাত্র লেখক যে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

বিকেলে জামা-কাপড় পরে বের হলাম। পরিকল্পনা করে নিলাম উদ্দেশ্যহীন হাঁটা হাঁটব। পুরোপুরি ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত থামব না। সঙ্গে ম্যাপ থাকবে যাতে হারিয়ে না যাই। ক্যামেরা সঙ্গে নিতে গিয়েও নিলাম না। ক্যামেরা থাকে ট্যুরিস্টদের হাতে। সুন্দর কোনো দৃশ্য দেখলেই চোখের সামনে ক্যামেরা তুলে ধরে। ছবি তোলা মাত্রই তার কাছে দৃশ্যটির আবেদন শেষ হয়ে যায়। যার হাতে ক্যামেরা থাকে না সে জানে- এই অপূর্ব দৃশ্য সে ধরে রাখতে পারবে না। সে প্রাণভরে দেখার চেষ্টা করে। আমিও তাই করব। প্রাণ ভরে দেখব।

ঘণ্টা খানিক হাঁটার পর মনে হলো শহরের বাইরে চলে এসেছি। একটি বাড়ি থেকে অন্য একটি বাড়ির দূরত্ব খানিকটা বেড়েছে। গাছপালাও মনে হলো বেশি। আবহাওয়াও চমৎকার। শীত সহনীয়। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য ডোবার আগের মায়াবী আলো পড়েছে মেপল গাছের পাতায়। আরো খানিকটা এগিয়েই অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালাম। সামনে সেইন্ট জোসেফ সিমেটিয়ারি। খ্রিস্টান কবরস্থান। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে নির্জন কবরখানা। ছোট ছোট নামফলক। বিস্ময়ে অভিভূত হবার কারণ হলো- প্রতিটি নামফলকের সঙ্গে একগুচ্ছ টাটকা ফুল।

www.MurchOna.com

ফুলে ফুলে পুরো জায়গাটা ঢেকে দেয়া হয়েছে। কত রকমারি ফুল, গোলাপ, টিউলিপ, কসমস, চন্দ্রমল্লিকা, মেরি গোল্ড। দিনের শেষের আলো ফুলগুলিকে শেষবারের মতো ছুঁয়ে যাচ্ছে। এমন সুন্দর দৃশ্য অনেক দিন দেখি নি। হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হলো। আজ আর অন্য কিছু দেখার প্রয়োজন নেই। কিছু সময় কাটিয়ে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। ফিরে যেতেও ইচ্ছা করছে না।

ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা মিলিয়ে গেল।

বাড়ির সামনে কালো কোট গায়ে কে যেন দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবু কেন জানি চেনা চেনা লাগছে। আমি আরো কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। ছায়ামূর্তি কোমল গলায় বলল, কেমন আছ?

এ কি কাণ্ড– গুলতেকিন দাঁড়িয়ে আছে।

এটা কি স্বপ্ন? চোখের ভুল? কোনো বড় ধরনের ভ্রান্তি!

"কি কথা বলছ না কেন? কেমন আছ?"

"তুমি এইখানে কি ভাবে?"

"আগে বলো তুমি কি আমাকে দেখে খুশি হয়েছ?"

"ব্যাপারটা সত্যি না স্বপ্ন এখনো বুঝতে পারছি না।"

"অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। শীতে জমে যাচ্ছি। দরজা খোলো। কোথায় গিয়েছিলে?"

আমি জীবনে অনেকবার বড় ধরনের বিস্ময়কর ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি– কিন্তু এ ধরনের বিস্ময়ের মুকাবিলা করি নি। আমি তৃতীয়বারের মতো বললাম, "এখানে কি করে এলে?"

জানা গেল সে আমাকে অবাক করে দেবার জন্যে এই কাণ্ড করেছে এবং তার জন্যে তাকে খুব বেগ পেতে হয় নি। আমেরিকায় আসবার জন্যে ভিসা চাইতেই ভিসা পেয়েছে। তার নিজস্ব কিছু ফিক্সড ডিপোজিট ছিল, সব ভাংগিয়ে টিকিট কেটে চলে এসেছে। কে বলে মেয়েরা 'অবলা'?

বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে অনেক সময় লাগল। গুলতেকিনকে অপরিচিত তরুণীর মতো লাগছে। তার হাত ধরতেও সংকোচ লাগছে। মনে হচ্ছে হাত ধরলেই সে কঠিন গলায় বলবে, একি আপনি আমার হাত ধরছেন কেন?

"বাচ্চারা কেমন আছে গুলতেকিন?"

"ভালোই আছে। তুমি কেমন আছ?"

"ভালো।"

"তুমি চিঠিতে লিখেছিলে বিশাল দোতলা বাড়িতে থাকি– এই বুঝি তোমার বিশাল দোতলা বাড়ি?"

"তোমার কাছে বিশাল মনে হচ্ছে না?"

"হ্যাঁ বিশাল। তবে তোমার চিঠি পড়ে আমি অন্য রকম কল্পনা করে রেখেছিলাম। তুমি লিখেছিলে তোমার সঙ্গে ফিলিপাইনের এক ঔপন্যাসিক থাকেন। উনি কোথায়?"

"উনি দু'দিনের জন্যে আমানা কলোনিতে গেছেন। চলে আসবেন। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করো। আমি রান্না করছি।"

"তুমি রান্না করবে?"

"হ্যাঁ তুমি এখন আমার অতিথি।"

ভাত, গোশত এবং ডাল রান্না করলাম। ভাত গলে গিয়ে জাউয়ের মতো হয়ে গেল। গোশত পুরোপুরি সিদ্ধ হলো না। ডালে লবণ বেশি হয়ে গেল। তাতে কি? সময় এবং পরিস্থিতিতে অখ্যাদ্য খাবারও অমৃতের মতো লাগে। আমি হাই ভি স্টোর থেকে এক প্যাকেট আইসক্রিম এবং দুটো মোমবাতি কিনে নিয়ে এলাম। হোক একটা ক্যান্ডল লাইট ডিনার।

"খেতে কেমন হয়েছে গুলতেকিন?"

"চমৎকার।"

আমি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললাম, "আচ্ছা গুলতেকিন আমাকে কি তোমার এই মুহূর্তে অপরিচিত কোনো যুবকের মতো লাগছে?"

গুলতেকিন বলল, "অপরিচিত যুবকের মতো লাগবে কেন? তুমি মাঝে মাঝে কি সব অদ্ভুত কথা যে বলো!"

গুলতেকিনকে ঘুরে ঘুরে দেখাব এমন কিছু আইওয়াতে নেই। বড় বড় শপিং মল অবশ্যি আছে, সে সব তো আমেরিকার সব স্টেটেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কয়েকটি চমৎকার মিউজিয়াম আছে। সেখানে যেতে ইচ্ছা করছে না। দেশের বাইরে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করি।

কিছু দেখার নেই বলে ঘরে চুপচাপ বসে থাকার অর্থ হয় না। পরদিন তাকে নিয়ে বের হলাম। সে বলল, "আমরা কি দেখতে যাচ্ছি?"

"সেইন্ট জোসেফ সিমেটিয়ারি।"

"কবরখানা?"

"হ্যাঁ কবরখানা।"

"তের হাজার মাইল দূর থেকে কবরখানা দেখতে এসেছি?"

"চলো না। তোমার ভালো লাগবে।"

"তোমার রুচির কোনো আগামাথা আমি এখনো বুঝতে পারলাম না। আশ্চর্য।'

www.MurchOna.com

"চলো আগে যাই তারপর যা বলবে শুনব। আমার ধারণা তোমার ভালো লাগবেই।"

তার ভালো লাগল। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, "দেখো দেখো প্রতিটি কবরের সামনে, ফুলের গুচ্ছ। এরা কি রোজ এসে ফুল দিয়ে যায়?"

"যায় নিশ্চয়ই। নয়তো ফুল আসবে কোত্থেকে? কিংবা হয়তো কোনো ফুলের দোকানকে বলে দিয়েছে তারা প্রতিদিন ফুল দিয়ে যাচ্ছে।"

"নিশ্চয়ই খুব খরচান্ত ব্যাপার। রোজ একগুচ্ছ ফুল।"

গুলতেকিনের এই কথায় খটকা লাগল। তাই তো– এমন খরচান্ত ব্যাপারে এরা যাবে? মৃতদের প্রতি তাদের কি এতই মমতা? বাবা-মা বুড়ো হলে যারা তাদের ফেলে দিয়ে আসে ওল্ড হোমে...। আমি এগিয়ে গেলাম এবং গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম সবই প্লাস্টিকের ফুল। খুবই সুন্দর– আসল-নকলে কোনো ভেদ নেই কিন্তু প্লাস্টিকের তৈরি। একবার এসে রেখে গেছে বছরের পর বছর অবিকৃত আছে। মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এই চমৎকার ফুলে ফুলে সাজানো কবরখানা আসলে মেকি ভালোবাসায় ভরা। এরা যখন কোনো মেয়ের সঙ্গে ডেট করতে যায় তখন হাতে এক গুচ্ছ ফুল নিয়ে যায়। সেই ফুল আসল ফুল। প্লাস্টিকের ফুল নয় কিন্তু মৃতদেহের বেলায় কেন প্লাস্টিকের ফুল? আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

পনেরো দিনের একটি ট্যুর প্রোগ্রামের শেষে লেখক সম্মেলনের ইতি। ট্যুর প্রোগ্রামটি চমৎকার। এই পনেরো দিনে লেখকরা যে যেখানে যেতে চান সেই ব্যবস্থা আমেরিকান ইনফরমেশন সার্ভিস করবে। টিকিট কেটে দেবে, আগেভাগে হোটেলের ব্যবস্থা করে রাখবে। মোটামুটি রাজকীয় ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

আমি যেসব জায়গায় যেতে চেয়েছি সেগুলি হচ্ছে সানফ্রান্সিসকো, নিউ অর্লিন্স এবং নিউইয়র্ক। সানফ্রান্সিসকো পছন্দ করার কারণ ঔপন্যাসিক স্টেইনবেক সানফ্রান্সিসকোর মানুষ। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসের পটভূমি সেলিনাস ভেলি। নিউ অর্লিন্স পছন্দ করার কারণ– সেখানকার ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার। ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারে উইলিয়াম ফকনার প্রথম উপন্যাস লেখা শুরু করেন। ও হেনরির লেখক জীবনও শুরু হয় এইখানে। টেনেসি উইলিয়মসের বিখ্যাত লেখা A street car named desire লেখা হয় নিউ অর্লিন্সের ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারে। এই ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারেই আংকেল টমস কেবিন উপন্যাসটির অকসান হয়। কাজেই অতি বিখ্যাত এই জায়গাটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

মুশকিল হলো গুলতেকিনকে নিয়ে। তার টিকিট কাটতে হবে আমাকে। সেটা কোনো সমস্যা নয়, সমস্যা হলো টিকিট পাওয়া নিয়ে। অনেক কষ্টে আইওয়া থেকে সানফ্রান্সিসকোর ট্রেনের টিকিট পাওয়া গেল। ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায়। আমেরিকানরা ট্রেনের ভক্ত নয়। সমস্যা হলো বিমানের টিকিট নিয়ে তার জন্যে বাকি টিকিট পাওয়া গেল না। ঠিক করলাম সে সানফ্রান্সিসকোয় পাঁচ দিন থেকে চলে যাবে নিউজার্সিতে ওখানকার টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। সে সেখানেই আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি আমার প্রোগ্রাম শেষ করে তার সঙ্গে যোগ দেব এবং তাকে নিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে বেড়াতে যাব।

এই পরিকল্পনা তার যে খুব পছন্দ হলো তা না কিন্তু এর বেশি তো কিছু করার নেই।

আমার ভ্রমণ পরিকল্পনা শুধু তার না অনেকেরই পছন্দ হলো না। যেই শুনে সেই বলে তুমি দু'হাজার মাইল রাস্তা যাবে ট্রেনে করে? তোমার কি মাথাটা খারাপ হলো? আমেরিকান ট্রেনের সেই রমরমা এখন নেই। এমট্রেকের নাভিশ্বাস উঠেছে। দু'দিন দু'রাত ট্রেনে থেকে বিরক্তিতেই তুমি মারা যাবে। খুবই অব্যবস্থা।

সবার কথা শুনে শুনে আমারও ধারণা হলো ভুলই বুঝি করলাম। দু'দিন দু'রাত ট্রেনে কাটানো সহজ কথা না। অথচ শুরুতে ভেবেছি চারপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাব। ট্রেনের কামরা থেকে আমেরিকার একটা বড় অংশ দেখা হয়ে যাবে। গুলতেকিন বলল, "আমেরিকান ট্রেনের জানালা খুলা যায়?"

আমি বললাম, "মনে হয় না। শীতের সময় জানালা খুলবে কি ভাবে?"

"তাহলে আমরা শুধু শুধু ট্রেনে যাচ্ছি কেন? বন্ধ জানালার ভেতর দিয়ে কি দেখব? কাচের ভেতর দিয়ে কিছু দেখতে আমার ভালো লাগে না।"

"আমারও ভালো লাগে না। কিন্তু উপায় নেই, টিকিট কাটা হয়ে গেছে।"

"দয়া করে স্বীকার করো যে আবার একটা ভুল করেছ। তোমার কি উচিত না এইসব পরিকল্পনা করার আগে দশ জনের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেয়া?"

"খুবই উচিত?"

যথা সময়ে আমরা ট্রেনে উঠলাম। গুলতেকিনের গম্ভীর মুখ ট্রেনে উঠেই পাল্টে গেল। সে পরপর তিন বার বলল– "চমৎকার!"

এ্যামট্রেক দোতলা ট্রেন। একতলায় টয়লেট, মালপত্র রাখার জায়গা। দু'তলায় বসার ব্যবস্থা। ট্রেনের দুটি বিশাল কামরা হলো অবজারভেশন ডেক। পুরো দেয়াল কাচের। ভেতরে রিভলবিং চেয়ার। এখানে বসে চারপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাওয়া যায়।

জোসনা রাত। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। আমরা দু'জন অবজারভেশন ডেকে

বসে আছি। প্রেইরি প্রান্তর ভেদ করে ট্রেন ছুটে চলছে। তিনটি ইঞ্জিন ট্রেনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গুলতেকিন বলল, "আমার মনে হচ্ছে এ জীবনে মনে রাখার মতো যা কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে– এই ট্রেন ভ্রমণ হবে তার একটি।"

আমি বললাম, "আমারো তাই ধারণা।"

সে লাজুক স্বরে বলল– "আমি লক্ষ্য করেছি মাঝে মাঝে তুমি কোনো রকম চিন্তাভাবনা না করে একটা কাণ্ড করে বসো। যার ফল আবার কি করে কি করে যেন খুব ভালো হয়ে যায়। ভাগ্যিস তুমি কারো কথা না শুনে ট্রেনের টিকিট কেটেছিলে।"

ট্রেন ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে। কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম রজনী নিঝুম। আমরা দু'জনে চুপচাপ বসে আছি। চোখের সামনে আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। মাঠের উপর ফিনিক ফোটা জোছনা।

ভোরবেলা দৃশ্যটাই বদলে গেল। ট্রেন ঢুকল রকি পর্বতমালায়। পাহাড় কেটে কেটে ট্রেন লাইন বসানো হয়েছে। কখনো ট্রেন ঢুকছে সুরঙ্গে কখনো ট্রেন গভীর গিরিপর্বত পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। পাহাড়গুলিরইবা কি শোভা। মাথায় বরফের চাদর। পাহাড়ের শরীরে পাইন গাছের চাদর।

ট্রেন লাইনের পাশে পাশেই আছে পাহাড়ি কলারাডো নদী। সে দু'শ সত্তর মাইল আমাদের পাশে পাশে রইল। কি স্বচ্ছ তার পানি। ঘন নীল আকাশের ছায়া পড়েছে তার গায়ে। পাহাড় ভেঙে নদী চলছে আপন গতিতে। আমার কেবলি মনে হতে লাগল, ইস যদি ঐ পানি ছুঁয়ে দেখতে পারতাম!

মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। একটা লাল ইটের বাড়ি দেখলাম। ছবির বাড়িও এত সুন্দর থাকে না। আকাশের মেঘ ঐ বাড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। বাড়ির উঠোনে কালো রঙের একটা ঘোড়া। লাল স্কার্ফ মাথায় জড়িয়ে বাচ্চা একটা মেয়ে দৌড়াচ্ছে। আহা তারা কি সুখেই না আছে! যদি এমন একটা বাড়ি আমার থাকত!

অন্ধকার গুহা থেকে বের হয়ে ট্রেন একবার চলে এল ফুলে ফুলে ভরা এক ভ্যালিতে– খুব পরিচিত ফুল, কাশ ফুল। চেনা ফুল অচেনা জায়গায়। কিছু নাম না জানা ফুলও আছে। কি ভালোই না লাগছে দেখতে।

I offen see flowers from a passing car
That are gone before I can tell what they are.
I want to get out of the train and go back
To see what they were beside the track...

www.MurchOna.com

Heaven gives its glimses only to those
Not in position to look too close
(Robert Frost)

সানফ্রান্সিসকোতে আমাদের থাকার জায়গা ডাউন টাউনের বড় একটা হোটেলে। হোটেল বেডফোর্ড। চায়না টাউনের পাশে আকাশ ছোঁয়া বাড়ি। ঘুরে বেড়ানোয় গুলতেকিনের খুব আগ্রহ। সে ট্যুরিস্টদের কাগজপত্র ঘেঁটে নানান জায়গা বের করছে যা আমরা দেখব।

ফিশারম্যান ওয়ারফ
গোল্ডেন গেট
মুর উডস
নাপা ভ্যালি
ক্রুকেড স্ট্রিট

ফিশারম্যান ওয়ারফ প্রথম দেখতে গেলাম। আমেরিকান জেলে পল্লী। আহামরি কিছু নয়- বাংলাদেশের সদরঘাট। অসংখ্য ছোট ছোট মাছ ধরার বোট। খাবারের দোকান-এর বেশি কিছু না। ট্যুরিস্টরা মহানন্দে তাই দেখছে এবং পটাপট ছবি তুলছে। আমি মুগ্ধ এবং বিস্মিত হবার কিছুই পাচ্ছি না। অবশ্যি দুটি সিল মাছ কিছুক্ষণ পরপর মাথা তুলে বিকট শব্দ করছে। এই দৃশ্যটি খানিকটা আকৃষ্ট করল।

একটি ছবি তোলার পর সেই দৃশ্যের আবেদনও ফুরিয়ে গেল। আমি বললাম, "গুলতেকিন হোটেলে ফিরে গেলে কেমন হয়?" সে অত্যন্ত আহত হলো বলে মনে হলো। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "হোটেলে ফিরে যাব মানে? হোটেলেই যদি বসে থাকবে তাহলে বেড়াতে আসার মানে কি?"

"আমি তো আর দেখার মতো কিছু পাচ্ছি না।"

"তুমি দেখার মতো কিছু পাচ্ছ না তাহলে হাজার হাজার ট্যুরিস্ট কি দেখছে?"

ট্যুরিস্টরা কি দেখছে সেও এক রহস্য। হাজার হাজার ট্যুরিস্ট ক্যামেরা কাঁধে মুগ্ধ চোখে ঘুরছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে বিস্ময় ও আনন্দে তারা অভিভূত। আমি অবাক হয়ে ভাবছি আনন্দ পাবার চমৎকার অভিনয় তারা কার জন্য করছে? নিজের জন্যে? কেন করছে?

গুলতেকিনকে খুশি করার জন্যে একটা ওয়াক্স মিউজিয়ামে ঢুকলাম। লন্ডনের মাদাম তুষোর ওয়াক্স মিউজিয়ামের নামডাক শুনেছি- দেখি এদেরটা কেমন। টিকিটের দাম ষোল ডলার। খুব খারাপ হবার কথা না। মাবুদে এলাহী, কিছুই

www.MurchOna.com

নেই ভেতরে। ক্লিওপেট্রা নাম দিয়ে যে মূর্তি বানিয়ে রেখেছে তাকে দেখাচ্ছে ফর্সা বাঁদরের মতো। এক জায়গায় দেখলাম প্রেসিডেন্ট বুশকে বানিয়েছে, দেখাচ্ছে কংকালের মতো। হাঁ করে আছে– মনে হচ্ছে কামড় দিতে আসছে। আমি মিউজিয়ামের একজন কর্মকর্তাকে বিনীত ভঙ্গিতে বললাম– "এটা কি প্রেসিডেন্ট বুশের কংকাল?"

সে খুব আহত হলো বলে মনে হলো না। তার মানে আমার মতো আরো অনেকেই তাকে এই প্রশ্ন করেছে।

বিকেলে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে হোটেলে ফিরলাম। গুলতেকিন বলল, "এখন কি করা যায়?" আমি বললাম, "খানিকক্ষণ ঝগড়া করলে কেমন হয়?"

"তার মানে?"

"বাসায় বাচ্চারা থাকে প্রাণখুলে ঝগড়া করা যায় না– এখানে চমৎকার নিরিবিলি। এসো দরজা বন্ধ করে প্রাণ খুলে ঝগড়া করে নেই।"

পরদিন ভোরবেলা একজন এসকর্ট এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। বিদেশী অতিথিদের নিজের সাথেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সানফ্রান্সিসকো দেখান। তাকে নাকি ওয়াশিংটন থেকে বলা হয়েছে আমাদের সঙ্গ দেবার জন্যে। বেশ উৎসাহ নিয়েই আমরা তাঁর সঙ্গে বের হলাম। তিনি বিশাল গাড়ি নিয়ে এসেছেন। বেশ হাসি-খুশি ধরনের মানুষ। সানফ্রান্সিসকোর নাড়ি-নক্ষত্র জানেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক কথা না বলে থাকতে পারেন না। অনর্গল কথা বলেন। গলার স্বরে কোনো উঠানামা নেই। কথা বলার সময় অন্যরা কি ভাবছে কি বলছে কিছুই লক্ষ করেন না। প্রথম শ্রেণীর একজন রবট। আমার মাথা ধরে গেল। এ কি যন্ত্রণা!

সবচে' বিরক্তিকর ব্যাপার হলো ভদ্রলোক এমন ভঙ্গিতে কথা বলছেন যেন আমি আফ্রিকার গহিন অরণ্য থেকে এই প্রথম শার্ট-প্যান্ট গায়ে দিয়ে সভ্য সমাজে এসেছি। আমি এক ফাঁকে গুলতেকিনকে বললাম– "এই ব্যাটাকে তো আর সহ্য করা যাচ্ছে না, কি করা যায় বলো তো?"

সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মাথার যন্ত্রণায় আমি মরে যাচ্ছি, কিছু একটা করো। আর পারছি না।

আমি এই বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায় কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোক এর মধ্যে কয়েক বারই বলেছেন তিনি আমাদের নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরবেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকলে বিরক্তিতেই মৃত্যু হওয়া বিচিত্র না। মুক্তির সুযোগ ভদ্রলোক নিজেই করে দিলেন। এক সময় বললেন, "ভিয়েতনামের যুদ্ধে

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আমি বি ফিফটি টু বিমান চালাতাম। দু'বার আমাকে প্যারাস্যুট দিয়ে জাম্প করতে হয়েছিল। হোয়াট এন এক্সপেরিয়েন্স।"

আমি বললাম, "বি ফিফটি টু বিমান। তার মানে বোমারু বিমান?"

"হ্যাঁ"।

"ভিয়েতনামে ভারী ভারী বোমার বেশ কিছু তাহলে তুমি ফেলেছ।"

"হ্যাঁ। এটা হচ্ছে পার্ট অব দি গেম।"

"তাহলে তো একটা সমস্যা হলো।"

"কি সমস্যা?"

"তুমি অনেক নিরীহ মানুষের মৃত্যুর জন্যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। আর এদিকে আমি একজন অনুভূতি প্রবণ লেখক। তোমার সঙ্গে থাকা তো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমার মনের ওপর চাপ পড়ছে। তুমি কি দয়া করে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে হোটেলে পৌঁছে দেবে?"

ভদ্রলোক চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে বললেন, "তুমি হোটেলে ফিরে যেতে চাচ্ছ?"

আমি সহজ গলায় বললাম, "হ্যাঁ। আমাদের হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তোমার যদি অসুবিধা থাকে এখানেই নামিয়ে দাও। আমরা ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে যাব।"

"না অসুবিধা নেই। চলো হোটেলে পৌঁছে দিচ্ছি।"

গুলতেকিন বলল, "তুমি এমন একটা কথা এ রকম কঠিনভাবে কি করে বললে?"

আমি বললাম, "আমেরিকানরা সরাসরি কথা বলা পছন্দ করে। ওরা যা বলার সরাসরি বলে। আমিও তাই করলাম।"

সানফ্রান্সিসকো ঘুরে দেখার কাজ দু'জনে হাত ধরাধরি করে হেঁটে হেঁটেই সারলাম। খুব মজা লাগল চায়না টাউন দেখে। শহরের বিরাট একটা অংশ– সব চৈনিক। দোকানের সাইনবোর্ডগুলি পর্যন্ত চীনা ভাষায় লেখা। হাজার হাজার নাক চাপা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবস্থা অনেকটা আমাদের দেশের হাটের মতো। দরদাম হচ্ছে। যার দাম শুরুতে কুড়ি ডলার হাঁকা হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে সাত ডলারে। আমেরিকায় এই ব্যাপারটি অকল্পনীয়। দরদাম করার ব্যবস্থা আছে দেখে গুলতেকিন খুবই উৎসাহ পেয়ে গেল। তার এই উৎসাহের কারণে এক গাদা অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমরা চায়না টাউন থেকে কিনে ফেললাম।

চায়না টাউনের এক অংশে আছে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। ভেতরে কি হয় না হয় জানি না– বাইরে কিছু সাইন বোর্ড থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়। নমুনা দিচ্ছি–

www.MurchOna.com

"রোজিস প্লেস, অনিন্দ্য সুন্দরী নর্তকীরা নগ্ন গায়ে নৃত্য করবে। উপস্থিত অতিথিদের সবার টেবিলের উপরও তারা নাচবে।"

"মাত্র দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণ নগ্ন তরুণীর সঙ্গে একান্ত কথা বলার সুযোগ। প্রতি মিনিট কথা বলার জন্যে এক ডলার পঞ্চাশ সেন্ট।"

এই ব্যাপার আমেরিকার অনেক শহরে দেখেছি। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো বাধা-নিষেধ হয়তো নেই। ফ্রি কান্ট্রি– যার যা ইচ্ছা করতে পারে। যতদূর জানতাম নেভাদা স্ট্রেট ছাড়া অন্য কোনো স্ট্রেটে বেশ্যাবৃত্তির আইন সিদ্ধ নয়– সানফ্রান্সিসকোতে সন্ধ্যার পর পথে অনেক নিশিকন্যাকেই দেখা গেল্। উগ্র প্রসাধন, তার চেয়ে উগ্র পোশাক। একেক জনের চেহারা এত সুন্দর যে ইচ্ছা করে কাছে গিয়ে আশা ও আনন্দের দু'একটা কথা বলি। ওদের বলি, পৃথিবীকে এই মুহূর্তে তাদের যত খারাপ লাগছে আসলে তত খারাপ নয়। এইসব নিশিকন্যাদের দেখলেই আমি নিজের ভেতর এক ধরনের বিষণ্নতা অনুভব করি। এই বিষণ্নতার জন্ম কোথায় আমি জানি না।

এই বিরাট শহরে প্রচুর গৃহহীন মানুষ দেখলাম। সাইন বোর্ড নিয়ে রাস্তায় মোড়ে মোড়ে বসে আছে।

"আমি গৃহহীন আমাকে সাহায্য দাও।"

আমাদের দেশের মতো দরিদ্র কৃষক যেমন ভূমিহীন হচ্ছে– এখানকার হতদরিদ্র আমেরিকানরা হচ্ছে গৃহহীন। একটি বাড়ি (নিজের বা ভাড়া) এ দেশে টিকিয়ে রাখা কষ্টকর। গত নভেম্বর (৯০) নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কথা বলি। নিউইয়র্কবাসী বৃদ্ধ এক আমেরিকানের স্বপ্নের কথা এই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে। এই আমেরিকান বৃদ্ধ বয়সে সোস্যাল সিকিউরিটি থেকে চারশত সত্তর ডলার পান। চারশ' ডলার চলে যায় তার এক রুমের কামরার ভাড়া বাবদ। সত্তর ডলারে বাকি মাস টেনে নিতে হয়। রাত এবং দুপুরে খাবারের জন্যে একটা রেস্টুরেন্টে যান। রেস্টুরেন্টে খদ্দেরের উচ্ছিষ্ট খাবার তাকে দেয়া হয়। সেই ব্যবস্থা করা আছে। কাজেই দু'বেলা খাবারের খরচ বেঁচে যায়। তাঁর একটা কফি মেশিন আছে। মাঝে মাঝে সেই কফি মেশিনে কফি বানিয়ে খান। ছেলে- মেয়েরা বড় হয়েছে। তাদের অনেকেরই ছেলেপুলে আছে। কারো সঙ্গেই এই বৃদ্ধের যোগাযোগ নেই। কারণ যোগাযোগ থাকলেই বিভিন্ন উপলক্ষে গিফট পাঠাতে হবে। সেই সামর্থ্য তাঁর নেই। এই বৃদ্ধ তাঁর বর্তমান জীবন নিয়ে সুখী কারণ তিনি গৃহহীন নন। একটা ছোট্টঘর তাঁর আছে। শীতের রাতে যে ঘরে তিনি আরাম করে ঘুমুতে পারেন। পার্কের বেঞ্চিতে, বসে তাঁকে রাত কাটাতে হয় না। কাজেই তিনি ভাগ্যবান।

www.MurchOna.com

এক রাতে গুলতেকিনকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটছি। গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান দেখলেই থামছি, যদি ভালো এলপি পাই কিনে নেব। পাচ্ছি না। এলপি উঠে গেছে, তার জায়গায় এসেছে CD প্লেয়ার। এক দোকানে আমার পছন্দের কিছু ক্যাসেট পেলাম। কিংস্টোন ট্রায়োর "Where have all the flowers gone...' মন খারাপ করা গান। দু'জনে হাত ধরাধরি করে বাসায় ফিরছি। মনের ভেতরে গান বাজছে। শহরটা হয়ে গেছে অন্য রকম। এই রহস্যময় সময়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো– অত্যন্ত রূপবতী এক তরুণী তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে রাস্তার পাশে বসে আছে। তাদের সামনে কাঠ বোর্ডের একটি কাগজে লেখা– আমি এবং আমার শিশুপুত্র গৃহহীন। আপনার থলেতে কি কিছু ভাংতি পয়সা আছে?

মেয়েটির বয়স খুব বেশি হলে আঠারো-উনিশ। চোখ ধাঁধানো রূপ। তার ঘুমন্ত শিশুটিও মায়ের রূপের সবটুকু নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। গুলতেকিন বিষণ্ণ গলায় বলল, এ কি। সে পাঁচ ডলারের একটি নোট নিয়ে এগিয়ে গেল। আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন রূপবতী একজনকে কেউ ভিক্ষা দিচ্ছে এই কষ্ট আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। কি দেখছি আজকের আমেরিকায় "Where have all the flowers gone..."।

সানফ্রান্সিসকো থাকার কাল শেষ হয়েছে, এখন যাচ্ছি নিউ অরলিন্স। গুলতেকিন আমার সঙ্গে যেতে পারছে না– তার টিকিট পাইনি। সে চলে যাবে নিউ জার্সি। আমার জন্যে সেখানেই অপেক্ষা করবে। আমি নিউ অরলিন্সে এক সপ্তাহ কাটিয়ে চলে যাব তার কাছে।

আমি তাকে এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এলাম। খুবই খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে– শেষ বিদায় দিতে এসেছি। আর দেখা হবে না। তার স্যুটকেস চেক ইন করে দিয়েছি– সে ঢুকবে সিকিউরিটি এলাকায়। খুব মন খারাপ করা মুহূর্ত। এই মুহূর্তে হঠাৎ আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে সে বলল, "আমার এদেশের একটা জিনিস খুব ভালো লাগে। বিদায় মুহূর্তে এদের স্বামী-স্ত্রীরা কি সুন্দর শালীন ভঙ্গিতে চুমু খায়। তোমার কি এই দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে না?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ ভালো লাগে।"

"আমার সব সময় মনের মধ্যে গোপন বাসনা ছিল–

গুলতেকিন তার কথা শেষ করল না। ক্লান্ত ভঙ্গিতে সিকিউরিটি এলাকায় ঢুকে গেল। আমি মন খারাপ করে নিউ অরলিন্স রওনা হলাম। মন খারাপ হলেই

আমার শরীর খারাপ করে। প্লেনে ওঠার পর পর মাথার যন্ত্রণা শুরু হলো। এক সময় দেখি নিঃশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে।

নিউ অরলিন্সের ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের চমৎকার একটি হোটেলের তিনতলায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিলাম। একবারও ইচ্ছা করল না শহরটা কেমন ঘুরে দেখি। ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার ব্যাপারটা কি? কি বিশেষত্ব এই জায়গায় যে আমেরিকান সমস্ত প্রধান লেখকরাই তাদের জীবনের একটা বড় অংশ এখানে কাটিয়েছেন? কি আছে এখানে? হোটেলের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের আনন্দ ও উল্লাস ধ্বনি শুনি। পথে পথে হৈচৈ হচ্ছে। জ্যাজ সঙ্গীত হচ্ছে। নাচ হচ্ছে। প্রতিটি কাফে সারারাত খোলা। বার খোলা। মনে হয় এই পৃথিবীতে কোনো দুঃখ নেই।

আমি ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের মতো মজাদার জায়গায় অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি এই খবর রটে গেল। আমার সঙ্গী লেখকরা সব সময় খোঁজখবর নিতে আসছেন। পঁয়তাল্লিশ জন লেখকদের সবাই এখানে এসেছেন। তাঁরা এক ধরনের দায়িত্ববোধ করছেন– বাংলাদেশী ঔপন্যাসিকের কি হলো খোঁজ নেয়া। খুবই বিরক্তিকর অবস্থা। অবশ্য তাঁদের কাছ থেকে কিছু মজার মজার খবরও পাচ্ছি। যেমন ভারতীয় মহিলা কবি গগন গিল ডলার বাঁচানোর জন্যে আলজেরীয় নাট্যকারের সঙ্গে একটা রুম শেয়ার করছেন। একজন অল্পবয়স্কা ভারতীয় মহিলা এ রকম করবেন তা সহজভাবে গ্রহণ করতে একটু বোধহয় কষ্ট হয়। দেখলাম লেখকদের কেউই ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে পারে নি।

পশ্চিম দেশীয় কোনো তরুণী শয্যাসঙ্গী হিসেবে অল্প পরিচিত কোনো পুরুষকে গ্রহণ করতে হয়তো আপত্তি করবে না। কিন্তু রাতে ঘুমুবার জন্যে একটি আলাদা ঘর চাইবে, প্রাইভেসি চাইবে। যাক এসব ক্ষুদ্রতা, অন্য কথা বলি– নিউ অরলিন্সের হোটেল বরবনে রাত্রিবাস আমার একেবারে বৃথা গেল না– মে ফ্লাওয়ার এখানেই লেখা শুরু করলাম। শারীরিক অসুস্থতা ভুলে থাকার এই একটি চমৎকার উপায় লেখালেখিতে নিজেকে ব্যস্ত করে ফেলা। তাই করলাম। দরজা বন্ধ করে সারাদিন লেখার পর দেখি শরীরের ঘোর কেটে গেছে। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে।

রুম সার্ভিসকে কফি এবং খবরের কাগজ দিতে বলেছি। সে নিউইয়র্ক টাইমস দিয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখি নিউইয়র্ক টাইমস-এর শেষ পাতায়- বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা খবর ছাপা হয়েছে। জনতার প্রবল দাবির মুখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগ করেছেন। বর্তমানে তাঁর পালক পুত্র এবং পালক কন্যাসহ গৃহবন্দি আছেন।

বাংলাদেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই জানতাম না। এই খবরে বিস্ময়ের সীমা রইল না। এত বড় একটা খবর অথচ আমেরিকান পত্রিকায় এত ছোট করে ছাপা

www.MurchOna.com

হয়েছে দেখেও খারাপ লাগল। ছাত্ররা এত ক্ষমতাবান একজন ডিক্টেটরকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে ফেলেছে- এই ঘটনা চীনের থিয়েনমেন স্কয়ারের চেয়ে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় অথচ কত হেলাফেলার সঙ্গেই না খবরটা এরা ছাপাল। এরশাদের যে একজন পালক কন্যাও ছিল তা জানতাম না- নিউইয়র্ক টাইমসের কল্যাণে জানলাম। পালক পুত্রটির ছবি লক্ষ বার দেখেছি। পালক কন্যাকে কোনোদিন দেখিনি। এরশাদ নিশ্চয় বলে নি মেয়েটির ছবি ছাপা হোক। তাকে সবাই দেখুক।

কেন জানি ঐ পালক কন্যাটি খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। কেমন দেখতে ঐ মেয়েটি? কি তার নাম?

নিউ জার্সি শহরে আড়াইশ'র মতো বাঙালির বাস।

এই আড়াইশ'র একজন আমার ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল। কাজ করে বেল ল্যাবরেটরিতে। নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। গবেষণার বিষয় ফাইবার অপটিকস বা এই ধরনের কিছু। তারচেয়ে বড় পরিচয় সে বাংলা সাহিত্যের একজন লেখক এবং উঁচুমানের লেখক। তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী এবং শিশুদের জন্যে লেখা গ্রন্থগুলি আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে পড়ি, মাঝে মাঝে খানিকটা ঈর্ষাও যে করি না তা না।

নিউ অরলিন্স থেকে সরাসরি তার বাসায় গিয়ে উঠলাম। তার দুই বাচ্চা- নাবিল এবং ইয়েসিম। দু'জনই এয়ারপোর্টে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল- বড় চাচা আসবেন। তাদের ধারণা বড় চাচা মানে সাইজে যিনি বড়। দু'জনই আমার আকৃতি দেখে মনোক্ষুণ্ণ হলো। নাবিল নিখুঁত ইংরেজিতে বলল, "তোমরা একে বড় চাচা কেন বলছ- He is small."

নাবিলের বয়স পাঁচ। ইংরেজি-বাংলা দুই-ই চমৎকার বলে। তার বোনের বয়স তিন, সে মিশ্র ভাষা ব্যবহার করে। উদাহরণ- "Give my জামা খুলি" অর্থাৎ আমার জামা খুলে দাও।

বাচ্চা দুটি একা একা থাকে। নিকট আত্মীয়স্বজনদের দেখা বড় একটা পায় না। আমাকে এবং গুলতেকিনকে পেয়ে তাদের আনন্দের সীমা রইল না। তাদের আগ্রহ ও আনন্দের প্রধান কারণ আমরা বাংলাদেশের। বাচ্চা দুটিকে তাদের বাবা-মা এমন এক ধারণা দিয়েছে যাতে তাদের কাছে বাংলাদেশ হচ্ছে স্বপ্নের দেশ। বাংলাদেশের মানুষ- স্বপ্নের মানুষ। আমি তাদের সেই ধারণা উসকে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। ইয়েসিম যখন তার রান্নাবাটি খেলার কাগজের খাবার আমাকে এনে দিল আমি কপ কপ করে সেই কাগজ খেয়ে দুই ভাই-বোনের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলাম।

www.MurchOna.com

ওদের বাবা-মা দেখি বাচ্চা দুটিকে খুবই আধুনিক নিয়মে বড় করার চেষ্টা করছে। বাবা-মা দু'জনই পিএইচডি ডিগ্রিধারী এবং দীর্ঘদিন আমেরিকা প্রবাসী হলে এই বোধহয় হয়। ঘরে বাচ্চাদের জন্যে আইন-কানুন লেখা। যেমন–

প্রথম আইন : কাঁদলে কোনো জিনিস পাওয়া যাবে না। কাজেই কেঁদে লাভ নেই।

দ্বিতীয় আইন : খেলনা কারোর একার নয়। খেলনা শেয়ার করতেই হবে।

আমি ইকবালকে বললাম, "তোর কায়দা-কানুন তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কোনো একটা কিছু নিয়ে কেঁদে বাড়ি মাথায় না তুললে আর বাচ্চা কি! তোর নিয়মে তুই তো বাচ্চাদের বড়ো বানিয়ে ফেলছিস।"

সে হেসে বলল, "অনেক ভেবেচিন্তে এটা করছি। এক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট। তোমরা হঠাৎ দেখছ বলে অন্য রকম লাগছে।"

তাই হয়তো হবে। তাদের এক্সপেরিমেন্টে আমি এবং গুলতেকিন বাধা দিলাম না তবে একবার বেশ খারাপ লাগল। এদের নিয়ে খেলনার দোকানে গিয়েছি– নাবিলের একটা খেলনা পছন্দ হলো। তার বাবা বলল, নাবিল তিন নম্বর আইনটি কি বলো তো?

নাবিল গড়গড় করে বলল, "মাসে একটির বেশি খেলনা পাওয়া যাবে না।"

"তুমি কি এই মাসে খেলনা পেয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে এটি চাচ্ছ কেন।"

"আমার খুব পছন্দ হয়েছে।"

"তিন নম্বর আইন কি বলে? পছন্দ হলেই পাওয়া যাবে?"

"না।"

নাবিল ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

"কাঁদলে লাভ হবে না ব্যাটা। এক নম্বর আইন কি বলে?"

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "এক নম্বর আইন বলে কাঁদলে কিছু পাওয়া যাবে না।"

"তাহলে কাঁদছ কেন?"

"কান্না থামাতে পারছি না তাই কাঁদছি।"

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, "বাংলাদেশের একটা কঠিন আইন আছে। সেই আইন বলে– বড় ভাইরা ইচ্ছে করলে ছোট ভাইদের আইন ভাঙতে পারে। সেই বাংলাদেশী বিশেষ আইনে তোমাদের প্রথম আইন ভঙ্গ করা হলো। এখন তোমাকে তোমার প্রিয় জিনিস কিনে দেয়া হবে। এসো আমার সঙ্গে।"

নাবিল আশা ও নিরাশা নিয়ে তাকাল তার বাবার দিকে। তার বাবা বলল,

"বাংলাদেশী বিশেষ আইনের ওপর তো আর কথা চলে না। যাও তোমার বড় চাচার সঙ্গে।"

আমেরিকায় যা দেখে আমি সবচে' কষ্ট পেয়েছি তা হলো প্রবাসী বাঙালিদের ছেলে-মেয়ে। তারা বড়ই নিঃসঙ্গ। হ্যাঁ, বাবা-মা তাদের আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, কিন্তু দু'কূল ভাসানো আদর কোথায়? পরিষ্কার মনে আছে আমার শৈশবের একটি বড় অংশ কেটেছে আত্মীয়স্বজনদের কোলে কোলে। আদরে মাখামাখি হয়ে। নানার বাড়ির কথা। গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মা'কে ডেকে তুলে বললাম ঘুম আসছে না। কোলে করে মাঠে হাঁটলে ঘুম আসবে। মা বিরক্ত মুখে বললেন, কি যন্ত্রণা। দিব পাখা দিয়ে এক বাড়ি। খালারা চেঁচিয়ে উঠলেন– আহা আহা আহা। তিন মামা বের হয়ে এলেন কোলে নিয়ে মাঠে হাঁটার জন্যে। শুধু হাঁটলে হবে না। হাঁটতে হাঁটতে গল্প বলতে হবে। আকাশ ভরা ফকফকা জোছনা। মাঠ ভর্তি জোছনার ফুল। সেই শৈশব এরা কোথায় পাবে?

নিউ জার্সির প্রবাসী বাঙালিদের ছেলেমেয়েদের অবস্থা অবশ্যি তত খারাপ নয়। এরা একসঙ্গে হেসে-খেলেই বড় হচ্ছে। বাংলা শেখার স্কুল আছে, নাচের স্কুল আছে। গানের স্কুল আছে। প্রবাসী বাঙালিদের বৃদ্ধ বাবা-মারা দেশ থেকে নাতি-নাতনিদের দেখতে যাচ্ছেন। তিন মাস, তিন মাস করে থাকছেন।

প্রবাসী বাঙালিদের অভিমত হলো– প্রথম জেনারেশনেই শুধু প্রবাসে থাকার কষ্ট ভোগ করবে। দ্বিতীয় জেনারেশন করবে না, কারণ তাদের বাবা, মা, ভাই, বোন সব এই দেশেই থাকবে। তৃতীয় জেনারেশনে এরা শুধু যে বাবা-মা পাবে তাই না, খালা-খালু চাচা-চাচী সবই পেয়ে যাবে।

আমি তাদের যুক্তি মেনে নিলাম, অবশ্যি মনে মনে বললাম, সবই পাবে। শুধু পাবে না 'দেশ'।

পরে ভেবে দেখলাম আমার এই কথাও তো ঠিক নয়। দেশ কেন পাবে না? দেশ হবে আমেরিকা। তাতে ক্ষতি কি। আসলে আমরা কি বিশ্ব নাগরিক নই? পৃথিবী হচ্ছে আমাদের জন্মভূমি– এটা ভাবলেই সব সমস্যার সমাধান।

যখন বয়স কম ছিল তখন বিদেশে থেকে যাওয়া বাংলাদেশীদের কথা ভাবলে খানিক মন খারাপ হতো। এখন হয় না। এখন মনে হয় কর্ম এবং জীবিকার খাতিরে দেশত্যাগে ক্ষতি কি? বাংলাদেশের মানুষ ছড়িয়ে পড়ুক পৃথিবীময়। জনসংখ্যার ভারে পর্যুদস্ত বাংলাদেশের এতে লাভ বই ক্ষতি হবে না। প্রবাসী ইহুদিদের কল্যাণেই তো আজ ইসরাইল এত ক্ষমতাবান একটি দেশ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই হবে।

আমি নিউ জার্সিতে তার লক্ষণও দেখলাম। বাংলাদেশ সমিতি নামে নিউ জার্সির যে সমিতি তা দেশের জন্যে ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। দেশের যে

www.MurchOna.com

কোনো বিপদে যে পরিমাণ অর্থ তারা দান করছে তার পরিমাণ শুনলে মাথা ঘুরে যায়। একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকার কথাও তো আজ আমাদের জানতে বাকি নেই।

প্রসঙ্গক্রমে প্রবাসী বাঙালি পরিবারের একজনের কথা বলি। তিনি ছেলের জন্মদিন করবেন। দাওয়াতের চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে লেখা– আমার ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে উপহার কেনা বাবদ যে পরিমাণ অর্থ আপনি বরাদ্দ করে রেখেছিলেন দয়া করে সেই অর্থ– বাংলাদেশ সাহায্যকল্প প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান সেবায় দান করুন।

বাংলাদেশ সোসাইটি শিল্প-সাহিত্যের ধারাটি তাদের মধ্যে প্রবাহিত রাখার অংশ হিসেবে দেশের নামি কবি-সাহিত্যিক দাওয়াত করে নিয়ে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠান করছেন। এই তো কিছুদিন আগে ঘুরে গেলেন কবি শামসুর রাহমান।

আমি থাকতে থাকতেই সঙ্গীত অনুষ্ঠান হলো কাদেরী কিবরিয়ার। সবার মধ্যে কত আনন্দ, কত উৎসাহ।

ষোলই ডিসেম্বরে বিজয় দিবস উৎসব হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলছে তার রিহার্সেল। কত না উত্তেজনা সবার মধ্যে। দেখে বড় ভালো লাগল। অসহায় বাংলা মা'কে এরা ভুলেন নি– এই জীবনে ভুলতে পারবেনও না। বাংলাদেশ আর কিছু পারুক না পারুক এক দল পাগল ছেলে তৈরি করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছে। যারা বাংলাদেশ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না।

বন্দরের কাল হলো শেষ।

এখন ফিরে যাবার পালা। যেসব স্মৃতি নিয়ে ফিরছি তার বেশিরভাগই সুখ স্মৃতি নয়। তবু জানি প্লেনে ওঠা মাত্র মনে হবে কিছু চমৎকার সময় আমেরিকায় কাটিয়ে গেলাম। পাখি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যায় কিন্তু ফেলে যায় তার একটি পালক।

দেশে রওনা হবার দু'দিন আগে ভ্রাতৃবধূ ইয়াসমিন বলল, "দাদাভাই চলুন আপনাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাই যার স্মৃতি অনেক দিন আপনার মনে থাকবে।"

"কোন জায়গা বলতো?"

"ওয়াশিংটন ডিসির স্মিথসোনয়ান ইন্সটিটিউট।"

"আগে একবার দেখেছি।"

"চাঁদের মাটি দেখেছেন?"

"চাঁদের মাটি তো বাংলাদেশেই দেখেছি। উনিশশ সত্তর সনে আমেরিকান এ্যাম্বেসি চন্দ্রশীলা নিয়ে এসেছিল।"

"চাঁদের মাটি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছেন?"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "চাঁদের মাটি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখা যায়?"

"হ্যাঁ যায়। মিউজিয়ামে সেই ব্যবস্থা আছে। যাবেন?"

"অবশ্যই যাব। চাঁদের মাটি স্পর্শ করা তো চাঁদকে স্পর্শ করা। এই সুযোগ পাওয়া যাবে তাই তো কখনো কল্পনা করিনি।"

আনন্দে আমার চোখ ঝলমল করতে লাগল। ইয়াসমিন হাসতে হাসতে বলল, আমি জানতাম চন্দ্রশীলা হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় শুনে আপনি খুব একসাইটেড ফিল করবেন। এই কারণেই সবার শেষে আপনার জন্যে এই প্রোগ্রাম রেখে দিয়েছি।

সারাদিন গাড়ি চালিয়ে বিকেলে পৌছলাম মিউজিয়ামে। অনেক কিছুই দেখার আছে সেখানে– রাইট ব্রাদার্সের তৈরি প্রথম বিমান, যে লুনার মডিউল চাঁদে নেমেছিল– সেই লুনার মডিউল আরো কত কি...।

কিছুই দেখলাম না, এগিয়ে গেলাম চন্দ্রশিলার দিকে।

উঁচু একটি আসনে চাঁদের মাটি সাজানো। উপরে লেখা এই চন্দ্রশিলা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে।

আমি এবং গুলতেকিন একসঙ্গে চাঁদের পাথরে হাত রাখলাম। আমার রোমাঞ্চ বোধ হলো। গভীর আবেগে চোখে পানি এসে গেল। কত না পূর্ণিমার রাত মুগ্ধ চোখে এই চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় ও আবেগে অভিভূত হয়েছি। সেই চাঁদ আজ স্পর্শ করলাম। আমার এই মানব জীবন ধন্য।

আমেরিকার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধে মন দ্রবীভূত হলো। আমেরিকানদের অনেক দোষ-ত্রুটি, তবু তো এরা আমাকে এবং আমার মতো আরো অসংখ্য মানুষকে রোমাঞ্চ ও আবেগে অভিভূত হবার সুযোগ করে দিয়েছে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরের যে চাঁদ তাকে নিয়ে এসেছে মাটির পৃথিবীতে। এই শতক শেষ হবার আগেই তারা যাত্রা করবে মঙ্গল গ্রহের দিকে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে আবারো অভিভূত করবে। আমেরিকা আমি পছন্দ করি না তবু চন্দ্রশিলায় হাত রেখে মনে মনে বললাম– তোমাদের জয় হোক।

ইয়াসমিন ক্যামেরা হাতে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। কোমল গলায় বলল, "দাদাভাই হাসুন, আপনাদের ছবি তুলে রাখি। আপনি চাঁদের মাটিতে হাত দিয়ে এমন মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?"

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

দেখা না-দেখা

www.MurchOna.com

মহান চীন এবং কিছু ড্রাগন

বিশেষ এক ধরনের জটিল ব্যাধি আছে যা শুধুমাত্র লেখকদের আক্রমণ করে। লেখকরা তাদের লেখালেখি জীবনে কয়েকবার এই ব্যাধিতে ধরাশায়ী হন। পৃথিবীতে এমন কোনো লেখক পাওয়া যাবে না-যিনি জীবনে একবারও এই জটিল অসুখের শিকার হন নি। মেটেরিয়া মেডিকায় এই অসুখের বিবরণ থাকা উচিত ছিল কিন্তু নেই লেখকদের নিয়ে কে ভাবে?

যাই হোক, অসুখটার ইংরেজি নাম 'writer's Block', বাংলায় 'লেখক বন্ধ্যা রোগ' বলা যেতে পারে। এই রোগের লক্ষণ এরকম-হঠাৎ কোনো একদিন লেখকের মাথা শূন্য হয়ে যায়। তিনি লিখতে পারেন না। গল্প-কবিতা দূরে থাকুক স্বরে 'অ'-ও না। তিনি অভ্যাসমতো রোজ কাগজ-কলম নিয়ে বসেন এবং কাগজের ধবধবে শাদা পাতার কোনায় কোনায় ফুল-লতাপাতা আঁকার চেষ্টা করেন। কাপের পর কাপ চা ও সিগারেট খান। একসময় উঠে পড়েন। এটা হচ্ছে রোগের প্রাথমিক পর্যায়।

রোগের দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখক ইনসমনিয়ায় আক্রান্ত হন। সারা রাত জেগে থাকেন। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। অকারণে রাগারাগি করতে থাকেন-যেমন, 'চা এত গরম কেন?' [চা গরম হবারই কথা। লেখক আইসটি খেতে চাইলে ভিন্ন কথা।] 'সবাই উঁচু গলায় কথা বলছে কেন?' [সবাই স্বাভাবিক গলাতেই কথা বলছে। এরচে' নিচু গলায় কথা বললে কানাকানি করতে হয়।' 'এই গ্লাসে করে আমাকে পানি কেন দেয়া হলো?' [লেখক জীবনে কখনো কোন গ্লাসে পানি দেয়া হয়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। ব্যাধিগ্রস্ত হবার পর গ্লাস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। কী রকম গ্লাসে পানি দেয়া হলে তিনি খুশি হবেন তাও কিন্তু খোলসা করে বলছেন না।]

রোগের শেষ পর্যায়ে লেখক ঘোষণা করেন তিনি আর লেখালেখি করবেন না। অনেক হয়েছে। '...... ছাল' লিখে ফায়দা নেই। [ছালের আগের শব্দটা বুদ্ধিমান পাঠক গবেষণা করে বের করে নিন।] লেখকের মুখের ভাষা বস্তি লেভেলে নেমে আসে। তাঁর মধ্যে কাজী নজরুল সিনড্রম দেখা যায়। হাতের

www.MurchOna.com

কাছে যাই পান তাই ছিঁড়ে ফেলেন। নিজের পুরনো লেখা, টেলিফোন বিল, ইলেকট্রিসিটি বিল সব শেষ। তারপর এক অনিদ্রার মধ্যরাতে স্ত্রীকে ডেকে তুলে শান্ত গলায় বলেন, আমি বেঁচে থাকার কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সুইসাইড করব। তোমার কাছে থেকে বিদায় নেবার জন্যে তোমার কাঁচাঘুম ভাঙিয়েছি। তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। এখন দয়া করে একুশটা ঘুমের ওষুধ আমাকে দাও আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি।

কোনো কোনো পাঠক হয়তো ভাবছেন আমি writer's Block নামক রোগটা নিয়ে রসিকতা করছি। তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এই পৃথিবীর অনেক লেখক (খ্যাত এবং অখ্যাত) এই ভয়াবহ অসুখের শেষ পর্যায়ে এসে আত্মহত্যা করেছেন। এই মুহূর্তে যাঁদের নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেন-

কবি মায়াকোভস্কি (রাশিয়া)

ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ে (নোবেল প্রাইজ বিজয়ী, আমেরিকান)

ঔপন্যাসিক কাওয়াবাতা (নোবেল প্রাইজ বিজয়ী, জাপানি)

কবি জীবনানন্দ দাশ (বাংলাদেশ)

বিখ্যাতদের মতো অতি অখ্যাতরাও যে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন তার উদাহরণ আমি। গত শীতের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ আমাকে এই রোগে ধরল। কঠিনভাবে ধরল। এক গভীর রাতে শাওনকে ডেকে তুলে বললাম, 'কোথা সে ছায়া সখি কোথা সে জল? কোথা সে বাঁধাঘাট অশ্বথল?' সে হতভম্ব হয়ে বলল, এর মানে?

আমি বললাম, তুমি খুব আগ্রহ করে একজন লেখককে বিয়ে করেছিলে। সেই লেখক কিছু লিখতে পারছেন না। কোনোদিন পারবেনও না। আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। লেখকের সঙ্গে জীবনযাপনের আগ্রহ তারপরেও যদি তোমার থাকে, তুমি অন্য লেখক খুঁজে বের কর। আমি শেষ। আসসালামু আলায়কুম।

জীবন সংহারক রাইটার্স ব্লকের কোনো ওষুধ নেই। এন্টিবায়োটিক বা সালফা ড্রাগ কাজ করে না, তবে সিমটোমেটিক চিকিৎসার বিধান আছে। সিমটোমেটিক চিকিৎসায় লেখককে অতি দ্রুত তিনি যে পরিবেশে বাস করেন সেখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তাঁর প্রিয়জনরা সবাই তাঁর আশেপাশে থাকবেন, তবে লেখালেখি বিষয়ে কেউ তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারবেন না। লেখকের সঙ্গে কোনো বিষয়েই কেউ তর্কে যাবেন না। তিনি যা বলবেন সবাই 'গোপাল বড়ই সুবোধ বালকে'র মতো তাতে সায় দেবে।

আমার লেখক ব্লক দূর করার ব্যবস্থা হলো। প্রধান উদ্‌যোগী অন্যপ্রকাশের মাজহার। আমার এই অসুখে সে-ই সবচে' ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বই না লিখলে সে ছাপবে কী? সামনেই একুশের বইমেলা!

মাজহার এক সকালবেলা অনেক ভণিতার শেষে বলল, আমি জানি আপনি দেশের বাইরে যেতে চান না। চলুন না ঘুরে আসি। আপনি লেখালেখি করতে পারছেন না।-এটা কোনো ব্যাপার না। সারাজীবন লেখালেখি করতে হবে তাও তো না। এক জীবনে যা লিখেছেন যথেষ্ট। এমনি একটু ঘুরে আসা। আপনি হ্যাঁ বললে খুশি হবো।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

আনন্দে মাজহারের কালো মুখ বেগুনি হয়ে গেল। হিসাব মতো তার মুখে বত্রিশটা দাঁত থাকার কথা, সে কীভাবে যেন চল্লিশটা দাঁত বের করে হেসে ফেলল।

হুমায়ূন ভাই, কোথায় যেতে চান বলুন-ইন্দোনেশিয়ার বালি, মালয়েশিয়ার জেনটিং, থাইল্যান্ডের পাতায়া/ফুকেট, মরিশাস, মালদ্বীপ।

আমি বললাম ড্রাগন দেখতে ইচ্ছা করছে। চীনে যাব।

মাজহারের মুখের ঔজ্জ্বল্য সামান্য কমল। সে আমতা আমতা করে বলল, চীনে এখন ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। টেম্পারেচার শূন্যেরও নিচে....

আমি আগের চেয়েও গম্ভীর গলায় বললাম, চীন।

মাজহারের মনে পড়ল রাইটার্স ব্লকের রোগীর সব কথায় সায় দিতে হয়। সে বলল, অবশ্যই চীন। আমরা গরম দেশের মানুষ। ঠাণ্ডা কী জানি না। হাতে কলমে ঠাণ্ডা শেখার মধ্যেও মজা আছে।

হঠাৎ করে আমার মাথায় চীন কেন এলো বুঝতে পারলাম না। এমন না যে আমি চীন দেখি নি। পনেরো বছর আগে একবার গিয়েছিলাম। প্রায় একমাস ছিলাম। চীন দেশের নানান অঞ্চলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই দেশে আরেকবার না গিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া যেত। কিন্তু আমার মাথায় বাচ্চাদের মতো ঘুরছে-চীন, চীনের ড্রাগন।

সফরসঙ্গীর দীর্ঘ তালিকা তৈরি হলো। রাইটার্স ব্লক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীকে একা ছাড়া যাবে না। তার চারপাশে বন্ধুবান্ধব থাকতে হবে।

আমার সফরসঙ্গীরা হলেন-

০১. চ্যালেঞ্জার এবং চ্যালেঞ্জার-পত্নী।

চ্যালেঞ্জার একজন অভিনেতা। বেচারা একদিন নুহাশ চলচ্চিত্রে নাটকের

www.MurchOna.com

শুটিং দেখতে এসেছিল। নাপিতের এক চরিত্রে কাউকে অভিনয় করার জন্যে পাচ্ছিলাম না। তাকে ধমক দিয়ে জোর করে নামিয়ে দিলাম। আজ সে বিখ্যাত অভিনেতা। শুনেছি বাংলাদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে তার সম্মানী সর্বোচ্চ। চ্যালেঞ্জার-পত্নী স্কুল শিক্ষিকা। স্বামীর প্রতিভায় তেমন মুগ্ধ না তবে স্বামীর নানাবিধ যন্ত্রণায় কাতর।

০২. কমল, কমল-পত্নী এবং কন্যা আরিয়ানা।

কমলও আমার নাটকের অভিনেতা। ডায়ালগ ছাড়া অভিনয়ে সে অতি পারঙ্গম। ডায়ালগ দিলেই নানা সমস্যা। তোতলামি, মুখের চামড়া শক্ত হয়ে যাওয়া, হাত-পা বেঁকে যাওয়া শুরু হয়। সে আমার নাটকে অতি দক্ষতার সঙ্গে, রাইফেল কাঁধে মুক্তিযোদ্ধা, পাকিস্তান আর্মির সেপাই, পথচারী, দুর্ভিক্ষে মৃত লাশের ভূমিকা করেছে। এই মহান অভিনেতা অভিনয়ের জন্যে কোনো সম্মানি দাবি করেন না। ডেডবডির ভূমিকায় তিনি অনবদ্য। ডেডবডির ভূমিকায় এক বটগাছের নিচে তিনি আড়াই ঘণ্টা হা করে পড়েছিলেন। এর মধ্যে মুখে পিঁপড়া ঢুকেছে, কামড় দিয়ে তাঁর জিহ্বা ফুলিয়ে ফেলেছে, তিনি নড়েন নি। কমল পত্নীর নাম লিজনা। একসময় স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। অভিনেতা স্বামীর পেছনে সময় দিতে গিয় স্কুল ছেড়েছেন। এখন তাঁর প্রধান কাজ অভিনেতা স্বামীর কস্টিউম গুছিয়ে দেয়া। এই দম্পতির একমাত্র কন্যা আরিয়ানার বয়স চার। পরীশিশুর চেয়েও সুন্দর। পুরো চায়না ট্রিপে আমার অনেকবারই ইচ্ছা করছে, মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করি। নিজের ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্য কোনো ছেলেমেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করার আমার অভ্যাস নেই বলে করা হয় নি।

০৩. মাজহার, মাজহার-পত্নী তাদের শিশুপুত্র অমিয় এবং টমিও।

মাজহারের একটি পরিচয় আগেই দিয়েছি, তারচেয়ে বড় পরিচয় সেও আমার নাটকের একজন অভিনেতা। তার এক মিনিটের একটি দৃশ্য আমি পুরো একদিন শুট করার পর ফেলে দিয়ে বাসায় চলে আসি। পরের দিন আমার হয়ে শাওন সেই দৃশ্য শুট করতে যায়। আমি নিশ্চিত ছিলাম সে পারবে। সে আমার মতো অধৈর্য না। তার ধৈর্য বেশি। সে এক মিনিটের এই দৃশ্য শুট করতে দেড় দিন সময় নেয়। শুটিং শেষে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে বাসায় ফিরে আসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাজহার কেমন করেছে? সে খড়খড়ে গলায় বলেছে, তুমি জানো না সে কেমন করেছে? সব বন্ধু-বান্ধবকেই অভিনেতা বানাতে হবে?

আমি এখনো আশাবাদী। কারণ আমার চিফ অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর (জুয়েল

রানা) আমাকে বলেছে যে, মাজহার স্যারের না-সূচক মাথা নাড়া এবং হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়া খারাপ হয় নি। প্রায় ন্যাচারাল মনে হয়েছে।

মাজহার-পত্নী স্বর্ণা সিলেটের মেয়ে। মা স্বভাবের মেয়ে। মাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল। দীর্ঘদিন ধরে তাকে চিনি। তার মুখ থেকে এখনো কারো প্রসঙ্গে একটি মন্দ কথা শুনি নি। স্বর্ণা স্বামীর অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ। স্বামীর প্রথম অভিনয়ের দিন সে মানতের রোজা রেখেছে। শাহজালাল সাহেবের দরগায় বিশেষ মোনাজাতের ব্যবস্থা করেছে।

এই দম্পতির একমাত্র পুত্রসন্তান অমিয়। নামটা রেখেছেন অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর। মাজহার পুত্রের নামের জন্যে আমার কাছে প্রথম এসেছিল। আমি নাম রেখেছিলাম-অরণ্য। মাজহার এই নাম রাখে নি, কারণ এই নামের একটা বাচ্চাকে সে চেনে। সেই বাচ্চা খুবই দুষ্টু প্রকৃতির। অরণ্য নাম রাখলে বাচ্চা বন্যস্বভাবের হয়ে যেতে পারে।

'যে যার নিন্দে তার দুয়ারে বসে কান্দে।' আমাদের অমিয় (বয়স চার) মাশাল্লাহ অতি দুষ্টু প্রকৃতির হয়েছে। তার সঙ্গে খেলতে এসে তার হাতে মার খায় নি এমন কোনো শিশু নেই। কামড় দিয়ে রক্ত বের করার বিষয়েও সে ভালো দক্ষতা দেখাচ্ছে। এই দিকে সে আরো উন্নতি করবে বলে সবারই বিশ্বাস। বেইজিং-এর ম্যাগডোনাল্ড রেস্টুরেন্টে বার্গার খাওয়ার সময় সে ফ্লাইং কিক দিয়ে দুই চায়নিজ বাচ্চাকে একই সঙ্গে ধরাশায়ী করে রেস্টুরেন্টের সবার প্রশংসাসূচক দৃষ্টি লাভ করেছে।

তার বিষয়ে একটি গল্প এখনই বলে নেই, পরে ভুলে যাব।

আমি কোনো একটি পত্রিকায় ইন্টারভ্যু দিচ্ছি। বিষয়বস্তু 'বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ'। অতি জটিল বিষয়। যিনি ইন্টারভ্যু নিচ্ছেন তিনি কঠিন কঠিন সব প্রশ্ন করছেন, যার উত্তর আমি জানি না। মোটামুটি অসহায় বোধ করছি। আমার পাশে নিরীহ মুখ করে অমিয় বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে ইন্টারভ্যু নামক বিষয়টাতে যথেষ্ট মজা পাচ্ছে। প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন একটু বলুন, বাংলাদেশের কোন কোন গল্পকার কাফকাকে অনুসরণ করেন?'

উত্তরের জন্যে আমি আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছি, এমন সময় আমার গালে প্রচণ্ড এক চড়। আমার প্রায় পড়ে যাবার মতো অবস্থা। প্রথমে ভাবলাম- প্রশ্নকর্তা আমার মূর্খতায় বিরক্ত হয় চড় লাগিয়েছেন। ধাতস্থ হয়ে বুঝলাম প্রশ্নকর্তা না চড়

www.MurchOna.com

দিয়েছে অমিয়। আমি উত্তর দিতে দেরি করায় সে হয়তো বিরক্ত হয়েছে। প্রশ্নকর্তা ভীত গলায় বলল, স্যার এই ছেলে কে?

আমি বললাম, অন্যদিন পত্রিকার সম্পাদক মাজহারুল ইসলামের ছেলে। সে বলল, আপনাকে মারল কেন?

আমি বললাম, ছেলে তার বাবার মতো হয়েছে। সাহিত্য পছন্দ করে না। সাহিত্য বিষয়ক কোনো আলোচনাও পছন্দ করে না। ইন্টারভ্যু এই পর্যন্ত থাক।

জি আচ্ছা থাক।

এত সহজে প্রশ্নকর্তা যে তার ইন্টারভ্যু বন্ধ করল তার আরেকটি কারণ- ইতিমধ্যে অমিয় প্রশ্নকর্তার ক্যামেরার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। ক্যামেরা নিয়ে দু'জনের দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে।

অমিয়'র চড় খেয়ে আমি তেমন কিছু মনে করি নি। তার কারণ সে আমাকে ডাকে-বুব বু। বুব বু'র অর্থ বন্ধু। বন্ধু বলতে পারে না, বলে বুব বু। একজন বন্ধু আরেক বন্ধুর গালে চড়-থাপ্পর মারতেই পারে।

ও আচ্ছা টমিওর কথা বলা হয় নি। অমিয়র ভাই টমিও মায়ের পেটে। তার এখনো জন্ম হয় নি। সে মায়ের পেটে করে বেড়াতে যাচ্ছে।

০৪. স্বাধীন খসরু। অভিনেতা।

সে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে না। কারণ সে আছে ইংল্যান্ডে। তার সঙ্গে কথা হয়েছে সে সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে বেইজিং-এ চলে আসবে। সে অভিনয় শিখেছে লন্ডন স্কুল অব ড্রামা থেকে। যে স্কুল পৃথিবীর অনেক বড় বড় অভিনেতার জন্ম দিয়েছে। উদাহরণ-এলিজাবেথ টেলর, পিটার ও টুল....। সে ইংল্যান্ডের সব ছেড়ে-ছুড়ে বাংলাদেশে চলে এসেছে শুধুমাত্র অভিনয়ের আকর্ষণে। আমার সব নাটকেই তাকে দেখা যায়। সে নাম করেছে 'তারা তিনজন'-এর একজন হিসেবে। দেশের বাইরে তার জনপ্রিয়ত হা ঈর্ষণীয়। তাকে নিয়ে একবার আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে গিয়েছিলাম। বাঙালি সমাজ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আনন্দময় দৃশ্য। ছেলে হিসেবে সে অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ। অতি তুচ্ছ কারণে সে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে-এটি নিত্যদিনকার দৃশ্য। তার গত জন্মদিনে আমরা তাকে নরসিংদীর বিশাল এক গামছা উপহার দিয়েছি। উপহারপত্রে লেখা- 'পবিত্র অশ্রুজল মোছার জন্যে'।

০৫. শাওন ও লীলাবতী।

শাওনকে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই। তার প্রভাতেই সে দীপ্ত। হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় স্ত্রী পরিচয় অবশ্যই তার জন্যে সুখকর না। লীলাবতীর পরিচয়

www.MurchOna.com

দেয়া প্রয়োজন। লীলাবতী তার গর্ভে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা কন্যা। গত পাঁচ মাস ধরে সে মায়ের পেটের অন্ধকারে বড় হচ্ছে। মা'র সঙ্গে সেও চীনে যাচ্ছে। তার ভ্রমণ অতি আনন্দময়। সে বাস করছে পৃথিবীর সবচে' সুরক্ষিত ঘরে। সে ঘর অন্ধকার হলেও মায়ের ভালোবাসায় আলোকিত।

ভ্রমণ বিষয়ে শাওনের উৎসাহ সীমাহীন। যেখানে ঘরের বাইরে পা ফেলতে পারলেই সে খুশি, সেখানে সে যাচ্ছে চীনে! মিং ডায়ানেস্টিক সভ্যতা দেখবে, চীনের প্রাচীর দেখবে।

দেশের ভেতর সে আমাকে নিয়ে ঘুরতে পারে না। প্রধান কারণ দোকানে দোকানে জিনিসপত্র দেখে বেড়ানো আমার স্বভাব না। রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া আমার অপছন্দ। তারপরে ও কোথাও কোথাও যাওয়া হয়। লোকজন তখন যে তার দিকে মায়া মায়া দৃষ্টিতে তাকায় তা-না। লোকজনের দৃষ্টিতে থাকে-হুমায়ূন আহমেদ নামক ভালো মানুষ লেখককে কুহক মায়ায় তুমি মুগ্ধ করেছ। তুমি কুহকিনী!

দেশের বাইরে তার সেই সমস্যা নেই। আমাকে পাশে নিয়ে কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে বসলে কেউ সেই বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাবে না। দু'একজন হয়তো ভাববে-বাচ্চা একটা মেয়ে বুড়োটার সঙ্গে বসে আছে কেন? এর বেশি কিছু না। এ ধরনের দৃষ্টিতে শাওনের কিছু যায় আসে না।

দেশের বাইরে শাওনের ঝলমলে আনন্দময় মুখ দেখতে আমার ভালো লাগে। তবে মাঝেমধ্যে একটা বিষয় চিন্তা করে বুকের মধ্যে ধাক্কার মতো লাগে। আমি ষাট বছরের বুড়ি ধরতে যাচ্ছি। চলে যাবার ঘন্টা বেজে গেছে। আমার মৃত্যুর পরেও এই মেয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে। সে কি একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবে? না-কি আনন্দময় অন্য কোনো পুরুষ আসবে তার পাশে। সে কোনো এক রেস্টুরেন্টে মাথা দুলিয়ে হেসে হেসে গল্প করবে তার সঙ্গে-'এই কী হয়েছে শোন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন না....'

০৬

পুত্র নুহাশ।

না না, সে আমাদের সঙ্গী না। শাওন যেখানে আছে সেখানে সে যাবে কিংবা তাকে যেতে দেয়া হবে তা হয় না।

নুহাশকে আমার সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ দেখা করতে দেয়া হয়। তবে আমার ঘরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয় না। সে আসে, গ্যারেজে দাঁড়িয়ে মোবাইলে এসএমএস করে জানায় -'বাবা আমি এসেছি।' আমি নিচে নেমে যাই। গাড়িতে কিছুক্ষণ

www.MurchOna.com

এলোমেলোভাবে ঘুরি। মাঝে মধ্যে মাথায় হাত রাখি। সে লজ্জা পায় বলেই চট করে হাত সরিয়ে নেই। তাকে বাসায় নামিয়ে মন খারাপ করে ফিরে আসি।

যে পুত্র সঙ্গে যাচ্ছে না তার নাম সফরসঙ্গী হিসেবে কেন লিখলাম? এই কাজটা লেখকরা পারেন। কল্পনায় অনেক সঙ্গী তারা সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারেন।

দীর্ঘ চীন ভ্রমণে অদৃশ্য মানব হয়ে আমার পুত্র আমার সঙ্গে ছিল। একবার ফরবিডেন সিটিতে প্রবল তুষারপাতের মধ্যে পড়লাম। কমল কমলের মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, মাজহার তার ছেলেকে নিয়ে। আমি শাওনকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। তার পেটে লীলাবতী। পা পিছলে পড়লে বিরাট সমস্যা। হঠাৎ দেখি একটু দূর দিয়ে মাথা নিচু করে নুহাশ হাঁটছে। তার মুখ বিষণ্ণ। চোখ আর্দ্র। আমি বললাম, বাবা, আমার হাত ধর। আমার দায়িত্ব শাওনকে হাত ধরে ঠিকমতো নিয়ে যাওয়া। তোমার দায়িত্ব আমাকে ঠিকমতো নিয়ে যাওয়া। সে এসে আমার হাত ধরল।

কল্পনার নুহাশ বলেই করল। লেখকরা তাদের কল্পনার চরিত্রদের নিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেন। লেখক হবার মজা এইখানেই।

প্রথম রজনী...

ঢাকা থেকে হংকং। হংকং থেকে বেইজিং।

প্লেন থেকে নামলাম। এয়ারপোর্টের টার্মিনাল থেকে বের হলাম, একসঙ্গে সবার মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। মেয়েদের চুল বলেই খাড়া হলো না, তবে ফুলে গেল। কারণ সহজ। তাপমাত্রা শূন্যের সাত ডিগ্রি নিচে। হাওয়া বইছে। টেম্পারেচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিল ফ্যাক্টর। চিল ফ্যাক্টরের কারণে তাপমাত্রা শূন্যের আঠারো-উনিশ ডিগ্রি নিচের চলে যাবার কথা। এই হিসাব কেমন করে করা হয় আগে জানতাম। এখন ভুলে গেছি।

কমল বলল, হুমায়ূন ভাই, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব আছে।

আমি বললাম, হুঁ।

শুধু মেয়েরা খুশি। বেড়াতে বের হলে সব কিছুতেই তারা আনন্দ পায়। বড়ই আহ্লাদী হয়।

শাওন বলল, ঠাণ্ডাটা যা মজা লাগছে।

বাকিরাও তার সঙ্গে গলা মেলাল। তাদেরও নাকি মজা লাগছে। তারা সিগারেট খেলা শুরু করল। সিগারেট খাওয়ার ভঙ্গি করে ধোঁয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাসের জলীয় বাষ্প জমে যায়। মনে হয়, বুনকা বুনকা ধোঁয়া।

www.MurchOna.com

বাচ্চারা সবার আগে কাহিল হলো। কারোর হাত-মোজা নেই। ঠাণ্ডায় হাত শক্ত হয়ে গেল। তারা শুরু করল কান্না। কে তাকায় বাচ্চাদের দিকে? বাচ্চাদের মায়েদের ঠাণ্ডা নিয়ে আহ্লাদী তখনো শেষ হয় নি।

বাংলাদেশ আম্বেসির ফার্স্ট সেক্রেটারি অ্যাম্বেসির গাড়ি নিয়ে এসেছেন। তাঁর নাম মনিরুল হক। তিনি আমাদের হয়ে হোটেল বুকিংও দিয়ে রেখেছেন। তাঁর দায়িত্ব আমাদেরকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। এক গাড়িতে হবে না। আরো কয়েকটা গাড়ি লাগবে। তিনি ব্যস্ত হয়ে চলে গেছেন গাড়ির সন্ধানে। আমরা দুর্দান্ত শীতে থরথর করে কাঁপছি।

অ্যাম্বেসির বিষয়টা বলি। একজন লেখক বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেড়াতে যাবে, তার জন্যে অ্যাম্বেসি গাড়ি পাঠাবে– বাংলাদেশ অ্যাম্বেসি এই জিনিস না। লেখক কবি-সাহিত্যিক-পেইন্টার তাদের কাছে কোনো বিষয় না। প্রবাসে যেসব বাংলাদেশী বাস করেন, তারাও তাদের কাছে কোনো বিষয় না। অ্যাম্বেসি দেখে বেড়াতে আসা মন্ত্রী-মিনিস্টারদের, আমলাদের। সেইসব মহামানবরা অ্যাম্বেসির গাড়ি নিয়ে শপিং করেন। অ্যাম্বেসির কর্মকর্তারা বাজারসদাই-এ সহায়তা করেন।

পৃথিবীর বাকি দেশগুলির অ্যাম্বেসির অনেক কর্মকাণ্ডের প্রধান কর্মকাণ্ড, তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অন্যদের পরিচয় করিয়ে দেয়া। এত সময় বাংলাদেশ অ্যাম্বেসির কর্মকর্তাদের নেই। তাদেরকে নানান স্টেট ফাংশনে ডিনার খেতে হয়। অনেকগুলি পত্রিকা পড়তে হয় (দেশে কী হচ্ছে জানার জন্যে।) সময়ের বড়ই অভাব।

আমি কখনো দেশের বাইরে গেলে অ্যাম্বেসির সঙ্গে যোগযোগ করে যাই না। আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়। বেইজিং-এ অ্যাম্বেসিকে আগেভাগে জানানোর কাজটি করেছে মাজহার। যে ভদ্রলোক অ্যাম্বেসি থেকে এসেছেন তিনি যে অ্যাম্বাসেডর কর্তৃক নির্দেশ পেয়ে এসেছেন তাও না। তিনি এসেছেন, নিজের আগ্রহে এবং আনন্দে। তিনি লেখক হুমায়ূন আহমেদের অনেক বই পড়েছেন, অনেক নাটক দেখেছেন। লেখককে সামনাসামনি দেখার ইচ্ছাই তাঁর মধ্যে কাজ করেছে।

এই সৌভাগ্য আমার প্রায়ই হয়। অ্যাম্বেসিতে সিরিয়াস কিছু ভক্ত পাওয়া যায়। তারা যে আগ্রহ দেখায় তার জন্যে ও সমস্যায় পড়তে হয়। ১৯৯৬ সালে বিশাল এক দল নিয়ে নেপালের কাঠমাণ্ডুতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অ্যাম্বেসিতে মোটামুটি হুলস্থুল পড়ে গেল। অ্যাম্বেসিতে তিনটি ডিনার দিল। কাঠমাণ্ডুর লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করল। আমি বিব্রত (এবং খানিকটা আনন্দিতও)। সমস্যা দেখা দিল তারপর যখন বাংলাদেশ অ্যাম্বেসি আমার এবং

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আমার দলের পেছনে বিরাট অঙ্কের খরচ দেখাল। খরচের হিসাব চলে গেল জাতীয় সংসদে। শাওনের মা, বেগম তহুরা আলি তখন সংসদ সদস্য। তাঁর কাছেই সংসদের আলোচনার কথা শুনলাম। খুবই লজ্জা পেলাম।

কাজেই আমি অ্যাম্বেসির তরুণ সুদর্শন হাস্যমুখি ফার্স্ট সেক্রেটারিকে শক্তভাবে বললাম, আপনি যে কষ্ট করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। তবে আপনার কাছ থেকে আর কোনো সাহায্য-সহযোগিতা আমি নেব না। আপনাদের কারো বাড়িতে ডিনার খাব না, অ্যাম্বাসেডর সাহেবের সঙ্গে দেখা করব না।

মনিরুল হক অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনি যা বলবেন তাই।

মনিরুল হক তাঁর কথা রাখেন নি। তিনি তাঁর বাড়িতে বিশাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে আমাদের অ্যাম্বাসেডরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, পৃথিবীর সংস্কৃতি চর্চা, ধর্ম নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ (এবং শিক্ষনীয়) বিষয়ে আলোচনা করলেন। এই আলোচনায় আমার সফরসঙ্গীরা উপকৃত হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ তারা গভীর আগ্রহে আলোচনা শুনল।

দেশে ফেরার সময় মনিরুল হক সাহেব কাঁচুমাচু হয়ে একটা প্রস্তাব দিলেন। অ্যাম্বাসেডর সাহেব ফরেন সেক্রেটারির জন্য উপহার হিসেবে একটা গলফ সেট পাঠাবেন। গলফ সেটটা অত্যন্ত দামি বিধায় লাগেজে দেয়া যাচ্ছে না। হাতে করে নিয়ে যেতে হবে। আমরা কি নিয়ে যাব? একবার ঢাকায় পৌঁছলে আমাদের আর কিছুই করতে হবে না। সেক্রেটারি সাহেব লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবেন।

আমি গলফ সেট কাঁধে করে নিয়ে যেতে খুবই রাজি ছিলাম। আমার সফরসঙ্গীরা বাদ সাধল। তারা মনে করল, এতে লেখক হুমায়ূন আহমেদের সম্মানহানি হবে। গলফ সেট নেয়া হলো না।

আমাদের পররাষ্ট্র সচিবের কাছে এতদিনে নিশ্চয়ই গলফ সেট পৌছে গেছে। আশা করি, গলফে তাঁর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আমরা মন্ত্রী, সচিব এবং এ্যাম্বাসেডরদের সর্ব বিষয়ে উন্নতি কামনা করি।

বেইজিং-এ আমাদের জন্যে যে হোটেল ঠিক করা ছিল, তার নাম Gloria Plaza. চমৎকার হোটেল। সামনেই ক্রিসমাস, এই উপলক্ষে সুন্দর করে সাজানো। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, ভেতরে চমৎকার উষ্ণতা। ডেস্কের চায়নিজ মেয়েরা সুন্দর ইংরেজি বলছে। ব্যবহার আন্তরিক। এক যুগ আগের দেখা চীন এবং বর্তমানের আধুনিক চীনের কোনো মিল নেই।

www.MurchOna.com

আমাদের হোটেলে দাখিল করে মনিরুল হক সাহেব কয়েকটা টিপস দিলেন। প্রথম টিপস, কেনাকাটা করতে গেলেই দামাদামি করতে হবে। এখানকার দোকানপাট ইউরোপ-আমেরিকার মতো না-যে দাম লেখা থাকবে সেই দামেই সোনামুখ করে কিনতে হবে। চায়নিজ দোকানিরা জিনিসপত্রের গায়ে আকাশছোঁয়া দাম লিখে রাখে, কাজেই শুরু করতে হবে পাতাল থেকে। যে বস্তুর গায়ে লেখা পাঁচশ' ইয়েন, তার দাম বলতে হবে পাঁচ ইয়েন। কিছুক্ষণ দরদাম করার পর দশ ইয়েনে ঐ বস্তু পেয়ে যাওয়ার কথা।

মেয়েরা আসন্ন দরদামের কথা ভেবে আনন্দে অধীর হয়ে গেল। এই কাজটি মেয়েরা কেন জানি না খুবই আগ্রহের সঙ্গে করে। চারঘন্টা সময় নষ্ট করে তারা একশ' টাকার জিনিস ৯৫ টাকায় কিনে এমন ভাব করবে যেন তারা চেঙ্গিস খান, এইমাত্র এক রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছে। চারঘন্টা তাদের কাছে কোনো বিষয় না, পাঁচ টাকা বিষয়।

আমি নিজে নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারে এক অতি বিত্তবান তরুণীকে পেঁপের দাম দু'টাকা কমানোর জন্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দরদাম করতে দেখেছি। বিত্তবান তরুণীরা পরিচয় দিলে আপনারা কেউ কেউ চিনতেও পারেন। তাঁর নাম মেহের আফরোজ শাওন। তিনি ফিল্মে অভিনয় করেন এবং গান করেন।

মনিরুল হক সাহেবের দ্বিতীয় টিপস হলো-এখানে সবকিছুর দু'টা নাম। একটা ইংরেজি নাম, একটা চায়নিজ নাম। হোটেল Gloria Plaza র একটা চায়নিজ নাম আছে। চায়নিজ নাম জানা না থাকলে মহাবিপদ। কোনো ট্যাক্সি ড্রাইভারই ইংরেজি নাম জানে না। মনিরুল হক সাহেবের এই উপদেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা না করায় আমি যে বিপদে পড়েছিলাম যথাসময়ে তা বর্ণনা করা হবে।

হোটেলের রুমগুলি সবার পছন্দ হলো। শুধু মাজহারের হলো না। তার ধারণা, তার নিজের রুম ছাড়া বাকি সবগুলো ভালো।

অনেক ঝামেলা করে সে তার রুম পাল্টালো। রাতে সবাইকে নিয়ে খেতে যাব, তখন শুনি বর্তমান রুমটাও মাজহার বদলাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ এই রুমের সবই ভালো, শুধু কমোডের ঢাকনিটায় কালো কালো দাগ।

রাত এগারোটায় দ্বিতীয় দফা রুম বদলানোর পর আমরা খাদ্যের সন্ধানে বের হলাম। কাছেই ম্যাকডোনাল্ড। বার্গার খাওয়া হবে। মেয়েদের মধ্যে আবারো আনন্দের ঝড় বয়ে গেল। আচ্ছা, মেয়েরা সবসময় জাংক বস্তু পছন্দ করে কেন? জাংক ফুড, জাংক স্বামী। একজন ভালোমানুষ স্বামীকে মেয়েরা যত পছন্দ করে,

www.MurchOna.com

তারচেয়ে দশগুণ বেশি পছন্দ করে জাংক স্বামী। এই জন্যেই কি নারী চরিত্র 'দেবো না জানন্তি, কুত্রাপি মনুষ্যা'?

শুকনা বার্গার চিবুতে চিবুতে দুঃসংবাদ শুনলাম। হোটেল গ্লোরিয়া প্লাজার নাশতা বিষয়ক দুঃসংবাদ। প্রতি রুমের একজন ফ্রি নাশতা খাবে। অন্যজনকে কিনে খেতে হবে। আমি বলতে গেলে পৃথিবীর সব দেখেই গেছি-এমন অদ্ভুত নিয়ম দেখি নি এবং কারো কাছে থেকে শুনিও নি।

রাতেই দলগতভাবে সিদ্ধান্ত হলো, সকালবেলা প্রতি রুমের স্বামী বেচারা নাশতা খেতে যাবে, তার দায়িত্ব হবে স্ত্রীর নাশতা লুকিয়ে নিয়ে আসা। সেদ্ধ ডিম, রুটি, মাখন, কলা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলা কোনো ব্যাপারই না। পরের দিন স্ত্রীদের পালা, তারা স্বামীদের নাশতা নিয়ে আসবে। দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ চুরি চুরি খেলার কথা ভেবে আনন্দে সবাই আত্মহারা। আমি ক্ষীণ স্বরে আপত্তি করতে গিয়ে ধমক খেলাম। ব্যাপারটায় নাকি প্রচুর ফান আছে। আমি মাথামোটা বলে ফানটা ধরতে পারছি না। খাবার চুরি এবং বই চুরিতে পাপ নেই-এইসবও শুনতে হলো।

পাঠক শুনে বিস্মিত হবেন পুরুষদের কেউ কোনো চুরি করতে পারে নি। পুরুষদের একজন শুধু একটা কমলা পকেটে নিয়ে ফিরেছে।

দ্বিতীয় দিন ছিল মহিলাদের পালা। তারা যে পরিমাণ খাবার চুরি করেছে তা দিয়ে বাকি সবাই এক সপ্তাহ নাশতা খেতে পারে। মনস্তত্ত্ববিদ এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা এই ঘটনা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে কি উপনীত হতে পারেন?

নিষিদ্ধ নগরে তুষার ঝড়

নিষিদ্ধ পল্লীর কথা আমরা জানি। নিষিদ্ধ পল্লী - Red Light Area. যেখানে নিশিকন্যারা থাকেন। নগরের আনন্দপ্রেমীরা গোপনে ভীড় করেন। নিষিদ্ধ নগরী কী

নিষিদ্ধ নগরী হলো - Forbidden City. চায়নিজ ভাষায় গু গং (GuGong). বেইজিং-এর ঠিক মাঝখানে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা মিং এবং জিং (ging) সম্রাটদের প্রাসাদ। বিশাল এক নগর। প্রজারা কখনো কোনোদিনও এই নগরে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনই কঠিন নিয়ম। এই নগর প্রজাদের জন্যে নিষিদ্ধ বলেই নগরীর নাম 'নিষিদ্ধ নগরী'।

নগরীতে প্রাসাদ সংখ্যা কত? আট শ'। প্রসাদে ঘরের সংখ্যা আট হাজারের বেশি।

এই নগরীর নির্মাণ শুরু হয় ১৪০৬ সনে। দুই লক্ষ শ্রমিক ১৪ বৎসর

www.MurchOna.com

অমানুষিক পরিশ্রম করে নির্মাণ শেষ করে। এই নগরীর কঠিন পাঁচিল এমন করে বানানো হয় যেন কামানের গোলা কিছুই করতে না পারে। সম্রাটরা ধরেই নিয়েছিলেন, তাদের কঠিন দেয়াল ভেঙে কেউ কোনোদিন ঢুকতে পারবে না। হায়রে নিয়তি! ব্রিটিশ সৈন্যরা ১৮৬০ সনে নিষিদ্ধ নগরী দখল করে নেয়। হতভম্ব সম্রাট শুধু তাকিয়ে থাকেন।

নিষিদ্ধ নগরীর শেষ সম্রাটের নাম পুই (Pu Yi) , ১৯১২ সনে তাঁকে সিংহাসন ছাড়তে হয়। শেষ হয় নিষিদ্ধ নগরীর কাল। শেষ সম্রাটকে নিয়ে যে ছবিটি বানানো হয়, The Last Emperor, সেটা হয়তো অনেকেই দেখেছেন। না দেখে থাকলে দেখতে বলব, কারণ ছবিটি চীন সরকারের অনুমতি নিয়ে নিষিদ্ধ নগরীর ভেতরেই শুট করা হয়। প্রথম নিষিদ্ধ নগরীর ভেতর ৩৫ মিমি ক্যামেরা ঢোকে।

রাজা-বাদশাদের বিলাসী জীবন কেমন ছিল তা দেখার আগ্রহ আমি কখনো বোধ করি নি। সব বিলাসের একই চিত্র। সোনা, রুপা, মণি মাণিক্য। হাজার হাজার রক্ষিতা। পান এবং ভোজন। এই বাইরে কী?

কারো গান-বাজনার শখ থাকে, কেউবা ছবি আঁকেন, এইখানেই শেষ। সম্রাটদের সমস্ত মেধার সমাপ্তি নারী এবং সুরায়।

প্রথমবার নিষিদ্ধ নগরীতে ঢুকে এমন মন খারাপ হয়েছিল! মনে হচ্ছিল, চীনের হতদরিদ্র মানুষদের দীর্ঘনিঃশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে আছে। রক্ষিতারা যেখানে থাকত সেখানে গেলাম। একসঙ্গে তিন হাজার রক্ষিতার থাকার ব্যবস্থা। প্রত্যেকের জন্যে পায়রার খুপরির মতো খুপরিঘর। কী বীভৎস তাদের জীবন! ইচ্ছে হলে কোনো একদিন কিছুক্ষণের জন্যে এদের একজনকে সম্রাট ডেকে নেবেন। কিংবা নেবেন না। উপহার হিসেবে পাঠাবেন ভিনদেশের রাজা-মহারাজাদের কাছে।

মোঘল সম্রাটরা বেশ কয়েকবার চীন সম্রাটদের কাছ থেকে রূপবতী চৈনিক মেয়ে উপহার পেয়েছেন।

এইসব রূপবতীদের সংগ্রহ করত রাজপুরুষরা। কোনো এক চাষির ঘরে ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে। মেয়ে বড় হয়েছে। বাবা-মা'কে ছেড়ে তাকে চিরদিনের জন্যে চলে যেতে হচ্ছে নিষিদ্ধ নগরীর উঁচু পাঁচিলের ভেতর।

সেবারে সম্রাটদের সুরাপাত্র এবং পিকদান দেখেছিলাম। সুরাপাত্র স্বর্ণের থাকবে এটা ধরে নেয়া যায়-থুথু ফেলার সব পাত্রও সোনার হতে হবে? মণি মাণিক্য খচিত হতে হবে? সম্রাটের থুথু এতই মূল্যবান?

www.MurchOna.com

যাই হোক, ভ্রমণ প্রসঙ্গে যাই। আমি দলবল নিয়ে নিষিদ্ধ নগরীতে ঢুকলাম। ছোট্ট বক্তৃতা দিলাম-অনেক মিউজিয়াম আছে। তোমরা দেখতে পার। দেখার কিছু নেই। কোন সোনার পাত্রে রাজা থুথু ফেলতেন, কোন হীরা মণি মাণিক্যের টাট্টিখানায় হাগু করতেন তা দেখে কী হবে? তাছাড়া খুব বেশি জিনিসপত্র এখানে নেই।

অনেক কিছু লুট করে নিয়ে গেছে ব্রিটিশরা। তারা ব্রিটিশ মিউজিয়াম সাজিয়েছে। দ্বিতীয় দফায় লুট করা হয়েছে (১৯৪৭) চিয়াং কাইশেকের নির্দেশে। তিনি সব নিয়ে গেছেন তাইওয়ানে। সেখানকার ন্যাশনাল প্যালেস মিউজিয়ামের বেশির ভাগ জিনিসপত্রই নিষিদ্ধ নগরীর।

সম্রাটদের প্রাসাদ দেখেও কেউ কোনো মজা পাবে না। সব একরকম। কোনো বৈচিত্র্য নেই। দোচালা ঘরের মতো ঘর। একটার পর একটা। ঢেউয়ের মতো।

আমার নেগেটিভ কথা সফরসঙ্গীদের উপর বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলল না। তারা সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, একী! কী দেখছি! এত বিশাল! এত সুন্দর! এটা না দেখলে জীবন বৃথা হতো।

পরম করুণাময় আমার সফরসঙ্গীদের উচ্ছ্বাস হয়তো পছন্দ করলেন না। তিনি ঠিক করলেন তাঁর তৈরি সৌন্দর্য দেখাবেন। হঠাৎ শুরু হলো তুষারপাত। ধবধবে শাদা তুষার ঝিলমিল করতে করতে নামছে। যেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোছনার ফুল। যেন চাঁদের আলো ভেঙে ভেঙে নেমে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে পুরো নিষিদ্ধ নগর বরফের চাদরে ঢেকে গেল। আমি তাকিয়ে দেখি, চ্যালেঞ্জার এবং চ্যালেঞ্জার পত্নী কাঁদছে। আমি বললাম, কাঁদছ কেন?

চ্যালেঞ্জার বলল, বাচ্চা দুটাকে রেখে এসেছি এত সুন্দর দৃশ্য তারা দেখতে পারল না, এই দুঃখে কাঁদছি। স্যার, আমি এই দৃশ্য আর দেখব না। হোটেলে ফিরে যাব।

শাওন মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিল। আমি বললাম, ক্যামেরাটা দাও, ছবি তুলে দেই। সে বলল, এই দৃশ্যের ছবি আমি তুলব না। ক্যামেরায় কোনোদিন এই দৃশ্য ধরা যাবে না।

অবাক হয়ে দেখি তার চোখেও পানি। সে আমাকে চাপা গলায় বলল, এমন অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য তোমার কারণে দেখতে পেলাম। আমি সারাজীবন এটা মনে রাখব।

মেয়েরা আবেগতাড়িত হয়ে অনেক ভুল কথা বলে। আমার কারণে যে-সব

www.MurchOna.com

খারাপ অবস্থায় সে পড়েছে সেসবই তার মনে থাকবে, সুখস্মৃতি থাকবে না। মেয়েরা কোনো এক জটিল কারণে দুঃখস্মৃতি লালন করতে ভালোবাসে।

অন্য সফরসঙ্গীদের কথা বলি। মাজহার তুষারপাতের ছবি নানান ভঙ্গিমায় তুলতে গিয়ে পিচ্ছিল বরফে আছাড় খেয়ে পড়েছে। তার দামি ক্যামেরার এইখানেই ইতি। কমলের কাছে মাজহার হলো গুরুদেব। গুরুদেব আছাড় খেয়েছেন, সে এখনো খায় নি-এটা কেমন কথা! গুরুদেবের অসম্মান। কমল তার মেয়ে আরিয়ানানসহ গুরুদেবের সামনেই ইচ্ছা করে আছাড় খেয়ে লম্বা হয়ে পড়ে রইল।

চীন ভ্রমণ শেষে সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সবচে' আনন্দ পেয়েছে কী দেখে? গ্রেটওয়াল? ফরবিডেন সিটি, টেম্পেল অব হেভেন, সামার প্যালেস?

সবাই বলল, নিষিদ্ধ নগরে তুষারপাত।

তুষার সন্ধ্যা নিয়ে লেখা রবার্ট ফ্রস্টের প্রিয় কবিতাটি মনে পড়ে গেল।

STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
the darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.

The Woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

www.MurchOna.com

দীর্ঘতম কবরখানা

পৃথিবীর দীর্ঘতম কবরখানার দৈর্ঘ্য কত? পনেরশ" মাইল। আরো লম্বা ছিল-তিনহাজার নয়শ' চুরাশি মাইল। বর্তমানে অবশিষ্ট আছে পনেরশ' মাইল। চায়নার বিখ্যাত গ্রেটওয়ালের কথা বলছি। এই অর্থহীন দেয়াল তৈরি করতে এক লক্ষের উপর শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে। দেয়াল না বলে কবরখানা বলাই কি যুক্তিযুক্ত না!

অর্থহীন দেয়াল বলছি, কারণ যে উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছিল, মোঙ্গলদের হাত থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা, সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। মোঙ্গলরা এবং মাঞ্চুরিয়ার দুর্ধর্ষ গোত্র বারবারই দেয়াল অতিক্রম করেছে।

গ্রেটওয়াল বিষয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিচ্ছি। পবিত্র কোরআন শরীফের একটি সূরা আছে-সূরা কাহাফ। কাহাফের ভাষ্য অনুযায়ী অনেকে মনে করেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এই প্রাচীর নির্মাণ করেন।

ওরা বলল, 'হে জুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা এই শর্তে কর দেব যে, তুমি আমাদের এই ওদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবে।' (১৮:৯৪)

জুলকারনাইন স্থানীয় অধিবাসীদের শ্রমেই প্রাচীর তৈরি করে দেন।

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট যে আমাদের নবীদের একজন, এই তথ্য কি পাঠকরা জানেন? জুলকারনাইন হলেন আলেকজান্ডার দা গ্রেট।

চীনের ইতিহাস বলে মোট পাঁচ দফায় প্রাচীর তৈরি হয়। প্রথম শুরু হয় জিন ডায়ানেস্টির আমলে (Qin Dynasty), যিশুখ্রিষ্টের জন্মের ২০৮ বছর আগে। বর্তমানে যে প্রাচীর আছে তা তৈরি হয় সম্রাট হংথু (মিং ডায়ানেস্টি, ১৩৬৮ সন) - এর শাসনকালে। শেষ করেন সম্রাট ওয়ানলি (মিং ডায়ানেস্টি, ১৬৪০)।

প্রাচীরের গড় উচ্চতা ২৫ ফিট। তিন লক্ষ শ্রমিকের তিনশ" বছরের অর্থহীন শ্রম। কোনো মানে হয়? কোনো মানে হয় না। মানব সম্পদের এই অপচয় সম্রাটরাই করতে পারেন। রাজা-বাদশাদের কাছে সাধারণ মানুষের জীবন সব সময়ই মূল্যহীন ছিল।

আমরা আজ যাব দীর্ঘতম কবরখানা দেখতে। চীনের পরিচয় চীনের দেয়াল। সেই দেয়াল দেখা সহজ বিষয় না। আমার সফরসঙ্গীদের আনন্দ উত্তেজনায় টগবগ করার কথা। তারা কেমন যেন ঝিমিয়ে আছে। গা ছাড়া ভাব। কারণটা ধরতে পারলাম না।

www.MurchOna.com

এক পর্যায়ে মাজহার কাঁচুমাচু হয়ে বলল, গ্রেটওয়াল দেখার প্রোগ্রামটা আরেকদিন করলে কেমন হয়!

আমি বললাম, আজ অসুবিধা কী?

কোনো অসুবিধা নেই। গতকাল ফরবিডেন সিটি দেখে সবাই টায়ার্ড। আজকে বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হতো। মেয়েরা বিশেষ করে কাহিল হয়ে পড়েছে। নড়াচড়াই করতে পারছে না।

আমি বললাম, মেয়েরা যেহেতু ক্লান্ত তারা অবশ্যই বিশ্রাম করবে। গ্রেটওয়াল পালিয়ে যাচ্ছে না।

মাজহারের মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। একই সঙ্গে মেয়েদের মুখেও হাসি। একজন বলে ফেলল, দেরি করে লাভ নেই, চল রওনা দেই।

আমি বললাম, তোমাদের না রেস্ট নেবার কথা, যাচ্ছ কোথায়?

মেয়েদের মুখপাত্র হিসেবে মাজহার বলল, সিল্ক মার্কেটে টুকটাক মার্কেটিং করবে। মেয়েদের মার্কেটিং মানেই বিশ্রাম।

মেয়েরা বিপুল উৎসাহে বিশ্রাম করতে বের হলো। দুপুর দু'টা পর্যন্ত এই দোকান থেকে সেই দোকান, দোতলা থেকে সাততলা, সাততলা থেকে তিনতলা, তিনতলা থেকে আবার ছয়তলা করে বিশ্রাম করল। প্রত্যেকের হাতভর্তি নানান সাইজের ব্যাগ। দুপুরে দশ মিনিটের মধ্যে লাঞ্চ শেষ করে আবার বিশ্রামপর্ব শুরু হলো।

সিল্ক মার্কেটের যত আবর্জনা আছে, তার বেশির ভাগ আমরা কিনে ফেললাম। মেয়েরা দরদাম করতে পারছে এতেই খুশি। কী কিনছে এটা জরুরি না। আমি একবার ক্ষীণ স্বরে বললাম, যা কিনছ সবই ঢাকায় পাওয়া যায়। সবাই আমার কথা শুনে এমনভাবে তাকাল যেন এত অদ্ভুত কথা কখনো তারা শোনেনি।

আমি ক্লান্ত, এবং হতাশ। রাত দশটার আগে কারো বিশ্রাম শেষ হবে এমন মনে হলো না। বিশ্রামপর্ব দশটায় শেষ হবে, কারণ সিল্ক রোড বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি কী করব বুঝতে পারছি না। কিছুক্ষণ মেয়েদের কেনাকাটা দেখলাম। এর মধ্যে এরা কিছু চায়নিজও শিখে নিয়েছে। দোকানি বলছে, ইয়ি বাই। আরা লছে, উয়ু। জিজ্ঞেস করে জানলাম 'ইয়ি বাই' হলো একশ', আর 'উয়ু' হলো পাঁচ। মেয়েদের বিদেশী ভাষা শেখার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়ে নিজের মনে কিছুক্ষণ ঘুরলাম। একদিকে শিল্পীদের মেলা বসেছে। একজন হাতের বুড়ো আঙুলে চায়নিজ ইংক লাগিয়ে নিমিষের মধ্যে অতি অপূর্ব ছবি বানাচ্ছেন। আমার আগ্রহ দেখে তিনি আমার আঙুলে কালি লাগিয়ে কাগজ এগিয়ে দিলেন। আমি

অনেক চেষ্টা করেও কিছু দাঁড়া করতে পারলাম না। শিল্পী যেমন আছে ভাস্কর ও আছে। সিল্ক মার্কেটের এক কোনায় দেখি এক চাইনিজ বুড়ো একদলা মাটি নিয়ে বসে আছে। দুশ' ইয়েনের বিনিময়ে সে মাটি দিয়ে অবিকল মূর্তি বানিয়ে দেবে। তার সামনে বিশ মিনিট বসলেই হবে। বিশ মিনিট বসে বিশ্রাম নেবার সুযোগ পাওয়া যাবে ভেবেই বসলাম। একজন ভাস্কর কীভাবে কাজ করে তা দেখার আগ্রহ তো আছেই।

বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমাকে দেখে অতিদ্রুত মাটি ছানতে শুরু করল। কুড়ি মিনিটের জায়গায় আধঘন্টা পার হলো। মূর্তি তৈরি। আমি বললাম, কিছু মনে করো না, মূর্তিটা আমার না। চায়নিজ কোনো মানুষের।

মূর্তির চোখ পুতি পুতি। নাক দাবানো।

বুড়ো বলল, তোমার চেহারা তো পুরোপুরি চায়নিজদের মতো।

আমি বললাম, তাই না- কি?

বুড়ো বলল, অবশ্যই।

আশেপাশের সবাই বুড়োকে সমর্থন করল। আমিও নিশ্চিত হলাম আমার চেহারা চৈনিক। ইতিমধ্যে শাওন চলে এসেছে। তার কাছে ইয়েন যা ছিল সব শেষ। আমাকে যেতে হবে ডলার ভাঙাতে। সে বলল, তুমি চায়নিজ এক বুড়োর মূর্তি হাতে নিয়ে বসে আছে কেন?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, চায়নিজ বুড়ো তোমাকে কে বলল? এটা আমার নিজের ভাস্কর্য। উনি বানিয়েছেন। উনি একজন বিখ্যাত ভাস্কর।

কত নিয়েছে?

দুশ' ইয়েন।

আমাকে ডাকলে না কেন! আমি পঁচিশ ইয়েনে ব্যবস্থা করতাম।

বলেই সে দেরি করল না, দরাদরি শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবাক হয়ে দেখি, আমাদের মহান ভাস্কর ত্রিশ ইয়েনে শাওনের মূর্তি বানাতে রাজি হয়েছেন।

শাওন বলল, তুমি ডলার ভাঙিয়ে নিয়ে এসো, ততক্ষণ উনি আমার একটা মূর্তি বানাবেন। আমার খানিকক্ষণ রেষ্টও হবে। পা ফুলে গেছে।

ডলার ভাঙিয়ে ফিরে এসে দেখি, মহান ভাস্কর চায়নিজ এক মেয়ের মূর্তি বানিয়ে বসে আছেন। শাওন খুশি। মূর্তির কারণে না। শাওন খুশি কারণ মহান ভাস্কর তার মোটা নাককে শাওনের অনুরোধে খাড়া করে দিয়েছেন। চেহারা চায়নিজ মেয়েদের মতো হলো নাক তো খাড়া হয়েছে।

আমরা হোটেলে ফিরলাম রাত আটটায়। কে কী কিনল সব ডিসপ্লে করা

www.MurchOna.com

হলো। সবার ধারণা হলো তারা যা কিনেছে সেটা ভালো না। অন্যদেরটা ভালো। মাজহারের মুখ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। 'একটু আসছি' বলে সে বের হয়ে গেল। ফিরল রাত দশটায়। শাওন কিছু মুখোশ কিনেছে, যেগুলি সে কিনে নি। মাজহার গিয়েছিল ঐগুলি কিনতে।

আমি ঠাট্টা করছি না, সারাদিনের বিশ্রামের কারণে সব মেয়ের পা ফুলে গেল। তারা ঠিক করল ফুট ম্যাসাজ করাবে। হোটেলের কাছেই বিশাল ম্যাসাজ পার্লার।

ম্যাসাজের বিষয়টা এবার দেখছি। এক যুগ আগে ম্যাসাজ পার্লার চোখে পড়ে নি। আধুনিক চীনের অনেক রূপান্তরের এটি একটি। আমাদের হোটেল থেকে ম্যাগডোনাল্ড রেস্টুরেন্টের দূরত্ব দশ মিনিটের হাঁটা পথ। এরমধ্যে চারটা ম্যাসাজ পার্লার। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, ম্যাসাজ পার্লারে ম্যাসাজ নিচ্ছে চায়নিজরাই। কঠিন পরিশ্রমী চৈনিক জাতি গা টেপাটেপির ভক্ত হয়ে পড়েছে। মাও সে তুঙ-এর মাথায় নিশ্চয়ই এই জিনিস ছিল না।

রাস্তায় প্রসটিটিউটরাও নেমেছে। রূপবতী কন্যারা বিশেষ এক ধরনের কালো পোশাক পরে নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘুরছে। কেউ তাদেরকে নিয়ে বিব্রত বা চিন্তিত না। এমন একজনের পাল্লায় আমি নিজেও একদিন পড়েছিলাম। ঘটনাটা বলি, বাংলাদেশ অ্যাম্বেসির ফার্স্ট সেক্রেটারি আমাকে বইয়ের দোকানে নিয়ে যাচ্ছেন। দু'জন গল্প করতে করতে এগুচ্ছি, হঠাৎ কালো পোশাকের এক তরুণী এসে আমার হাত ধরল। আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। রূপবতী এক তরুণী। মায়া মায়া চেহারা। সে আদুরে গলায় বলল, আমাকে তুমি তোমার হোটেলে নিয়ে চল। আমি ম্যাসাজ দেব। বলেই চোখে কুৎসিত ইশারা করল। এমন নোংরা ইশারা চোখে করা যায় আমার জানা ছিল না। আমি হতভম্ব।

মনিরুল হক ধমক দিয়ে মেয়েটিকে সরিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, বর্তমান চীনে এই বিষয়টা খুব বেড়েছে। আমি বললাম, পুলিশ কিছু বলে না? মনিরুল হক বললেন, না।

পার্ল এস বাকের 'গুড আর্থের' চীন এবং বর্তমান চীন এক না। এই দেশ আরো অনেকদূর যাবে। ক্ষমতায় ও শক্তিতে পাল্লা দেবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। মানুষ বদলাবে, মূল্যবোধ বদলাবে। ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিলে আলো-হাওয়া যেমন ঢোকে-কিছু মশা-মাছিও ঢোকে। মহান চীন তার দরজা-জানালা খুলে দিয়েছে। আলো-হাওয়া এবং মশা-মাছি ঢুকছে।

মূল গল্পে ফিরে আসি। পরের দিন গ্রেটওয়াল দেখতে যাবার কথা, যাওয়া

www.MurchOna.com

হলো না, কারণ সফরসঙ্গীরা যে যার মতো মার্কেটে চলে গেছে। সবাই বলে গেছে এক ঘন্টার মধ্যে ফিরবে। তারা ফিরল সন্ধ্যায়। প্রত্যেকের হাতভর্তি ব্যাগ। মুখে বিজয়ীর হাসি।

শেষ পর্যন্ত গ্রেটওয়াল দেখা হলো। সেও এক ইতিহাস। ব্যবস্থা করল এক ট্যুর কোম্পানি। তারা গ্রেটওয়াল দেখাবে। ফাও হিসেবে আরো কিছু দেখাবে ফ্রি। জনপ্রতি ভাড়া একশ' ডলার। সেখানেও দরাদরি। কী বিপদজনক দেশে এসে পৌঁছলাম! একেকবারে আমরা বলছি-'না, পোষাচ্ছে না।' বলে চলে আসার উপক্রম করতেই তারা বলে, 'একটু দাঁড়াও, ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলে দেখি।' তারা চ্যাঁও টু করে কিছুক্ষণ কথা বলে, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'ম্যানেজমেন্ট আরো দু'ডলার করে কমাতে রাজি হয়েছে।'

শেষ পর্যন্ত ১০০ ডলার ভাড়া কমিয়ে আমরা ত্রিশ ডলারে নিয়ে এলাম। বাচ্চাদের টিকিটি লাগবে না। তারা ফ্রি। ট্যুর কোম্পানির রূপবতী অপারেটর নিচু গলায় বলল, তোমাদের যে এত সস্তায় নিয়ে যাচ্ছি খবরদার এটা যেন অন্য ট্যুরিস্টরা না জানে। জানলে কোম্পানি বিরাট বিপদে পড়ে যাবে।

ট্যুর কোম্পানির বাসে উঠার পরে জানলাম, ট্যুরিস্টরা যাচ্ছে বিশ ডলার করে। একমাত্র আমরা ত্রিশ ডলার। অস্ট্রেলিয়ার এক গাধা সাহেব-মেম শুধু একশ' ডলার করে টিকিট কেটেছে। অস্ট্রেলিয়ার সেই গাধা দম্পত্তির সঙ্গে আমরা ভালো খাতির হয়েছিল। আমরা একসঙ্গে চায়নিজ হার্বাল চিকিৎসা নিয়েছি, সেই প্রসঙ্গে পরে আসব।

কোম্পানির বাস সরাসরি আমাদের গ্রেটওয়ালে নিয়ে গেল না। জেড তৈরির এক কারখানায় এন ছেড়ে দিল। যদি আমরা জেডের তৈরি কিছু কিনতে চাই। ট্যুর কোম্পানির সঙ্গে জেড কারখানার বন্দোবস্ত করা আছে। ট্যুর কোম্পানি যাত্রীদের এনে এখানে ছেড়ে দেবে। কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য হবে। বিনিময় কমিশন।

পাঠকদের মধ্যে যারা আগ্রার তাজমহল দেখেছেন, তারা এই বিষয়টি জানেন। তাজমহল দর্শনার্থীরা সরাসরি তাজ দেখতে যেতে পারেন না। তাদেরকে মিনি তাজ বলে এক বস্তু প্রথমে দেখতে হয়। সেখানকার লোকজন সবাই কথাশিল্পী। তাদের কথার জালে মুগ্ধ হয়ে মিনি তাজ কিনতে হয়। সেই মিনি তাজ আজ পর্যন্ত কেউ অক্ষত অবস্থায় বাংলাদেশে আনতে পারেন নি। বর্ডার পার হবার আগেই অবধারিতভাবে সেই তাজ ভেঙে কয়েক টুকরা হবেই।

জেড এম্পোরিয়াম থেকে কেনাকাটা শেষ করে বাসে উঠলাম, ভাবলাম এইবার বোধহয় গ্রেটওয়াল দেখা হবে। ঘণ্টাখানিক চলার পর বাস থামল আরেক

www.MurchOna.com

দোকানে। এটা না-কি সরকার নিয়ন্ত্রিত মুক্তার কারখানা। ঝিনুক চাষ করা হয়। ঝিনুক থেকে মুক্তা বের করে পালিশ করা হয়-নানান কর্মকাণ্ড।

একজন মুক্তা বিশেষজ্ঞ সব ট্যুরিস্টকে একত্র করে মুক্তার উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিলেন। মুক্তার প্রকারভেদ, ঔজ্জল্য, এইসব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করে তিনি ঘোষণা করলেন-এইবার আপনাদের সামনে আমি একটা ঝিনুক খুলব। আপনারা অনুমান করবেন ঝিনুকের ভেতর মুক্তার সংখ্যা কত। যার অনুমান সঠিক হবে তাকে আমাদের পক্ষ থেকে একটা মুক্ত উপহার দেয়া হবে। এইখানেই শেষ না, আপনাদের ভেতর যেসব মহিলা ট্যুরিষ্ট আছেন তাদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা। সবচে' রূপবতীকেও একটা মুক্তা উপহার দেয়া হবে।

মেয়েদের মধ্যে টেনশন এবং উত্তেজনা। মেকাপ ঠিক করা দরকার। সেই সুযোগ কি আছে?

চায়নিজ ভদ্রলোক (চেহারা অবিকল অভিনেতা ব্রুসলির মতো) বড় সাইজের একটা ঝিনুক তুলে আমাকেই প্রথম জিজ্ঞেস করলেন, বলো এর ভেতর ক'টা মুক্তা?

একটা ঝিনুকে একটাই মুক্তা থাকার কথা। এরকমই তো জানতাম। আমি বললাম, একটা।

সফরসঙ্গীরা আমাকে নানান বিষয়ে জ্ঞানী ভাবে। তারা মনে করল এটাই সত্যি উত্তর। প্রত্যেকেই বলল, একটা শুধু বলেই ক্ষান্ত হলো না, জ্ঞানীর হাসিও হাসল। যে হাসির অর্থ-কী ধরা তো খেলে! এখন দাও সবাইকে একটা করে মুক্তা।

সফরসঙ্গীদের মধ্যে শুধু চ্যালেঞ্জার বলল, সতেরোটা। চ্যালেঞ্জারের বোকামিতে আমরা সবাই যথেষ্ট বিরক্ত হলাম।

ঝিনুক খোলা হলো। ঝিনুক ভর্তি মুক্তা। মুক্তা গোনা হলো এবং দেখা গেল মুক্তার সংখ্যা ১৭। কাকতালীয় এই ঘটনার ব্যাখ্যা আমি জানি না। আমি আমার এক জীবনে অনেক কাকতালীয় ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। এটি তার একটি। চ্যালেঞ্জারকে একটা বড়সড় মুক্তা দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জারের চোখে পানি। তার চোখের অশ্রু গ্ল্যান্ডে মনে হয় কোনো সমস্যা আছে, সে কারণে এবং সম্পূর্ণ অকারণে চোখ থেকে এক দেড় লিটার পানি ফেলতে পারে।

শ্রেষ্ঠ রূপবতীর পুরস্কার পেল শাওন। সে এমন এক ভঙ্গি করল যেন শেষ মুহূর্তে সে বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় রানার্স আপকে পরাজিত করে সোনার মুকুট জিতে নিয়েছে।

www.MurchOna.com

কমল তার স্ত্রীর উপর খুব রাগ করল, ধমক দিয়ে বলল, কোথাও বেড়াতে গেলে সাজগোজ করে বের হবে না? ঢাকা থেকে তো দুনিয়ার সাজের জিনিস নিয়ে এসেছ, এখন ঘুরছ ফকিরনীর মতো।

মুক্তা বিষয়ক জটিলতা শেষ করে বাস ছুটছে গ্রেটওয়ালের দিকে। একসময় থামল। আমরা কৌতূহলী হয়ে তাকালাম। কোথায় গ্রেটওয়াল? চায়নিজ হার্বাল মেডিসিনের বিশাল দালান। হার্বাল বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে না-কি হার্বাল মেডিসিনের কিংবদন্তি ডাক্তারেরা আমাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করবেন। শুধু ওষুধপত্র নগদ ডলারে কিংবা ক্রেডিট কার্ডে কিনতে হবে।

ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয় বনাম বাংলাদেশের কয়েকজন গবেট

ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বাস থেমেছে, আমরা হৈচৈ করে নামছি। ওম্নি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা ছুটে এলেন। চাপা গলায় নিখুঁত ইংরেজিতে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। ক্লাস চলছে, অধ্যাপকরা গবেষণা করছেন। হৈচৈ চলবে না। পিন পাতনিক নৈঃশব্দ্য বজায় রাখতে হবে।

আমরা গেলাম ঘাবড়ে। মায়েরা নিজেদের বাচ্চাদের মুখ চেপে ধরলেন। এ-কী ঝামেলা! রওনা হয়েছি গ্রেট ওয়াল দেখতে, এ কোন চক্করে এসে পড়লাম?

বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা আমাদের হলঘরের মতো ঘরে দাঁড় করিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। হলঘরের চারপাশে নানান ধরনের ভেষজ গাছ। প্রতিটির গায়ে চায়নিজ নাম, বোটানিকেল নাম। দু'টি গাছ চিনলাম। একটি আমাদের অতিপরিচিত ঘৃতকুমারী,, অন্যটা জিনসেং, যৌবন ধরে রাখার ওষুধ। দেয়ালে বিশালাকৃতির ছবি। একটিতে মাও সে তুং ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন। অন্য একটিতে (World Health Organization -এর প্রধানের সঙ্গে হাসি হাসি মুখে কী যেন আলোচনা করছেন। বিদেশী যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভেষজ বিদ্যা শিখতে এসেছে তাদের ছবিও আছে।

হলঘরের এক প্রান্তে অতি বৃদ্ধ এক চায়নিজের মর্মর পাথরের মূর্তি। ভারতবর্ষের ভেষজ বিজ্ঞানের জনক যেমন মহর্ষি চরক, এই চায়নিজ বৃদ্ধও (নাম মনে নেই) চৈনিক ভেষজ বিজ্ঞানের জনক। সফর সঙ্গীরা চৈনিক ভেষজ বিজ্ঞানীরা সামনে নানান ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। আমি ভাবছি কখন এই চক্কর থেকে উদ্ধার পাব।

মিনিট পাঁচেক পার হলো, এক অতি স্মার্ট তরুণী ঢুকল। সে পোশাকে স্মার্ট।

www.MurchOna.com

ইংরেজি কথা বলায় স্মার্ট। পুরো চীন ভ্রমণে আমার দেখা মতো সবচে' স্মার্ট তরুণী। সে আমাদের একটি সুসংবাদ দিল।

সুসংবাদটা হচ্ছে, ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাজ্ঞানী চিকিৎসকরা বিনামূল্যে আমাদের শরীরের অবস্থা দেখতে রাজি হয়েছে। আমরা যে অতি দূরদেশ থেকে এখানে এসেছি, ভেষজ চিকিৎসা সম্পর্কে আগ্রহ দেখাচ্ছি, তার কারণেই আমাদের প্রতি এই দয়া।

আমরা কৃতজ্ঞতায় ছোট হয়ে গেলাম এবং ভেষজ চিকিৎসকদের মহানুভবতায় হলাম মুগ্ধ ও বিস্মিত।

আমাদের একটা ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। স্মার্ট তরুণী ব্যাখ্যা করলেন আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র, বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক, কী করে আমাদের জীবনীশক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিচ্ছে। ভেষজ বিজ্ঞানই আমাদের একমাত্র পরিত্রাতা। তিনি জানালেন, তিনজন চিকিৎসক একসঙ্গে ঘরে ঢুকবেন। তাঁরা কেউ চৈনিক ভাষা ছাড়া কিছুই জানেন না। সবার সঙ্গে একজন করে ইন্টরপ্রেটার থাকবে।

মহান চিকিৎসকরা আমাদের মল-মূত্র কফ কিছুই পরীক্ষা করবেন না। নাড়ি দেখে সব বলে দেবেন।

আমরা আবারো অভিভূত।

নাড়ি দেখে রোগ নির্ণয় বিষয়ে তারাশংকরের বিখ্যাত উপন্যাস আছে- 'আরোগ্য নিকেতন'। সেই উপন্যাসের আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কবিরাজ নাড়ি দেখে মৃত্যুব্যাধি ধরতে পারতেন। আমার ভেতর রোমাঞ্চ হলো এই ভেবে যে, উপন্যাসের একটি চরিত্র বাস্তবে দেখব।

স্মার্ট তরুণী বললেন, মহান ভেষজবিদের সম্বন্ধে শেষ কথা বলে বিদায় নিচ্ছি। আধুনিক ডাক্তাররা নাড়ি ধরে শুধু Pulse beat শোনে। আমাদের মহান শিক্ষাগুরুরা নাড়ি ধরেই হার্ট, লিভার, কিডনি এবং রক্ত সঞ্চালন ধরেন। প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের এই হলো মহত্ত্ব। এই বিদ্যা হারিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয় তা পুনরুদ্ধার করেছে। আপনারা কি এই আনন্দ সংবাদে হাততালি দিবেন?

আমরা মহা উৎসাহে হাততালি দিলাম।

স্মার্ট তরুণী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমাদের মহান চিকিৎসকরা প্রবেশ করছেন, আপনারা যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে আচরণ করবেন, এই আমার বিনীত অনুরোধ।

www.MurchOna.com

দরবারে মহারাজার প্রবেশের মতো দুই বৃদ্ধ এক বৃদ্ধা প্রবেশ করলেন। দেখেই মনে হচ্ছে-তাদের জীবন থেকে রস কষ নিঃশেষ হয়ে গেছে। চোখে মুখে ক্লান্তি ও হতাশা।

আমরা সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলাম। তারা তিনজনই বিড়বিড় করে কী যেন বললেন।

স্মার্ট তরুণী বললেন, আপনারা তিনজন করে আসুন। আপনাদের কী অসুখ কিছুই বলতে হবে না। উনারা নাড়ি ধরে সব জানবেন।

প্রথমে গেলাম আমি, মাজহার এবং কমল। তিনজনেরই বুক ধড়ফড় করছে- না জানি কী ব্যাধি ধরা পড়ে।

বৃদ্ধ ভেষজ মহাজ্ঞানী অনেকক্ষণ আমার নাড়ি ধরে ঝিম ধরে রইলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, হার্টের অসুখ।

আমি তাঁর ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে ঘনঘন কয়েকবার হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

তিনি বললেন, আগে আমাদের কাছে এলে বুক কেটে চিকিৎসা করার প্রয়োজন হতো না।

আমি আরো মুগ্ধ। এই জ্ঞানবৃদ্ধ নাড়ি ধরে জেনে ফেলেছেন যে আমার বাইপাস হয়েছে। কী আশ্চর্য!

তোমার রক্ত দূষিত। রক্ত নষ্ট হয়ে গেছে। রক্ত ঠিক করতে হবে।

আপনি দয়া করে ঠিক করে দিন।

স্নায়ুতন্ত্রেও সমস্যা। রক্তের সঙ্গে স্নায়ু ঠিক করতে হবে।

আপনি দয়া করে ঠিক করে দিন।

আমি প্রেসক্রিপশন দিচ্ছি। ছ'মাস ওষুধ খেতে হবে। তোমার সমস্যা মূল থেকে দূর করা হবে।

ধন্যবাদ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ওষুধগুলি ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রাগ স্টোর ছাড়া কোথাও পাবে না। তোমার ভদ্রতা এবং ভেষজ বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস আমাকে মুগ্ধ করেছে বিধায় তুমি বিশেষ কমিশনে ওষুধগুলি পাবে। দামটা দিবে ডলারে। ডলার না থাকলে ক্রেডিট কার্ড।

আমি উনার হাতে ক্রেডিট কার্ড তুলে দিলাম। একবার মনে হলো পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলি।

উনার কাছ থেকে বের হয়ে আমি দলের অন্যদের মুগ্ধ গলায় মহান ভেষজ

বিজ্ঞানীরা নাড়িজ্ঞানের কথা বললাম। কী করে নাড়িতে হাত দিয়েই তিনি আমার বাইপাসের কথা বলে ফেললেন সেই গল্প।

শাওন বলল, তোমার যে বাইপাস হয়েছে এটা বলার জন্যে কোনো ভেষজ বিজ্ঞানী লাগে না। যে কেউ বলতে পারে।

আমি বললাম, কীভাবে?

তোমার বুক যে কাটা এটা শার্টের কলারের ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যে হাতে নাড়ি ধরা হয়েছে সেই হাতও কাটা। হাত কেটে রগ নেয়া হয়েছে।

আমি থমকে গেলাম। শাওন বলল, তুমি কি ওষুধ কেনার জন্যে টাকা পয়সা দিয়েছ?

আমি মিনমিন করে বললাম, হ্যাঁ।

কত দিয়েছ?

কত এখনো জানি না, ক্রেডিট কার্ড নিয়ে গেছে।

শাওন বলল, কী সর্বনাশ!

আমি বিড়বিড় করে বললাম, সর্বনাশ তো বটেই।

মাজহারের সঙ্গে ডাক্তারের কথাবার্তা এখন তুলে দিচ্ছি।

ডাক্তার : হুঁ হুঁ। তোমার কিডনি প্রায় শেষ। এখন রক্ষা না করলে আর রক্ষা হবে না।

মাজহার : বলেন কী!

ডাক্তার : তোমার মাথায় চুল যে নেই তার কারণ কিডনি।

মাজহার : আপনার মাথায়ও তো কোনো চুল নেই। আপনারও কি কিডনি সমস্যা?

ডাক্তার : (চুপ)

মাজহার : আপনি আপনার নিজের কিডনির চিকিৎসা কেন করছেন না?

ডাক্তার : তোমার যা দেখার দেখেছি Next যে তাকে পাঠাও।

মাজহারের নির্বুদ্ধিতার অনেক গল্প আছে। তার বুদ্ধিমত্তার এই গল্পটি আমি অনেকের সঙ্গেই আগ্রহের সঙ্গে করি।

কমলের বেলাতেও দেখা গেল তার রক্ত দূষিত। লিভার অকার্যকর, স্নায়ুতন্ত্রে ঝিমুনি। কমল জীবন সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়ল। সে বলল, আমি যে গাড়িতে উঠেই ঘুমিয়ে পড়ি, এখন তার কারণ বুঝলাম। আমার স্নায়ুতন্ত্রেই ঝিমুনি।

আমি ছাড়া পুরো দলের কেউ এক ডলারের ওষুধও কিনল না। কমল কিনতে

www.MurchOna.com

চাচ্ছিল, মাজহারের ধমকে চুপ করে গেল। আমি চারশ' ডলারের ওষুধ কিনলাম। অস্ট্রেলিয়ান গাধাটারও নাকি কমলের মতো সমস্যা-রক্ত দূষিত, লিভার অকার্যকর, স্নায়ুতন্ত্রে ঝিমুনি। সে কিনল এক হাজার ডলারের ওষুধ। ছয়মাসের সাপ্লাই।

চারশ' ডলারের ওষুধের এক পুরিয়াও আমি খাই নি। নিজের বোকামির নির্দশন হিসেবে জমা রেখে দিয়েছি। পাঠকদের জন্যে তার একটা ছবি দেয়া হলো।

ভেষজ বৃক্ষ নিয়ে আমার নিজের যথেষ্টই উৎসাহ আছে। নুহাশ পল্লীতে যে ভেষজ উদ্যান তৈরি করেছি তাতে ২৪০ প্রজাতির গাছ আছে। তারপরেও বলছি, এই শতকে এসে পুরনো গাছগাছড়ায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা হাস্যকর। গাছগাছড়া থেকেই আমরা আধুনিক ওষুধে এসেছি। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিজ্ঞান। শত শত বৎসরের সাধনায় এই বিজ্ঞান বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। এখান থেকে আরো অনেকদূর যাবে। একে অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস কারোই থাকা উচিত নয়।

প্রাচীন চৈনিক ভেষজ বিজ্ঞান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতার ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। সম্রাটরা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন নিজেদের স্বার্থে। তারা চেয়েছেন অমরতা, ভোগ করার ক্ষমতা। প্রাচীন ভেষজ বিজ্ঞান সম্রাটদের অমরত্বের ওষুধ দিতে পারে নি। চিরস্থায়ী যৌবনের ওষুধও দিতে পারে নি। আমার ধারণা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কোনো একদিন পারবে।

চেঙ্গিজ খাঁ'র সঙ্গে চীন দেশীয় চারজন ভেষজ বিজ্ঞানীরা সাক্ষাৎকার বিষয়ক একটি গল্প বলি।

চেঙ্গিজ খা বৃদ্ধ এবং অশক্ত। মৃত্যুভীতি ঢুকে গেছে। তিনি মৃত্যু নিবারক ওষুধ চান। অর্থ যা প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি দেয়া হবে, ওষুধ চাই। বার্ধক্য রোধ করতে পারে, এমন ওষুধ কি পাওয়া যাবে?

চেঙ্গিজ খা বললেন, পারবেন আপনারা বানিয়ে দিতে?

চারজনের মধ্যে তিনজনই বললেন, অবশ্যই পারব। বিশেষ বিশেষ লতাগুল্ম আছে। সময় লাগবে। একেক গুল্ম একেক সময়ে জন্মায়। তবে পারব। না পারার কিছু নেই।

শুধু একজন বললেন, জরা ও মৃত্যু জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। একে কিছুতেই আটকানো যাবে না।

চেঙ্গিজ খা সেই চিকিৎসককে বললেন, ধন্যবাদ। বাকি তিনজনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন।

www.MurchOna.com

ভালো কথা, আমরা যে তিনজনের পাল্লায় পড়েছিলাম তারা কোন দলের?

পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। চারশ' ডলারের ওষুধের বস্তা হাতে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি এবার সত্যি সত্যি গ্রেটওয়ালের কাছে এনে রাখল।

সবার মনে আনন্দ। শুধু আমার এবং কমলের মন ভালো না। কমলের মন ভালো নেই, কারণ মাজহারের চোখ রাঙানির কারণে তার চিকিৎসা হয় নি।

আমার মন ভালো নেই, কারণ আমার চিকিৎসা হয়েছে।

সফরসঙ্গীরা হৈ হৈ করে গ্রেটওয়ালে ছোটাছুটি করছে। তাদের ক্যামেরা বিরামহীনভাবে ক্লিক ক্লিক করছে। গ্রেটওয়াল না, গ্রেটওয়ালের পাশে তাদেরকে কেমন দেখাচ্ছে এটা নিয়েই তারা চিন্তিত।

সবাইকেই অন্যরকম লাগছিল। দিন শেষের সূর্যের আলো পড়েছে তাদের মুখে। বিশাল গ্রেটওয়ার দিগন্তে মিশে আছে, মনে হচ্ছে বিশাল এক নদী। দৃশ্যটা একই সঙ্গে সুন্দর এবং মন খারাপ করিয়ে দেবার মতো।

গ্রেটওয়ালের এক কোনায় দেখি, দানবের মতো সাইজের এক মঙ্গোলিয়ান ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার মালিক ইয়েনের বিনিময়ে দর্শনার্থীদের ঘোড়ায় চড়াচ্ছেন।

গ্রেটওয়াল দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছি ঘোড়া দেখে তেমন মুগ্ধ হলাম। যেন পাথরে তৈরি ভাস্কর্য। নিঃশ্বাসও ফেলছে না এমন অবস্থা। আমি এক ঘন্টার চুক্তি করে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। কমল ছুটে এসে বলল, এক-কী হুমায়ূন ভাই, ঘোড়ায় বসে আছেন কেন?

আমি বললাম, ঘোড়া আমার অতি পছন্দের একটি প্রাণী। নুহাশ পল্লীতে আমার দু'টা ঘোড়া ছিল। সে বলল, সবাই গ্রেটওয়ালে ছোটাছুটি করছে, আর আপনি ঝিম ধরে ঘোড়ায় বসে আছেন, এটা কেমন কথা?

আমি নামলাম না। বসেই রইলাম। দুর্ধর্ষ মোঙ্গলরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যখন ছুটে যেত তখন তাদের কেমন লাগত ভাবতে চেষ্টা করলাম।

পাখি উড়ে চলে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে। মোঙ্গলরা নেই, তাদের ভগ্নস্বপ্ন পড়ে আছে।

টুরিস্টের চোখে

টুরিস্টদের দেশ ভ্রমণের কিছু নিয়ম আছে। তারা প্রতিটি দর্শনীয় জায়গায় যাবে। যা দেখবে তাতেই মুগ্ধ হবে। মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই, পয়সা উসুল করার ব্যাপার আছে। মুগ্ধ হওয়া মানে পয়সা উসুল হওয়া।

www.MurchOna.com

প্রতিটি দর্শনীয় স্থানে তারা কতক্ষণ থাকবে তারও নিয়ম আছে। ক্যামেরায় যতক্ষণ ফিল্ম আছে ততক্ষণ। ফিল্ম শেষ হওয়া মানে দেখা শেষ। আজকাল ডিজিটাল ক্যামেরা বের হয়ে নতুন যন্ত্রণা হয়েছে। এইসব ক্যামেরায় ফিল্ম লাগে না। যত ইচ্ছা ক্যামেরায় ক্লিক ক্লিক করে যাও।

আমরা বেইজিং-এর দর্শনীয় স্থান সবই দেখে ফেললাম।

গ্রীষ্ম প্রাসাদ (Summer Palace)

UNESCO ১৯৯৮ সনে সামার প্যালেসকে World Heritage- এর লিস্টে স্থান দিয়েছে। গ্রীষ্ম প্রাসাদ দেখে সবাই মুগ্ধ। মুগ্ধ হবারই কথা। সম্রাটরা রাজকোষ ঢেলে দিয়েছেন নিজের গ্রীষ্ম প্রাসাদ বানাতে। সম্রাটরা গরমে কষ্ট করবেন তা কী করে হয়? গরমের সময় Kuming Lake- এর সুশীতল হাওয়া ভেসে আসে। কী শান্তি!

বিকেলে সম্রাট বা সম্রাট পত্নীর লেকের পাশে হাঁটতে ইচ্ছা হতে পারে। তার জন্যে তৈরি হলো হাঁটার পথ Long Corridor অর্থের কী বিপুল অর্থহীন অপচয়! সম্রাট পত্নী লেকের হাওয়া খাবেন। সহজ ব্যাপার না। সম্রাট পত্নীর কথা লিখলাম, কারণ গ্রীষ্ম প্রাসাদ সম্রাট পত্নী Dawager Cixi'র শখ মেটানোর জন্যে ১৮৬০ সনে বানানো হয়।

পাঠকরা কি অনুমান করতে পারবেন গ্রীষ্ম প্রাসাদের মূল অংশ কোনটা? মূল অংশ দীর্ঘজীবী ভবন। যেখানে সম্রাট এবং সম্রাট পত্নীর দীর্ঘজীবনের জন্য মন্ত্র পাঠ করতে হয়। দীর্ঘদিন বেঁচে না থাকলে কে ভোগ করবে? সম্রাটদের জীবনের মূলমন্ত্র তো একটাই -ভোগ।

গ্রীষ্ম প্রাসাদে আমার কাছে ভালো লেগেছে মার্বেলের বজরা। অতি দামি মার্বেলে বিশাল এক বজরা বানিয়ে পানিতে ভাসানোর বুদ্ধি কার মাথায় এসেছিল- এটা এখন আর জানা যাবে না। যার মাথায় এসেছিল, তার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতেই হয়।

আগেই বলেছি আমরা বেড়াতে গেছি শীতকালে। কিউমিং লেকের পুরোটাই তখন জমে বরফ। দেখে মনে হবে বরফের জমাট সমুদ্র। সেখানে ছেলেমেয়েরা মনের আনন্দে দৌড়াচ্ছে। শাওনের শখ হলো বরফের উপর হাঁটবে। সে বলল, আমি জীবনে এই প্রথম লেক জমে বরফ হতে দেখলাম। এর উপর হাঁটব না! তাকে আটকালাম। সে বরফের লেকে নামলেই অন্যসব মেয়েরা নামবে। তাদের সঙ্গে বাচ্চারা নামবে এবং অবধারিতভাবে আছাড় খেয়ে কেউ না কেউ কোমর

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

ভাঙবে। শাওন এবং স্বর্ণা দু'জনই সন্তানসম্ভবা। তাদের পেটের সন্তানরা মায়ের আছাড় খাওয়াকে ভালোভাবে নেবে-এরকম মনে করার কারণ নেই।

এদিকে অমিয় খুবই যন্ত্রণা করেছে। বানরের মতো বাবার গলা ধরে ঝুলে আছে তো আছেই। গলা ছাড়ছে না। উদ্ভট উদ্ভট আবদারও করছে। তার আবদারে আমরা সবাই মহাবিরক্ত, শুধু মাজহার খুশি। তার ধারণা এতে ছেলের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাচ্ছে। অমিয়'র উদ্ভট আবদারের নমুনা দেই-পাথরের বজরা দেখে সে ঘোষণা করল, এই বজরায় চড়ে সে ঘুরবে। কাজটা এক্ষুণি করতে হবে।

মাজহার আনন্দিত গলায় আমাকে বলল, ছেলের বুদ্ধি দেখেছেন হুমায়ূন ভাই। পুরা বজরা পাথরের তৈরি, অথচ ছেলে দেখামাত্র বুঝে ফেলেছে এটা পানিতে ভাসে।

এক চায়নিজ শিশু আমাদের দেশের হাওয়াই মিঠাই টাইপ একটা খাবার খেতে খেতে যাচ্ছিল। হঠাৎ অমিয় ছোঁ মেরে তার হাত থেকে এটা নিয়ে নিজে খেতে শুরু করল। আমরা সবাই বিব্রত, শুধু মাজহারের মুখে গর্বের হাসি। মাজহার আমাকে বলল, আমার ছেলের অধিকার আদায়ের চেষ্টাটা দেখে ভালো লাগছে। সাহসী ছেলে। অন্য একজন খাচ্ছে, আমি কেন খাব না! এটাই তার spirit. মাশাল্লাহ।

আমাদের দলে দু'টা শিশু। অতি দুষ্ট অমিয়, অতি শিষ্ট আরিয়ানা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পুরো চায়না ট্রিপে দেখেছি চায়নিজ তরুণীরা অমিয়কে নিয়ে মহাব্যস্ত। তারা আরিয়ানার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। কত মেয়েই না ছোঁ মেরে অমিয়কে কোলে তুলল! কত না আদর! চকলেট গিফট লজেন্স গিফট। অথচ পাশেই পরী শিশুর মতো আরিয়ানা মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে।

মূল বিষয়টা পুরুষ সন্তানের প্রতি চায় নিজদের গভীর প্রীতি। আধুনিক চায়নায় একটির বেশি সন্তান নেয়া যাবে না। আইন কঠিন। সেই একটি সন্তান সবাই চায় পুত্র। কন্যা নয়। যাদের ভাগ্যে কন্যা জোটে, তারা কপাল চাপড়ায় এবং অন্যের পুত্রসন্তানদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। দুঃখজনক পরিস্থিতি! এই পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। আলট্রাসনোগ্রাফির কারণে গর্ভবতী মায়েরা আগেই জেনে যাচ্ছেন সন্তান ছেলে না মেয়ে। যখনই জানছেন মেয়ে, গর্ভ নষ্ট করে ফেলছেন। পরের বার যদি পুত্র হয় তখন দেখা যাবে।

গর্ভ নষ্ট বিষয়ে কঠিন আইনকানুন না হলে এক সন্তানের দেশ মহান চীন আগামী একশ' বছরের নারীশূন্য হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

www.MurchOna.com

স্বর্গ মন্দির (Temple of Heaven)

চীনা সম্রাটরা নিজেদের স্বর্গের পুত্র ভাবতেন। ধুলোমাটির পৃথিবীতে তাদের আসতে হয়েছে 'প্রজা' নামক একটা শ্রেণীর দেখভালের জন্যে। স্বর্গের পুত্ররা প্রার্থনা করবেন, সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হবে না এটা কেমন কথা?

স্বর্গ মন্দিরে ভালো ফসল যেন হয় তার জন্যে প্রার্থনা করা হতো। সমস্যা হচ্ছে, স্বর্গ পুত্র প্রার্থনা করছেন তারপরও প্রার্থনা গ্রাহ্য হচ্ছে না, ফসল নষ্ট হচ্ছে, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, এটা কেমন কথা!

স্বর্গ পুত্রদের কাছে এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর আছে। প্রার্থনায় কোনো একটা ত্রুটি হয়েছে। নিয়মকানুন ঠিকমতো মানা হয় নি।

১৯৯৮ সালে UNESCO স্বর্গ মন্দিরকে World Heritage - এর আওতায় নিয়ে আসে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, পাঠকরা কি জানেন বাংলাদেশের একটা জায়গা UNESCO'র World Heritage- এর লিস্টে আছে? যারা জানেন তারা তো জানেনই। যারা জানেন না তাদের জন্যে একটা কুইজ।

হঠাৎ বাংলাদেশের প্রসঙ্গ কেন নিয়ে এলাম? স্বর্গ মন্দির, মিং রাজার কবরখানা নিয়ে ভালো লাগছে না। একটা দেখলেই সব দেখা হয়ে গেল। সব প্রসাদের একই ডিজাইন। একটাই বিশেষত্ব তার বিশালত্ব। সম্রাটরা কখনো ছোটো কোনো চিন্তা করতে পারেন না। আমার প্রাসাদ হবে সবচে' বড়। দেখে যেন সবার পিলে চমকে যায়। চীনের ডায়ানেস্টিরা পিলে চমকানোর ব্যবস্থাই করেছেন। এর বেশি কিছু না।

রাজা-বাদশার ভোগ বিলাসের আয়োজন দেখে আমি মুগ্ধ হই না, এক ধরনের বিতৃষ্ণা অনুভব করি। এক যুগ আগে যখন চীনে প্রথম এসেছিলাম, তখন মিং সম্রাটের বালিশের মিউজিয়াম দেখেছিলাম। ঘুমুবার সময় তাঁর কয়টা বালিশ লাগত তার সংগ্রহ। এর মধ্যে পিরিচের সাইজের দু'টা গোলাকার বালিশ দেখে প্রশ্ন করেছিলাম-এই বালিশ দু'টা কেন?

গাইড বলল, সম্রাটের কানের লতি রাখার বালিশ।

আমি মনে মনে বললাম, মাশাল্লাহ। সম্রাটের কানের লতির গতি হোক। আমি এর মধ্যে নেই।

শিক্ষার জন্যে সুদূর চীনে যাও

আমাদের নবী (স.)-র কথা। একজন মওলানা আমাকে বলেছিলেন-এই শিক্ষা ধর্ম শিক্ষা। অন্য কোনো শিক্ষা না। মওলানাকে বলতে পারি নি যে, চীনে ইসলাম

ধর্ম গিয়েছে নবীজির মৃত্যুর পর। ধর্ম শিক্ষার জন্যে চীনে যেতে হলে অন্য কোনো ধর্ম শিক্ষার জন্যে যেতে হয়।

যাই হোক, প্রথমবার চীনে গিয়ে একটা মসজিদে গিয়েছিলাম। মসজিদের ভিজিটার্স বুক আছে। ভিজিটার্স বুকে নাম সই করতে গিয়ে দেখি, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবও এই মসজিদ দেখেছেন এবং সুন্দর সুন্দর কথা লিখেছেন।

মসজিদেরই ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাঁর দু'টা নাম-একটা চায়নিজ নাম, অন্যটা মুসলমান নাম। যখন নামাজ পড়ান বা ধর্মকর্ম করেন, তখন চায়নিজ নাম ব্যবহার করেন।

ইসলাম ধর্মে জীবজন্তুর ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার অনুমতি নেই। কিন্তু চায়নিজ মসজিদের দেয়ালে এবং মসজিদের মাথায় ড্রাগন থাকবেই। চায়নিজ মুসলমানদের এই বিষয়ে ছাড় দেয়া হয়েছে কিনা জানি না।

নবীজি শিক্ষার জন্যে সুদূর চীনে যেতে বলেছিলেন। আমার ধারণা দূরত্ব বোঝানোর জন্যে তিনি চীনের নাম করেছেন। তবে আক্ষরিক অর্থে বলে থাকলেও চীনের উল্লেখ ঠিক আছে।

প্রাচীন চীন ছিল উদ্ভাবনের স্বর্গভূমি। কম্পাস চীনের আবিষ্কার। বারুদ, কাগজ, ছাপাখানা।

যখন এই লেখা লিখছি, তখন বিশ্বকাপ নিয়ে মাতামাতি হচ্ছে। কেউ কি জানে ফুটবল চীনাদের আবিষ্কার? সং ডায়ানাষ্টির সম্রাট টাইজু ফুটবল খেলছেন- এই তৈলচিত্রটি পাঠকদের দেখার জন্যে দেয়া হলো। ফুটবলের তখন নাম ছিল কু জু (Ju ju)_ অর্থ Kick ball.

আরো দুঃসংবাদ আছে। গলফও চাইনিজদের আবিষ্কার করা খেলা। গলফের নাম (Chui Wan) (মারের লাঠি), চুই ওয়ান খেলার আরেক নাম বু ডা (bu da) । এর অর্থ হাঁট এবং পেটাও।

এক হাজার বছর আগে চায়নিজ কবি ওয়াং জিয়ানের (টেং ডায়ানেস্টি) কবিতায় বু ডা খেলার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা আধুনিককালের গলফ।

দাবা চায়নিজদের আবিষ্কার করা খেলা। ভারতীয়রা ও অবশ্যি এই খেলা আবিষ্কারের দাবিদার।

প্রথম ক্যালকুলেটার চায়নিজদের। নাম এ্যাবাকাস। হট এয়ার বেলুন, প্যারাসুট চায়নিজদের কীর্তি।

অঙ্কে ডেসিমেল সিস্টেম এখন সারা পৃথিবীতেই ব্যবহার করা হয়।

www.MurchOna.com

কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয় বাইনারি সিস্টেম। ডেসিমেল সিস্টেম এখন ডাল-ভাত, অথচ মানবজাতিকে দশভিত্তিক এই অঙ্কে আসতে শতবৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে। নিওলিথিক সময়ে (৬০০০ বছর আগে) এই ডেসিমেল সিস্টেম চায়নিজরা জানত এবং ব্যবহার করত। সাংহাই শহরে মাটি খুঁড়ে পাওয়া পটারিতে ১০,২০ ৩০ এবং ৪০ সংখ্যার চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা সেই সময়ের মানুষের ডেসিমেল সিস্টেমের জ্ঞানের কথাই বলে।

সংখ্যা	চিহ্ন
১০	|
২০	∪
৩০	ш
৪০	ꟺ

সিসমোগ্রাফ কাদের আবিষ্কার চায়নিজদের আবার কার? প্রাচীন সিসমোগ্রাফের একটি ছবি পাঠকদের কৌতূহল মেটানোর জন্যে দেয়া হলো। এই আবিষ্কার করা হয় Han dynasty- র সময়।

এবার আসি ধাতু বিদ্যায়।

আকর থেকে লোহা এবং লোহা থেকে ইস্পাত চায়নিজদের আবিষ্কার। তামা এবং পরে ব্রোঞ্জও তাদের।

মাটির নিচ থেকে পেট্রোলিয়াম বের করা এবং ব্যবহার করার পদ্ধতিও তাদের আবিষ্কার। তারাই প্রথম খনি থেকে কয়লা তোলা শুরু করে।

ও সিল্কের কথা তো বলা হলো না। সিল্ক চায়নিজদের । চা চায়নিজদের। চা শব্দটাও কিন্তু চাইনিজ। চিনিও চাইনজিদের।

আমি আমার এই লেখার শিরোনাম দিয়েছি 'মহান চীন'। চীনকে মহান চীন বলছি চীনাদের এই আশ্চর্য উদ্ভাবনী ক্ষমতার জন্যে। চীন একটি বিশাল দেশ এই জন্যে না। চীনে গ্রেটওয়াল আছে এই জন্যেও না।

আমি লেখক মানুষ। বই ছাপা হয়। যে কাগজে লিখছি সেই কাগজ চায়নিজদের আবিষ্কার। যে ছাপাখানায় বই ছাপা হয়, সেই ছাপাখানাও তাদের আবিষ্কার। চীনকে মহান চীন না বলে উপায় আছে!

চীনে গিয়েছিলাম রাইটার্স ব্লক কাটাতে। সেই ব্লক কীভাবে কাটল সেটা বলে চীন ভ্রমণের উপর এলোমেলো ধরনের লেখাটা শেষ করি।

চীন ভ্রমণের শেষদিনের কথা। সবাই আনন্দ-উল্লাসে ঝলমল করছে। আজ শেষ মার্কেটিং। যে জিনিস আজ কেনা হবে না সেটা আর কোনোদিনও কেনা হবে

না। ভোর আটটা বাজার আগেই সবাই তৈরি। আমি হঠাৎ বেঁকে বসলাম। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, আজ আমি কোথাও যাব না। (আমার একটা বইয়ের নাম।)

শাওন বলল, যাবে না মানে?

আমি বললাম, যাব না মানে যাব না।

কেন?

আমার ইচ্ছা।

কী করবে? সারাদিন হোটেল বসে থাকবে?

হ্যাঁ।

তুমি হোটেলে বসে থাকার জন্যে এত টাকা খরচ করে চীনে এসেছ?

হ্যাঁ।

তুমি কি জানো, তুমি না গেলে তোমার সফরসঙ্গীরা কেউ যাবে না? সবাই যার যার ঘরে বসে থাকবে।

কেউ ঘরে বসে থাকবে না। সবাই যাবে। দুইশ ডলার বাজি।

আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই যাবে। কিন্তু মন খারাপ করে যাবে। তুমি শেষ দিনে সবার মন খারাপ করিয়ে দিতে চাও?

মাঝে মাঝে মন খারাপ হওয়া ভালো। এতে লিভার ফাংশন ঠিক থাকে।

তুমি না গেলে আমিও যাব না।

তুমি থাকতে পারবে না। হোটেলে আমি একা থাকব।

শাওনের গলা ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তার দিকে তাকালেই চোখের পানি দেখা যাবে। আমি আবার চোখের পানির কাছে অসহায়। কাজেই তার দিকে না তাকিয়ে চোখ-মুখ কঠিন করে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে প্রায় ছুটেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমি ব্যাগ খুলে কাগজ -কলম বের করলাম। লিখতে শুরু করলাম। আমার রাইটার্স ব্লক কেটে গেছে। কলমের মাথায় ঝর্ণাধারার মতো শব্দের পর শব্দ আসছে। কী আনন্দ! কী আনন্দ! একসময় চোখে পানি এসে গেল। কিছুক্ষণ লেখার পর পাতা ঝাপসা হয়ে যায়। চোখ মুছে লিখতে শুরু করি।

কতক্ষণ লিখেছি জানি না। একসময় বিস্মিত হয়ে দেখি, শাওন আমার পেছনে। সে কি হোটেল থেকে যায় নি! সারাক্ষণ কি হোটেল ঘরেই ছিল? আমার কিছুই মনে নেই।

আমি লজ্জিত গলায় বললাম, হ্যালো।

সে বলল, তোমার রাইটার্স ব্লক কেটে গেছে, তাই না?

www.MurchOna.com
==

আমি বললাম, হ্যাঁ।

সে বলল, আমি কী সুন্দর দৃশ্যই না দেখলাম! একজন লেখক কাঁদছে আর লিখছে। কাঁদছে আর লিখছে।

খুব সুন্দর দৃশ্য?

আমার জীবনে দেখা সবচে' সুন্দর দৃশ্য।

আমি বললাম, নিষিদ্ধ নগরীতে তুষারপাতের চেয়েও সুন্দর?

একশ'গুণ সুন্দর।

আমি অবাক হয়ে দেখি, তার চোখেও অশ্রু টলমল করছে।

চীন ভ্রমণে আমার অর্জন একজন মুগ্ধ তরুণীর আবেগ এবং ভালোবাসার শুদ্ধতম অশ্রু। মিং রাজাদের ভাগ্যে কখনো কি এই অশ্রু জুটেছে? আমার মনে হয় না।

www.MurchOna.com
==

প্রিয় পদরেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স তখন মাত্র আঠোরো। 'ভগ্নহৃদয়' নামে তাঁর একটি কবিতা ছাপা হয়েছে 'ভারতী' পত্রিকায়।

ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের হৃদয় তখন সত্যিকার অর্থেই ভগ্ন। তাঁর স্ত্রী মহারাণী ভানুমতি মারা গেছেন। তিনি ভগ্নহৃদয় নিয়েই রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' পড়লেন। পড়ে অভিভূত হলেন। একজন রাজদূত (রাধারমণ ঘোষ)পাঠালেন কিশোর কবির কাছে। রাজদূত অতীব বিনয়ের সঙ্গে জানালেন, ত্রিপুরার মহারাজা আপনাকে কবিশ্রেষ্ঠ বলেছেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -

> এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যেই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

[জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ]

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য প্রতিভা চিনতে ভুল করেন নি। রবীন্দ্রনাথও বন্ধু চিনতে ভুল করেন নি। তিনি গভীর আগ্রহ এবং গভীর আনন্দ নিয়ে বারবার ত্রিপুরা গিয়েছেন। মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য এবং তাঁর পুত্র রাধাকিশোরমাণিক্যের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। কত না গান লিখেছেন ত্রিপুরায় বসে। যার একটি গানের সঙ্গে আমার বাল্যস্মৃতি জড়িত। আগে গানের কথাগুলি লিখি, তারপর বাল্যস্মৃতি।

> ফাগুনের নবীন আনন্দে
> গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
> দিল তারে বনবীথি,
> কোকিলের কলগীতি,

www.MurchOna.com

ভরি দিল বকুলের গন্ধে॥
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি
পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে॥

রচনা : আগরতলা, ১২ ই ফাল্গুন ১৩৩২
সূত্র : রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা, বিকচ চৌধুরী

এখন এই গান-বিষয়ক আমার বাল্যস্মৃতির কথা বলি। আমরা তখন থাকি চট্টগ্রামের নালাপাড়ায়। পড়ি ক্লাস সিক্সে। আমার ছোটবোন সুফিয়াকে একজন গানের শিক্ষক গান শেখান। এই গানটি দিয়ে তার শুরু। আমার নিজের গান শেখার খুব শখ। গানের টিচার চলে যাবার পর আমি তালিম নেই আমার বোনের কাছে। সে আমাকে শিখিয়ে দিল হারমোনিয়ামের কোন রিডের পর কোন রিড চাপতে হবে। আমি যখন তখন যথেষ্ট আবেগের সঙ্গেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাই-'ফাগুনের নবীন আনন্দে'।

একবার গান গাইছি, গানের শিক্ষক হঠাৎ উপস্থিত। আমার হারমোনিয়াম বাজানো এবং গান গাওয়া দেখে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, খোকা শোন! তোমার গলায় সুর নেই। কানেও সুর নেই। রবীন্দ্রনাথের গান বেসুরে গাওয়া যায় না। তুমি আর কখনো হারমোনিয়ামে হাত দেবে না। অভিমানে আমার চোখে পানি এসে গেল।

আমি সেই শিক্ষকের আদেশ বাকি জীবন মেনে চলেছি। হারমোনিয়ামে হাত দেই নি। এখন বাসায় প্রায়ই শাওন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে। যন্ত্রটা হাত দিয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। ধরি না। বালক বয়সের অভিমান হয়তো এখনো কাজ করে। তবে বাল্য-কৈশোর ও যৌবন পার হয়ে এসেছি বলেই হয়তো অভিমানের 'পাওয়ার' কিছুটা কমেছে। এখন ভাবছি কোনো একদিন গায়িকা শাওনকে বলব- তুমি আমাকে 'ফাগুনের নবীন আনন্দে'-গানটা কীভাবে গাইতে হবে শিখিয়ে দেবে?

যে ত্রিপুরা রবীন্দ্রনাথকে এত আকর্ষণ করেছে সেই ত্রিপুরা কেমন, দেখা উচিত না? রবীন্দ্রনাথের পদরেখা আমার প্রিয় পদরেখা। সেই পদরেখা অনুসরণ করব না? প্রায়ই ত্রিপুরা যেতে ইচ্ছা করে, যাওয়া হয় না, কারণ একটাই, ভ্রমণে আমার অনীহা। ঘরকুনো স্বভাব। আমার ঘরের কোনায় আনন্দ।

www.MurchOna.com

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রথম আলো' উপন্যাস পড়ে ত্রিপুরা যাবার ইচ্ছা আবারো প্রবল হলো। উপন্যাসের শুরুই হয়েছে ত্রিপুরা মহারাজার পুণ্যাহ উৎসবের বর্ণনায়। এমন সুন্দর বর্ণনা! চোখের সামনে সব ভেসে উঠে।

একবার ত্রিপুরা যাবার সব ব্যবস্থা করার পরেও শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দিলাম। কেন করলাম এখন মনে নেই, তবে হঠাৎ করে ত্রিপুরা যাবার সিদ্ধান্ত কেন নিলাম সেটা মনে আছে। এক সকালের কথা, নুহাশ পল্লীর বাগানে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল। অবাক হয়ে দেখি, নীলমণি গাছে থোকায় থোকায় ফুল ফুটেছে। অর্কিডের মতো ফুল। হালকা নীল রঙ। যেন গাছের পাতায় জোছনা নেমে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত, যেতে হবে ত্রিপুরা। কারণ নীলমণি লতা গাছ রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেখেন ত্রিপুরায় মালঞ্চ নামের বাড়িতে। মালঞ্চ বাড়িটি রাজপরিবার রবীন্দ্রনাথকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। বাড়ির চারদিকে নানান গাছ। একটা লতানো গাছে অদ্ভুত ফুল ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথ গাছের নাম জানতে চান। স্থানীয় যে নাম তাঁকে বলা হয় তা তাঁর পছন্দ হয় না। তিনি গাছটার নাম দেন 'নীলমণি লতা'।

আমি আমার বন্ধুদের কাছে ত্রিপুরা যাবার বাসনা ব্যক্ত করলাম। তারা একদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেলল। বিরাট এক বাহিনী সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

> গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
> মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসংগমে
> তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি
> কত বালবৃদ্ধ নরনারী, নৌকা দুটি
> প্রস্তুত হইল ঘাটে।

আমরা অবশ্যি যাচ্ছি বাসে। সরকারি বাস। সরকার ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস চালু করেছেন। আরামদায়ক বিশাল বাস। এসির ঠাণ্ডা হাওয়া। সিটগুলি প্লেনের সিটের মতো নামিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া যায়।

বাস আমাদের নিয়ে রওনা হয়েছে। বাংলাদেশ দেখতে দেখতে যাচ্ছি। কী সুন্দরই না লাগছে! যাত্রী বলতে আমরাই। বাইরের কেউ নেই। কাজেই গল্পগুজব হৈচৈ-এ বাধা নেই। দলের মধ্যে দুই শিশু। মাজহার পুত্র এবং কমল কন্যা। এই দুজন গলার সমস্ত জোর দিয়ে ক্রমাগত চিৎকার করছে। শিশুদের বাবা-মা'র কানে এই চিৎকার মধুবর্ষণ করলেও আমি অতিষ্ঠ। আমার চেয়ে তিনগুণ অতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন। সে একবার আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে

www.MurchOna.com

ফিসফিস করে বলল, মাজহারের এই বান্দর ছেলেটাকে থাপ্পড় দিয়ে চুপ করানো যায় না?

আমি বললাম, যায়। কিন্তু থাপ্পরটা দেবে কে?

আমার নিয়মিত সফরসঙ্গীদের সঙ্গে এবারই প্রথম মিলন যুক্ত হয়েছে। আরেকজন আছেন, আমার অনেক দিনের বন্ধু, প্রতীক প্রকাশনীর মালিক আলমগীর রহমান। তাঁর বিশাল বপু। বাসের দুটা সিট নিয়ে বসার পরেও তাঁর স্থান সংকুলান হচ্ছে না।

আলমগীর রহমান দেশের বাইরে যেতে একেবারেই পছন্দ করেন না। একটা ব্যতিক্রম আছে-নেপাল। তাঁর বিদেশ ভ্রমণ মানেই প্লেনে করে কাঠমাণ্ডু চলে যাওয়া। নিজের শরীর পর্বতের মতো বলেই হয়তো পাহাড়-পর্বত দেখতে তাঁর ভালো লাগে। তিনি আগরতলা যাচ্ছেন ভ্রমণের জন্যে না। কাজে। আগরতলায় বইমেলা হচ্ছে। সেখানে তাঁর স্টল আছে।

বাস যতই দেশের সীমানার কাছাকাছি যেতে লাগল ভ্রমণ ততই মজাদার হতে লাগল। রাস্তা সরু। সেই সরু রাস্তা কখনো কারোর বাড়ির আঙিনার উপর দিয়ে যাচ্ছে। কখনো বা বৈঠকখানা এবং মূলবাড়ির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়কর ব্যাপর! রাস্তাঘাট না বানিয়েই আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু করে দেয়া একমাত্র বাংলাদেশের মতো বিস্ময়-রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব।

শুভেচ্ছা স্বাগতম

বাস বাংলাদেশ-ত্রিপুরার সীমান্তে থেমেছে। আমরা বাস থেকে নেমেছি এবং বিস্ময়ে খাবি খাচ্ছি। আমাদের আগমন নিয়ে ব্যানার শোভা পাচ্ছেই বিশাল বিশাল ব্যানার। আগরতলা থেকে কবি এবং লেখকরা ফুলের মালা নিয়ে এতদূর চলে এসেছেন। ক্যামেরার ফ্লাশলাইট জ্বলছে। ক্রমাগত ছবি উঠছে। সীমান্তের চেকপোস্টে বিশাল উৎসব।

অন্যদের কথা জানি না, আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। প্রিয় পদরেখার সন্ধানে এসে এত ভালোবাসার মুখোমুখি হবো কে ভেবেছে! ফর্সা লম্বা অতি সুপুরুষ একজন, অনেক দিন অদর্শনের পর দেখা এমন ভঙ্গিতে, আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন। কিছুতেই ছাড়ছেন না। ভদ্রলোকের নাম রাতুল দেববর্মণ। তিনি একজন কবি। মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের বংশধর। কিংবদন্তি গায়ক শচীন দেববর্মণ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁকে আমি এই প্রথম দেখছি।

সীমান্তের চেকপোস্টে আরো অনেকেই এসেছিলেন, সবার নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হলেন দৈনিক ত্রিপুরা দর্পণ

www.MurchOna.com

পত্রিকার সম্পাদক সমীরণ রায়, পদ্মা-গোমতী আগরতলা-র সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস তলাপাত্র, আগরতলা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দাশ, অধ্যাপক কাশীনাথ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ। শুভেচ্ছার বাণী নিয়ে এগিয়ে নিতে আসা এইসব আন্তরিক মানুষ আমাদের ফিরে যাবার দিনও এক কাণ্ড করলেন। তাঁরা গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, আপনারা আজ যেতে পারবেন না। আমরা আপনাদের আরো কিছুদিন রাখব।

তখন আমরা পুঁটলাপুঁটলি নিয়ে বাসে উঠে বসেছি। এক্ষুনি বাস ছাড়বে।

তাঁরা বললেন, আমরা বাসের সামনে শুয়ে থাকব, দেখি আপনারা কীভাবে যান।

টুরিস্ট, না লেখক?

কবি-লেখকদের সম্মিলিত হৈচৈয়ের ভেতর পড়ব এমন চিন্তা আমার মনেও ছিল না। আমার কল্পনায় ছিল বন্ধুবান্ধব নিয়ে টুরিস্টের চোখে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়ভূমি দেখব। সেটা সম্ভব হলো না। আমাকে নিয়ে তাদের আগ্রহ দেখেও কিছুটা বিব্রত এবং বিচলিত বোধ করলাম। এত পরিচিত ত্রিপুরায় আমার থাকার কথা না। বাংলাদেশের গল্প-উপনাস ত্রিপুরায় খুব যে পাওয়া যায় তাও না। টিভি চ্যানেলগুলি দেখা যায়। আমার পরিচিতির সেটা কি একটা কারণ হতে পারে? অনেক বছর ধরে দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস লিখি, সেটা কি একটা কারণ? হিসাব মিলাতে পারছি না।

প্রথম রাতেই যেতে হলো বইমেলায়। ভেবেছিলাম ছোট্ট ঘরোয়া ধরনের বইমেলা। গিয়ে দেখি হুলস্থুল আয়োজন। বিশাল জায়গা নিয়ে উৎসব মুখরিত অঙ্গন। দেখেই মন ভালো হয়ে গেল। প্রতিটি দোকান সাজানো, সুশৃঙ্খল দর্শকের সার। মেলার বাইরে বড় বড় ব্যানারে কবি-লেখকদের রচনার উদ্ধৃতি। বাংলাদেশের কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতা দেখে খুবই ভালো লাগল। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র তাঁর উদ্ধৃতিই স্থান পেয়েছে।

কবি গুণ আমার পছন্দের মানুষ আমি তাঁর কবিতার চেয়েও গদ্যের ভক্ত। আমার ধারণা তাঁর জন্ম হয়েছিল গদ্যকার হিসেবে। অল্প বয়সেই চুল-দাড়ি লম্বা করে ফেলায় কবি হয়েছেন। যতই দিন যাচ্ছে নির্মলেন্দু গুণের চেহারা যে রবীন্দ্রনাথের মতো হয়ে যাচ্ছে-এই ব্যাপারটা কি আপনারা লক্ষ করছেন? খুবই চিন্তার বিষয়।

আমি মেলায় ঘুরছি, আগরতলার লেখকরা গভীর আগ্রহে আমাকে তাদের

www.MurchOna.com

লেখা বইপত্র উপহার দিচ্ছেন। নিজেকে অপরাধী লাগছে। কারণ এই যে গাদাখানিক বই নিয়ে দেশে যাব, আমি কি বইগুলি পড়ার সময় পাব? বই এমন বিষয় ভেতর থেকে আগ্রহ তৈরি না হলে পড়া যায় না। জোর করে বই পড়া অতি কষ্টকর ব্যাপার। আমি বই পড়ি আনন্দের জন্যে। যে বইয়ের প্রথম পাঁচটি পাতা আমাকে আনন্দ দিতে পারে না, সেই বই আমি পড়ি না।

আগরতলার লেখকদের যে সব বই পেলাম, তার সিংহভাগ কবিতার। বাঙলা ভাষাভাষিরা কবিতা লিখতে এবং কবিতার বই প্রকাশ করতে পছন্দ করেন। প্রতিবছর ঢাকায় জাতীয় কবিতা সম্মেলন হয়। এই উপলক্ষে কত কবিতার বই যে বের হয়! শুনেছি গত কবিতা সম্মেলনে বাংলাদেশের পাঁচ হাজার কবি রেজিস্ট্রেশন করেছেন। কবির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এই ব্যবস্থা। নাম রেজিস্ট্রি করে রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিতে হয়।

কবিতা প্রসঙ্গে এইখানেই শেষ। কবিরা আমার উপর রাগ করতে পারেন। একটাই ভরসা, এই রচনা কোনো কবি পাঠ করবেন না। কবিরা গদ্য পাঠ করেন না।

উদয়পুর

বইমেলার সামনে বড়সড় একটা বাস দাঁড়িয়ে। এই বাসে করে আমরা যাব ত্রিপুরা থেকে সত্তুর কিলোমিটার দূরে উদয়পুর। বাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক সমীর বাবু। আমাদের সঙ্গে গাইড হিসেবে যাচ্ছেন কবি রাতুল দেববর্মণ। আনন্দ এবং উত্তেজনায় তিনি স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতেও পারছেন না। ক্রমাগত সিট বদলাচ্ছেন।

বাস ছাড়বে ছাড়বে করছে-এই সময় রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর দিলীপ চক্রবর্তী উপস্থিত হলেন। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। অতি সুদর্শন মানুষ। গায়ের রঙ সাহেবদের মতো গৌর। তিনি যখন জানলেন, বাংলাদেশ থেকে লেখকদের দল যাচ্ছে উদয়পুর-তিনি লাফ দিয়ে বাসে উঠে পড়লেন। আমাদের সফরের বাকি দিনগুলি তিনি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। নিজের ঘরসংসার বাদ।

আমরা আগ্রহ নিয়ে উদয়পুরের ভুবনেশ্বর মন্দির দেখতে গেলাম। এই মন্দিরে নরবলি হতো। রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' লিখলেন এই মন্দির দেখে। পরে রাজর্ষিকে নিয়ে বিখ্যাত 'বিসর্জন' নাটকটি লেখা হলো। সবাই আগ্রহ নিয়ে ভুবনেশ্বর মন্দির দেখছে। ছবি তুলছে। আমি খটকা নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছি। রবীন্দ্রনাথের

www.MurchOna.com

জীবনস্মৃতির পড়ে আমি যতটুকু জানি-'রাজর্ষি' লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় যান নি। অনেক পরে গেছেন। 'রাজর্ষি'র কাহিনী রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন স্বপ্নে। তিনি ফিরছেন দেওঘর থেকে। সারারাত ঘুম হয় নি। হঠাৎ ঝিমুনির মতো হলো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -

> কোন্ এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'বাবা এ কী! এ-রক্ত!' বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। -জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।

[জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ]

ভুবনেশ্বর মন্দির দর্শনের পর গেলাম ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দেখতে। আমি ছোটখাটো মন্দির দেখে আনন্দ পাচ্ছিলাম না। ভারতবর্ষ মন্দিরের দেশ। এমন সব মন্দির সারা ভারতে ছড়ানো যা দেখতে পাওয়া বিরাট অভিজ্ঞতা। সেই তুলনায় উদয়পুরের মন্দিরগুলি তেমন কিছু না।

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের একটা বিষয় আমার সফরসঙ্গীদের, বিশেষ করে মহিলাদের, খুব আকর্ষণ করল। সেখানে একটা বাচ্চার অন্নপ্রাশন উৎসব হচ্ছিল। বর্ণাঢ্য উৎসব। তারা উৎসবের সঙ্গে মিশে গেল। পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে নিজেরাই আনন্দঘন্টা বাজাতে লাগল।

উৎসবের মধ্যেই জানা গেল, পাশেই ইচ্ছাপূরণ দিঘি বলে এক দিঘি। দিঘি ভর্তি মাছ। মাছকে খাবার খাওয়ালে তাদের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে মনের ইচ্ছা পূরণ হয়। মেয়েরা অন্নপ্রাশন উৎসব ছেড়ে রওনা হলো ইচ্ছেপূরণ দিঘির দিকে।

এই অঞ্চলেই নাকি ভারতবর্ষের সবচে' ভালো প্যাড়া পাওয়া যায়। দুশ' বছর ধরে মিষ্টির কারিগররা এই প্যাড়া বানাচ্ছেন। আমি গেলাম প্যাড়া কিনতে। ভারতবর্ষের মন্দিরগুলির সঙ্গে প্যাড়ার কি কোনো সম্পর্ক আছে? যেখানে মন্দির

www.MurchOna.com

সেখানেই প্যাড়া। দেবতাদের ভোগ হিসেবে মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। প্যাড়া কি দেবতাদের পছন্দের মিষ্টান্ন?

প্যাড়ার একটা টুকরো ভেঙে মুখে দিলাম-যেমন গন্ধ তেমন স্বাদ। আমাদের মধ্যে প্যাড়া কেনার ধুম পড়ে গেল।

আমি কবি রাতুলকে প্রশ্ন করলাম, আপনার কি ধারণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানকার প্যাড়া খেয়েছেন?

রাতুল প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। আমার নিজের ধারণা খেয়েছেন। ভালো জিনিসের স্বাদ তিনি গ্রহণ করবেন না তা হয় না। যদিও তাঁর সমগ্র রচনার তিনি শারীরিক আনন্দের বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। তাঁর রচনায় মানসিক আনন্দের বিষয়টিই প্রধান। শরীর গৌণ। তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্মে যৌনতার বিষয়টি অনুপস্থিত বললেই হয়। হৈমন্তী গল্পে একবার লিখলেন-'তখন তাহার শরীর জাগিয়া উঠিল। এই পর্যন্ত লিখেই চুপ। তাঁর কাছে দেহ মনের আশ্রয় ছাড়া কিছু না। নারীদের দিকে তাকালে পুরুষদের নানা সমস্যা হয়। রবীন্দ্রনাথের সমস্যা অন্যরকম -

ওই দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।

[স্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

কালো বুদ্ধিজীবী

বুদ্ধিজীবীরা শাদা-কালো হন না। তাদের জীবিকা বুদ্ধি। বুদ্ধি বর্ণহীন। তবে আমাদের ভ্রমণের একজন প্রধানসঙ্গী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক শফি আহমেদকে আমি 'কালো বুদ্ধিজীবী' ডেকে আনন্দ পাই।

চিল আকাশে উড়ে, তার দৃষ্টি থাকে স্থলে। শফি আহমেদ বাংলাদেশে বাস করেন, কিন্তু তাঁর হৃদয় পড়ে থাকে আগরতলায়। আগরতলার প্রতিটি গাছ, প্রতিটি পাথর তিনি চেনেন। আগরতলা সম্পর্কে কেউ সামান্যতম মন্দ কথা বললে তিনি সার্টের হাতা গুটিয়ে মারতে যান।

এই সদানন্দ চিরকুমার মানুষটি আমাকে মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলার মহান ভূমিকার কথা কী সুন্দর করেই না বললেন! মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় থাকত, কোথায় ছিল ফিল্ড হাসপাতাল, সব ঘুরে ঘুরে দেখালেন।

www.MurchOna.com

বেড়াতে গেলে আমি কখনো ইউনিভার্সিটি বা কলেজ দেখতে যাই না। কালো বুদ্ধিজীবী আমাকে জোর করে নিয়ে গেলেন আগরতলার এমবিবি কলেজে। কারণ কী? কারণ একটাই, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই কলেজের একটা ভূমিকা আছে। কলেজটা ছিল শরণার্থী শিবির। কাজেই আমাকে দেখতে হবে।

শুনতে পাচ্ছি শফি আহমেদ সাহেব বলেছেন, মৃত্যুর পর তার কবর যেন হয় আগরতলায়। শফি সাহেবের বন্ধুবান্ধবরা চিন্তিত। ডেডবডি নিয়ে এতদূর যাওয়া সহজ ব্যাপার না।

চখাচখি

আমাদের এবারের ভ্রমণ চখাচখি ভ্রমণ। সবাই জোড়ায় জোড়ায় এসেছে। দেশের বাইরে পা দিলে চখাচখি ভাবের বৃদ্ধি ঘটে। আমাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। স্ত্রীরা স্বামীদের নিয়ে নানান আহ্লাদী করছে। স্বামীরা প্রতিটি আহ্লাদীকে গুরুত্ব দিচ্ছে। খুবই চেষ্টা করছে প্রেমপূর্ণ নয়নে স্ত্রীর দিকে তাকাতে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে। মাজহার এবং কমল দু'জনকেই দেখলাম স্ত্রীর মুখে তুলে প্যাড়া খাওয়াচ্ছে। স্ত্রীরাও এমন ভাব করছে যেন সারাজীবন তারা এভাবেই মিষ্টি খেয়ে এসেছে। এটা নতুন কিছু না।

চখাচখিদের মধ্যমণি অন্যদিন পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক নাসের এবং নাসের-পত্নী তামান্না। এটা তাদের হানিমুন ট্রিপ। কিছুদিন আগেই বিয়ে হয়েছে। তামান্নার হাতের মেহেদির দাগ তখনো ম্লান হয় নি।

আমরা কত না জায়গায় ঘুরলাম, কত কিছু দেখলাম, এই দু'জন কিছুই দেখল না। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল।

চখাচখি গ্রুপ থেকে বাদ পড়েছে মিলন ও আলমগীর রহমান। তারা স্ত্রীদের দেশে ফেলে গেছে। সবাই জোড়া বেঁধে ঘুরছে, মিলন-আলমগীরও জোড়া বেঁধে ঘুরছে। দু'জনের মুখই গম্ভীর। দু'জনই দু'জনের উপর মহাবিরক্ত। ভদ্রতার খাতিরে কেউ বিরক্তি প্রকাশ করতে পারছে না। মজার ব্যাপার।

সবচে' আনন্দ লাগল আর্কিটেক্ট করিম এবং তার স্ত্রী স্নিগ্ধাকে দেখে। স্নিগ্ধা সারাক্ষণ স্বামীর হাত ধরে আছে। করিমের অতি সাধারণ রসিকতায় হেসে ভেঙে পড়ছে এবং রাগ করে বলছে, তুমি এত হাসাও কেন? ছিঃ! দুষ্ট!

করিমের গানের গলা ভালো। যে-কোনো বাংলা হিন্দি গানের প্রথম চার লাইন সে শুদ্ধ সুরে গাইতে পারে। করিম তার এই ক্ষমতাও কাজে লাগাচ্ছে, স্নিগ্ধার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে গানে।

www.MurchOna.com

শাওন একসময় আমাকে বলল, দেখ করিম চাচা স্ত্রীকে নিয়ে কত আনন্দ করছেন, আর তুমি গম্ভীর হয়ে বসে আছ!

আমি করিমকে ডেকে বললাম, তুমি শাওনের অভিযোগের উত্তর গানে গানে দাও।

করিম সঙ্গে সঙ্গে গাইল-

সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা,
এ কি আর ভালো লাগে?

বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি, আগরতলার আনন্দময় ভ্রমণ শেষ করেই স্নিগ্ধা তার স্বামী এবং একমাত্র শিশুপুত্র রিসাদকে ফেলে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে।

জগতের সর্বপ্রাণী সুখী হোক।

নীরমহল

ত্রিপুরার মহারাজ (খুব সম্ভব মহারাজ বীর বিক্রম বাহাদুর) তাঁর স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে স্ত্রীর দেশের রাজপ্রাসাদের অনুকরণে বিশাল এক জলপ্রাসাদ বানিয়েছিলেন। জলপ্রাসাদ, কারণ প্রাসদটা জলের মাঝখানে। দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির মাঝখানে এক রাজবাড়ি। নাম নীরমহল। জলে যার ছায়া পড়ে। যেমন কল্পনা তেমন রূপ। UNESCO মনে হয় এর খোঁজ এখনো পায় নি। খোঁজ পেলে World Heritage- এর আওতায় অবশ্যই নিয়ে আসত।

আমরা একটি আনন্দময় রাত কাটালাম দূর থেকে নীরমহলের দিকে তাকিয়ে। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল এমন একটা রেস্টহাউসে, যেখান থেকে জলপ্রাসাদ নীরমহল দেখা যায়।

রাত অনেক হয়েছে, আমরা গোল হয়ে রেস্টহাউসের বারান্দায় বসে আছি। তাকিয়ে আছি নীরমহলের দিকে। চট করে রবীন্দ্রনাথের লাইন মনে হলো -

রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ,
এই তব মনে ছিল আশ।

কেন জানি মনটাই খারাপ হলো। আমি শাওনের দিকে ফিরে বললাম, গান

www.MurchOna.com

শোনাও তো। একের পর এক রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে যাবে। Stop না বলা পর্যন্ত থামবে না।

রেস্টহাউসের সব বাতি নেভানো। আমাদের দৃষ্টি দূরের নীরমহলের দিকে। গায়িকার কিন্নর কণ্ঠ বাতাসে মিশে মিশে যাচ্ছে। সে গাইছে-'সখী, বহে গেল বেলা।'

আমি মনে মনে বললাম, জলরাশির মাঝখানে অপূর্ব নীরমহল দেখার জন্যে আমি ত্রিপুরায় আসি নি। আমি এসেছি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পদরেখার সন্ধানে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আপনি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা গ্রহণ করুন। আমার গলায় সুর নেই। আপনার অপূর্ব সঙ্গীত আমি কোনোদিনই কণ্ঠে নিতে পারব না। আমার হয়ে আপনার গান আপনাকে পাঠাচ্ছে আমার স্ত্রী শাওন। কী সুন্দর করেই সে গাইছে-তাই-না কবি?

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভগ্নহৃদয়'-এর কিছু অংশ

ভগ্নহৃদয়

প্রথম সর্গ

দৃশ্য -বন। চপলা ও মুরলা

চপলা। সখি, তুই হলি কি আপনা-হারা?
এ ভীষণ বনে পশি একেলা আছিস্ বসি
খুঁজে খুঁজে হোয়েছি যে সারা!
এমন আঁধার ঠাঁই-জনপ্রাণী কেহ নাই,
জটিল-মস্তক বট চারি দিকে ঝুঁকি!
দুয়েকটি রবিকর সাহসে করিয়া ভর
অতি সন্তর্পণে যেন মারিতেছে উঁকি।
অন্ধকার, চারি দিক হ'তে, মুখপানে
এমন তাকায়ে রয়, বুকে বড় লাগে ভয়,
কি সাহসে রোয়েছিস্ বসিয়া এখানে?

মুরলা। সখি, বড় ভালবাসি এই ঠাঁই!
বায়ু বহে হুহু করি, পাতা কাঁপে ঝর ঝরি,
স্রোতস্বিনী কুলু কুলু করিছে সদাই!

www.MurchOna.com

বিছায়ে শুকানো পাতা বটমূলে রাখি মাথা
দিনরাত্রি পারি, সখি, শুনিতে ধ্বনি।
বুকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উথলিয়া
বুঝায়ে বলিতে তাহা পারি না সজনি!
যা সখি, একটু মোরে রেখে দে একেলা,
এ বন আঁধার ঘোর ভাল লাগিবে না তোর,
তুই কুঞ্জবনে, সখি, কর্ গিয়ে খেলা!

চপলা। মনে আছে, অনিলের ফুলশয্যা আজ?
তুই হেথা বোসে র'বি, কত আছে কাজ!
কত ভোরে উঠে বনে গেছি ছুটে,
মাধবীরে লোয়ে ডাকি,
ডালে ডালে যত ফুল ছিল ফুটে
একটি রাখি নি বাকি!
শিশিরে ভিজিয়ে গিয়েছে আঁচল,
কুসুমরেণুতে মাখা।
কাঁটা বিঁধে, সখি, হোয়েছিনু সারা
নোয়াতে গোলাপ-শাখা!
তুলেছি করবী গোলাপ -গরবী,
তুলেছি টগরগুলি,
যুঁইকুঁড়ি যত বিকেলে ফুটিবে
তখন আনিব তুলি।
আয়, সখি, আয়, ঘরে ফিরে আয়,
অনিলে দেখ্‌সে আজ-
হরষের হাসি অধরে ধরে না,
কিছু যদি আছে লাজ!

মুরলা। আহা সখি, বড় তারা ভালবাসে দুই জনে!

www.MurchOna.com
==

স্বর্গ, না অন্যকিছু?

কোথায় যাচ্ছি?

সুইজারল্যান্ড।

কেন যাচ্ছ?

খেলতে।

কী খেলা?

নাটক নাটক খেলা।

পাঠকরা নিশ্চয়ই ধাঁধায় পড়ে গেছেন। ধাঁধা ভেঙে দিচ্ছি। আমি নাটকের এক দল নিয়ে যাচ্ছি সুইজারল্যান্ড। এই উর্বর বুদ্ধি আমার মাথা থেকে আসে নি। এতে বুদ্ধি আমার নেই।

আমি (স্বল্পবুদ্ধির কারণেই হয়তো) মনে করি না টিভি নাটক করার জন্যে দেশের বাইরে যেতে হবে। বাংলাদেশে সুন্দর জায়গার অভাব পড়েনি। পাহাড় আছে, সমুদ্র আছে, হাওর আছে, বন-জঙ্গল আছে, চা-বাগান আছে, রাবার বাগান আছে। মরুভূমি অবশ্যি নেই। ক্যামেরার সামান্য কারসাজিতে পদ্মার ধু-ধু বালির চরকে মরুভূমি দেখানো জটিল কিছু না, কয়েকটা উট ছেড়ে দিতে হবে। বাংলাদেশে এখন উটও পাওয়া যায়।

তাছাড়া টিভি নাটকে প্রকৃতি দেখানোর তেমন সুযোগ কোথায়? টিভি নাটকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দেখানো হয়। প্রকৃতি সেখানে গৌণ। টিভি পর্দায় Depth of field আসে না বলে প্রকৃতির অতি মনোরম দৃশ্যও মনে হয় two dimensional. সাদা কথায় ফ্ল্যাট।

তাহলে আমি সুইজারল্যান্ড কেন যাচ্ছি? আমার এক প্রাক্তন ছাত্রের কথার জাদুতে বিভ্রান্ত হয়ে। ছাত্রের নাম হাসান। সে চ্যানেল আই-এর কর্তাব্যক্তিদের একজন। এইচআরভি নামক দামি এক জিপে করে গম্ভীর ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ায়।

আমি যখন শহীদুল্লাহ্ হলের হাউস টিউটর সে ঐ হলের ছাত্র। হৃদয়ঘটিত কোনো এক সমস্যায় জর্জরিত। অর্থনৈতিকভাবেও পর্যুদস্ত। এমন সময়ে সে

www.MurchOna.com

আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার আবদার-এমন কিছু যেন বলি যাতে তার মন শান্ত হয়। আমি তাকে কী বলেছিলাম তা এখন আর তার মনে নেই। তবে হাসানের মন শান্ত হয়েছিল-এই খবর সে আমাকে দিয়েছে।

সেই হাসান সুইজারল্যান্ডের কথা বলে আমাকে প্রায় কাবু করে ফেলল।

স্যার, ভূস্বর্গ! আপনি ভূস্বর্গ দেখবেন না? রথ দেখবেন এবং কলা বেচবেন। নাটক ও হলো, ভূস্বর্গও দেখা হলো।

বিদেশে নাটক করার নতুন হুজুগ ইদানীং শুরু হয়েছে। একজন নায়ক এবং একজন নায়িকা যান। তারা সুন্দর সুন্দর জায়গায় যান। প্রেম করেন। গান করেন। স্থানীয় কিছু ছেলেমেয়ে আনা হয়। তারা যেহেতু কখনো ক্যামেরার সামনে আসে নি তারা রোবটের মতো আসে। চোখ-কান বন্ধ করে দু'একটা সংলাপ কোনোমতে বলে।

এ ধরনের নাটক করা তো আমার পক্ষে সম্ভব না। নায়ক-নায়িকা নির্ভর নাটক আমি লিখতেও পারি না। হাসানকে এই কথা বলতেই সে বলল, আপনার যে ক'জনকে নিতে হয় নেবেন। কোনো সমস্যা নেই। দশজন নিলে দশজন। পনেরোজন নিলে পনেরোজন।

আমি আশ্চর্যই হলাম। হাসান বলল, বিশাল দু'টা বাড়ি আমি আপনাদের জন্যে এক মাসের জন্যে ভাড়া করেছি। বাড়িতে থাকবেন। নিজের মতো রান্না করে খাবেন। একজন বাবুর্চিকেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে।

হাসানের কর্মকাণ্ডে আমি মুগ্ধ। তারপরেও মন টানছে না। কেন জানি বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না। নিজের দেশের ঘরের এক কোণে সারাদিন বসে থাকতে ভালো লাগে। হাসানকে না করে দিলাম। ইতিমধ্যে সুইজারল্যান্ডে নাটক বানানোর প্রস্তাব প্রকাশ হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে যারা কাজ করে তাদের খুব আগ্রহ যেন আমি রাজি হই।

রাজি হলাম। হাসানের হাতে শিল্পীদের একটা তালিকা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, এদের সবাইকে যদি নিয়ে যেতে পারি তাহলে OK.

হাসান বলল, আরো আরো নিতে পারেন। আমি তো বলেছি কতজনকে নেবেন আপনার ব্যাপার।

আমি আবারো চমৎকৃত হলাম। তালিকাটা যথেষ্টই বড়।

রিয়াজ, শাওন, চ্যালেঞ্জার, স্বাধীন খসরু, ডাক্তার এজাজ, ফারুক আহমেদ, টুটুল, তানিয়া।

আমাকে নিয়ে নয়জন। হাসান নিমিষের মধ্যে ভিসা করিয়ে ফেলল।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

যথাসময়ে বিমানে উঠলাম। ডাক্তার এজাজ এবং ফারুক আহমেদের এই প্রথম দেশের বাইরে যাত্রা। তাদের আনন্দ এবং উত্তেজনা দেখে ভালো লাগল। রিয়াজ অবশ্যি যেতে পারল না। শেষমুহূর্তে তার জরুরি কাজ পড়ে গেল। ব্যস্ত নায়করা শেষমুহূর্তে জরুরি কাজ বের করে মূল পরিকল্পনা বানচাল করে ফেলেন। আমি এই 'শেষমুহূর্ত' নিয়ে প্রস্তুত ছিলাম বলে তেমন সমস্যা হলো না।

আমি লক্ষ করেছি, ঢাকা শহরে খুব দামি গাড়ি চড়ে যারা ঘোরে তারা খোলামেলা কথা বলতে পারে না। দরজা-জানালা বন্ধ এসি গাড়িতে থাকার কারণেই মনে হয় এটা হয়।

হাসানের কাছে শুনেছিলাম একটা বিশাল বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে, বাস্তবে দেখা গেল শাহীন নামে সুইজারল্যান্ড প্রবাসী এক ছেলে তার ফ্ল্যাটের দু'টা কামরা ছেড়ে দিয়েছে। একজন বাবুর্চি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছিল বলে শুনেছিলাম, দেখা গেল বাবুর্চি আমাদের হাসান। সে উৎসাহের সঙ্গে জানালো যে, ডাল রান্নায় তার নৈপুণ্য অসাধারণ। তিনদিনের ডাল রেঁধে সে না - কি ডিপ ফ্রিজে রেখেও দিয়েছে।

ব্যবস্থা দেখে আমার প্রায় স্ট্রোক হবার জোগাড় হলো। আমি খুবই গরিবের ছেলে। গরিবের ছেলের হাতে যদি দুটা পয়সা হয়, তখন তার মধ্যে নানা বিলাসিতা ঢুকে পড়ে। আমার মধ্যেও ঢুকেছে। শীতের দিনেও আমি এসি ছেড়ে ডাবল লেপ গায়ে দেই।

সুইজারল্যান্ডে যথেষ্ট গরম। ঘরে এসি নেই। সিলিং পাখাও নেই। কয়েকটা ফ্লোর ফ্যান আছে, যার পাখা অতি দুর্বলভাবে ঘুরছে। আমার চিমশা মুখ দেখে হাসান আমাকে একটু দূরে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, আপনার এবং শাওন ভাবির জন্যে ভালো হোটেলের ব্যবস্থা আছে। অভিনেত্রী মৌসুমী এবং নায়ক মাহফুজ এই হোটেলেই ছিলেন। তারা হোটেল খুব পছন্দ করেছেন।

আমি বললাম, হাসান, আমি এতগুলি মানুষ নিয়ে এসেছি। এরা সবাই আমার অতি আপন। এদেরকে ফেলে হোটেলে যাবার প্রশ্নই আসে না। যে ব্যবস্থা করা হয়েছে আমি তার মধ্যেই থাকব। কোনো সমস্যা নেই।

হাসান বলল, আপনারা দুজন তাহলে শাহীনের শোবার ঘরে থাকুন। ঐ ঘরে এসি আছে।

আমি বললাম, আমি আমার নিজের শোবার ঘরে কাউকে থাকতে দেই না। কাজেই অন্যের শোবার ঘরে আমাদের ঢোকার প্রশ্নই উঠে না। ঢালাও বিছানার ব্যবস্থা করো। সবাই একসঙ্গে থাকব। মজা হবে।

www.MurchOna.com

আসন্ন মজার কথা ভেবে আমি উল্লসিত-এরকম ভঙ্গি করলেও মনে মনে চিন্তিত বোধ করলাম শাওনকে নিয়ে। ঘুমুবার জায়গা নিয়ে তার শুচিবায়ুর মতো আছে। সে আমার চেয়েও বিলাসী। তাকে দোষও দিতে পারছি না। সে অতি বড়লোকের মেয়ে।

আল্লাহ্পাকের অসীম রহমত, সে সমস্যাটা বুঝল। এমন এক ভাব করল যেন সবাই মিলে মেঝেতে গড়াগড়ি করার সুযোগ পেয়ে তার জীবন ধন্য। অভিনয় খুব ভালো হলো না। সে হতাশা লুকাতে পারল না।

রাতে ডিনার খেলাম হাসানের বিশেষ নৈপুণ্যে রাঁধা ডাল দিয়ে। ফার্মের মুরগি ছিল। ফার্মের মুরগি আমি খাই না। ঘন কৃষ্ণবর্ণের একটা বস্তুও ছিল। প্রশ্ন করে জানা গেল এটা সবজি। রান্নার গুণে কালো হয়ে গেছে।

ডাক্তার এবং ফারুক সবজি খেয়ে বলল, অসাধারণ। সুইজারল্যান্ডে পৌঁছার পর থেকে তারা যা দেখছে বলছে অসাধারণ। খাবার টেবিলে কাঁচামরিচ দেখে বলল, অসাধারণ। সুইজারল্যান্ডেও কাঁচামরিচ আছে, আশ্চর্য! কাঁচামরিচে কামড় দিয়ে দেখে মিষ্টি। তখনো বলল, অসাধারণ। ঝাল নেই কাঁচামরিচ খেয়েছি। মিষ্টি কাঁচামরিচ এই প্রথম খাচ্ছি। মুহূর্তের মধ্যে এই দুজন টেবিলের সব কাঁচামরিচ শেষ করে ফেলল।

রাতে আমার এবং শাওনের থাকার ব্যবস্থা হলো জেলখানার সেলের চেয়েও ছোট একটা ঘরে। বিছানায় দু'জনের শোবার প্রশ্ন উঠে না। আমি মেঝেতে চাদর পেতে ঘুমুতে গেলাম। ফ্যানের সমস্যা আছে। ফ্যানটা জীবন্ত প্রাণীর মতো আচরণ শুরু করল। ঘুরতে ঘুরতে সে থেমে যায়। কাশির মতো শব্দ করে। আবার ঘুরে আবার থামে। পুরোপুরি এক স্বাধীন সত্তা।

টুটুল-তানিয়া দম্পত্তিকে একটা রুম দেয়া হয়েছে। সাইজে আমাদেরটার চেয়ে ছোট। তার উপর নেই ফ্যান।

বাকি সবার গণবিছানা। সেই ঘরে ও ফ্যান নেই। সবাই গরমে অতিষ্ঠ। বাড়ির মালিক আমাদের জানালেন, সুইজারল্যান্ড অতি ঠাণ্ডার দেশ বলে ফ্যানের প্রচলন নেই। এসির তো প্রশ্নই উঠে না। সামারের এক দুই মাস গরম পড়ে। এই গরম সবাই Enjoy করে। গরমটাই তাদের কাছে মজা লাগে। আমাদের কারোই মজা লাগল না। শুধু ডাক্তার এজাজ এবং ফারুক বলল, অতি আরামদায়ক আবহাওয়া।

ঘুমুতে যাবার আগে আগে আমি আমার দলের সবাইকে ডেকে একটা গোপন মিটিং করলাম। আমি বললাম, বুঝতে পারছি এখানে থাকা-খাওয়ার ব্যাপারটা

www.MurchOna.com

কারো পছন্দ হচ্ছে না। আমাদের বাস্তবতা মানতে হবে। একটা টিভি চ্যানেল এতগুলো মানুষকে এত দূরের দেশে নিয়ে এসেছে। ইউরোপে হোটেল ভাড়া আকাশছোঁয়া। তাদের পক্ষে কোনো রকমেই সম্ভব না সবাইকে হোটেলে রাখা। তোমরা দয়া করে নায়ক-নায়িকাদের মতো নখরা করবে না। তোমরা চরিত্র অভিনেতা। চরিত্র অভিনেতারা অভিনয় করে, নখরা করে না।

তারচেয়ে বড় কথা হাসান আমার ছাত্র তাকে আমি পছন্দ করি। সে যেন তোমাদের কোনো কথায় বা আচরণে কষ্ট না পায়। তার আগ্রহের কারণেই তোমরা ভূস্বর্গ হিসেবে পরিচিত একটা দেশ দেখবে। এর মূল্যও কম না। সারাদিন আমরা কাজ করব। রাতে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ব। এক ঘুমে রাত কাবার। সামান্য কয়েক ঘন্টার জন্যে কি ফাইভ স্টার হোটেল লাগবে?

কথা দিয়ে মানুষকে ভোলানোর ক্ষমতা আমার আছে! (কথাশিল্পী না?) সবাই বুঝল। ফারুক অতি আগ্রহের সঙ্গে বলল, প্রয়োজনে মেঝেতে শুয়ে থাকব। আমি বললাম, মেঝেতেই তো শুয়ে আছ। সে চুপ করে গেল।

ভোরবেলা দলবল নিয়ে শুটিং করতে বেরুবার সময় সবচে' বড় দুঃসংবাদটা শুনলাম। আমাদের শুটিং করতে হবে চুরি করে। পুলিশ দেখতে পেলেই ধরে নিয়ে যাবে। কারণ শুটিং -এর অনুমতি নিতে বিপুল অংকের অর্থ লাগে। ইনস্যুরেন্স করতে হয়।

হাসান সহজ ভঙ্গিতে বলল, পুলিশ আছে কি নেই এটা দেখে শুটিং করতে হবে। পুলিশ যদি ধরে ফেলে তাহলে বলতে হবে আমরা বেড়াতে এসেছি। হোম ভিডিও করছি। দেশে বন্ধুবান্ধবকে দেখাব।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। শুটিংটা হবে কীভাবে?

হাসান বলল, নিশ্চিন্ত থাকেন। ফাঁক ফোকর দিয়ে বের করে নিয়ে আসব। শুধু শুটিং চলাকালীন সময় আপনি ধারে কাছেও থাকবেন না। এটা সাগর ভাইয়ের অর্ডার।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আমি ধারে কাছে থাকব না কেন?

হাসান বলল, পুলিশ যদি আপনাকে ধরে নিয়ে যায় তাহলে বিরাট কেলেঙ্কারি হবে। বাংলাদেশ এম্বেসি ধরে টান পড়বে।

আমার কলিজা গেল শুকিয়ে।

প্রথম দৃশ্য শুরু হলো। বাংলাদেশের এক ছেলে অন্ধ সেজে গিটার বাজিয়ে ভিক্ষা করে। তার স্ত্রী এসে (শাওন) তাকে এখান থেকে বকাঝকা করতে করতে নিয়ে যায়। অন্ধ ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করছে টুটুল। তাকে ফোয়ারার পাশে

দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। সামনে হাতে লেখা সাইনবোর্ড- Help a blind.

টুটুলের গলা চমৎকার। গিটারের হাত চমৎকার। সে মুহূর্তের মধ্যেই জমিয়ে ফেলল। ক্যামেরা অনেক দূরে। কেউ বুঝতেই পারছে না ক্যামেরা চলছে। এক থুরথুরি বুড়ি চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ গিটার শুনে দশ ইউরো একটা নোট টুটুলের হাতে গুজে দিল। টুটুল বিস্মিত।

এখন শাওন যাবে, টুটুলকে বকাঝকা করতে করতে নিয়ে আসবে-ঠিক তখন স্বাধীন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হুমায়ূন ভাই, পুলিশ আসছে।

আমি কাউকেই চিনি না এমন ভঙ্গিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটা দিলাম। শাওন বলল, তুমি আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছ কেন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই চুরি করে নাটক বানানোর মজা পেয়ে গেলাম। নিষিদ্ধ কিছু করছি, এই আনন্দ প্রধান হয়ে গেল। ফ্রেম কী হচ্ছে জানি না। মনিটর নেই। অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর নেই। লেফট ইন রাইট আউট নামক জটিল বিষয় আমার মোটা মাথায় কখনো ঢোকে না। আমার সাহায্যে শাওন এগিয়ে এল। সে আবার আগমন নির্গমন এবং 'লুক' খুব ভালো বোঝে। 'লুক' বিষয়টা কী পাঠকদের বুঝিয়ে দেই। 'লুক' হলো পাত্রপাত্রী কোন দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলছে। ভিডিওতে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লুক ঠিক না হলে দেখা যাবে নায়ক তার বান্ধবীর দিকে না তাকিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে মাথা নাড়ছে এবং কথা বলছে।

ভিডিওর কাজে আমাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হলো ক্যামেরাম্যান এবং শাওনের উপর।

ক্যামেরাম্যানের নাম তুফান। ঝকঝকে চোখের লম্বা পোশাকে ফিটফাট যুবা পুরুষ। মাথাভর্তি টাক না থাকলে তাকে নায়কের চরিত্র দেয়া যেত। তুফান ভারী ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে তুফানের মতোই ছোটাছুটি করে। ক্যামেরা কাঁধেই রাখতে হবে, ষ্ট্যান্ডে বসানোর উপায় নেই। পুলিশ চলে আসতে পারে। হোম ভিডিও যারা করে তারা ক্যামেরার জন্যে ষ্ট্যান্ড নিয়ে আসে না।

আমি চিন্তিত, ক্যামেরায় কী ছবি আসছে কে জানে! আমাদের সঙ্গে না আছে লাইট, না আছে লাইট কাটার, না আছে শব্দ ধারণের বুম। শব্দের সমস্যার সমাধান আছে, পরে ডাব করা যাবে। ছবি নষ্ট হলে কী করব! কাঁধের ক্যামেরা যদি কাঁপে ছবিও কাঁপবে। এত দূর দেশে এসে যদি এমন ছবি নিয়ে যাই যা দেশে মনে হবে পাত্র-পাত্রী সবাই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, সবার মধ্যেই কাঁপুনি, তাহলে হবে কী?

তুফান আমাকে আশ্বস্ত করল। সে বলল, স্যার সব ঠিক আছে, আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না। উপরে আল্লাহ্ আছেন।

উপরে নিচে সবদিকেই আল্লাহ্ আছেন, তবে তিনি চুরি করে ভিডিও গ্রহণের ব্যাপারটার কি ভালোমতো নেবেন?

এদিকে প্রথম দিনেই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। স্বাধীন এক অতি রূপবতীর (হুমায়ূন আহমেদের নায়িকাদের চেয়েও রূপবতী) প্রেমে পড়ে গেল। মেয়ে সুইস, জার্মান ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। স্বাধীন ও ইংরেজি এবং সিলেটি ভাষা ছাড়া কিছু জানে না। প্রেম একপক্ষীয় না, দু'পক্ষীয় আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, ইশারার ইঙ্গিতে কী করে এত অল্প সময়ে এমন গভীর প্রেম হয়!

সন্ধ্যাবেলায় দেখি স্বাধীন উসখুস করছে। জানা গেল মেয়ে তাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছে। রাতে যদি কাজ না করি তাহলে সে ডিনারে যাবে। আমি ডিনারে যাবার অনুমতি দিলাম।

স্বাধীন আবেগমথিত গলায় বলল, আমাদের জন্যে একটু দোয়া করবেন হুমায়ূন ভাই।

আমি বললাম, দোয়া লাগবে কেন?

সে বলল, আমরা বিয়ের কথা চিন্তা করছি। সে শুধু একটা শর্ত দিয়েছে।

কী শর্ত?

পরে আপনাকে বলব।

স্বাধীন ডেটিং-এ চলে গেল তার চেহারা চোখ-মুখ উদভ্রান্ত।

দ্বিতীয় সমস্যা এজাজ এবং ফারুককে নিয়ে। তারা ডলার যা এনেছে প্রথম দিনেই সব শেষ। দু'জন এখন কপর্দকশূন্য। দু'জনই মুখ শুকনা করে বসে আছে।

আমি বললাম, কেনাকাটা কী করেছ যে প্রথম দিনেই সব শেষ?

সাবান কিনেছি।

সাবান কিনেছ মানে কী?

দু'জনই স্যুটকেস বের করল। স্যুটকেস ভর্তি শুধু সাবান। নানান রঙের, নানান ঢং-এর।

এত সাবান কেন কিনেছ?

ফারুক বলল, দেখে এত সুন্দর লাগল! তাছাড়া দেশে এই জিনিস পাওয়া যায় না।

হাসান দু'জনকেই তিনশ' ডলার করে দিল। এরা পরের দিন সেই ডলার দিয়েও সাবান কিনে ফেলল।

ডাক্তার এজাজ সাবানের বস্তা নিয়ে দেশে ফিরতে পারে নি। এয়ার লাইন তার সাবানভর্তি দু'টা স্যুটকেসেই হারিয়ে ফেলে। ফারুক সাবান নিয়ে দেশে ফিরতে পেরেছে। শুনেছি এইসব সাবানের একটাও সে নিজে ব্যবহার করে নি, কাউকে ব্যবহার করতেও দেয়নি। সবই সাজিয়ে রাখা। তার জীবনের বর্তমান স্বপ্ন আবার বিদেশে গিয়ে সাবান কিনে নিয়ে আসা।

শুটিং পুরোদমে চলছে। সুইজারল্যান্ডের সুন্দর সুন্দর জায়গা ব্যবহার করা হচ্ছে। রাইন নদী, রাইনস ফল, নেপোলিয়ানের বাড়ি-কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

খুব উৎসাহ নিয়ে রাইন নদী দেখে ধাক্কার মতো খেলাম। আমরা পদ্মা মেঘনার দেশের মানুষ, আমাদেরকে কি বড় সাইজের খাল দিয়ে ভুলানো যায়? তার সবই ঝকঝকে। মনে হয় পুরো সুইজারল্যান্ডকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখা হয় শুধুমাত্র ছবি তোলার জন্যে। গাছের প্রতিটি পাতা সবুজ। একটা শুকনা পাতা বা মরা ডাল নেই। গাছের নিচেও শুকনা পাতা পড়ে থাকা দরকার। সেইসব কোথায় গেল? পাতা কুড়ানির দল তো চোখে পড়ল না।

নাটকে পিকনিকের একটি দৃশ্য আছে। বেশ বড় দৃশ্য। এই দৃশ্যে পুরো একটা গান আছে। নাটকীয় অনেক ব্যাপার-স্যাপার আছে। পিকনিকের দৃশ্য করার জন্যে রাইন নদীর পাশে ছোট্ট পার্কের মতো একটা জায়গা শাহীন এবং হাসান খুঁজে বের করল।

ছবির দেশে সবকিছুই ছবির মতো। পার্কটাও সে-রকম। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা আছে অর্থাৎ বাথরুম আছে। বারবিকিউয়ের ব্যবস্থা আছে। একপাশেই আপেলের বাগান। গাছভর্তি আপেল। অন্যপাশে নাসপাতি বাগান। ফল ভারে প্রতিটি বৃক্ষ নত। আমরা মহানন্দে বারবিকিউয়ের ব্যবস্থায় লেগে গেলাম। মেয়েরা মনের আনন্দে ছুটাছুটি করতে লাগল। তাদের মুগ্ধ করল রাইন নদীতে সাঁতার কাটতে ব্যস্ত একদল রাজহাঁস। সাইজে দেশী রাজহাঁসের প্রায় দ্বিগুণ। গলা অনেক লম্বা। শুনেছি এরা প্রকৃতিতে ভয়ঙ্কর। মেজাজ খারাপ হলে এরা বিকট শব্দ করে ছুটে এসে কামড়ে দেয়।

মেয়েরা রাজহাঁসের পোষ মানিয়ে ফেলল। তারা হাতে পাউরুটি ধরে এগিয়ে দিচ্ছে। রাজহাঁসের দল কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। মেয়েদের জঙ্গি রাজহাঁসদের দলকে পোষ মানানোর ক্ষমতায় অবাক হলাম না। যারা পুরুষদের পোষ মানায়, তারা সবাইকে পোষ মানাতে সক্ষম।

আমাদের আনন্দ-উল্লাসে হঠাৎ বাধা পড়ল। দুই সুইস জিপ গাড়িতে করে

www.MurchOna.com

উপস্থিত। শাহীনের সঙ্গে তাদের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো। আমরা তার এক বর্ণও বুঝলাম না। সব কথাই হলো জার্মান ভাষায়। এখানে বাঙ্গানুবাদটা দিচ্ছি।

সুইস : তোমরা কী করছ জানতে পারি?

শাহীন : পিকনিক করছি। ফ্যামিলি হলি ডে।

সুইস : তোমরা কি জানো যে, এটা একটা পাবলিক প্রপার্টি? আপেল এবং নাসপাতি বাগান আমার।

শাহীন : আমরা তো আপেল এবং নাসপাতি বাগানে যাচ্ছি না। আমরা নদীর ধারে পিকনিক করছি।

সুইস : এই জায়গাও আমার। [কুৎসিত গালি। গালির অর্থ কী শাহীন বলল না। এতে মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু হবে।]

শাহীন : [গালি, সে জার্মান গালির সঙ্গে বাঙলা গালি মিশিয়ে দিল। বাংলা ভাষায় সবচে' ভদ্র গালিটা ছিল-খা----কির পুলা অফ যা :

সুইস : আমি তোমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেব।

শাহীন : যা তোর বাপদের খবর দিয়ে আয়।

সুইস দু'জন হুস করে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল। আমি সব শুনে বললাম, অন্যের জায়গায় আমরা কেন পিকনিক করব? চল আরেকটা জায়গা খুঁজে বের করি।

শাহীন বলল, স্যার সুইস সরকারের আইনবলে নদীর পাড় ঘেঁসে সমস্ত সুন্দর জায়গায় সবার অধিকার। এটা যদি ওর জায়গাও হয় তারপরেও আমাদের অধিকার আছে এখানে পিকনিক করার।

আমি বললাম, ব্যাটা তো মনেহয় পুলিশে খবর দিতে গেল।

শাহীন বলল, পুলিশে খবর দেবে না, কারণ আইন আমাদের পক্ষে। পুলিশে খবর দিলে নিজেই বিপদে পড়বে, তবে সে বন্দুক নিয়ে ফিরে আসতে পারে।

বলো কী?

বন্দুক দিয়ে গুলি করবে না-ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দেখাবে।

আমরা তখন কী করব?

ফাইট দিব। মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলব। এখনো বাঙালি চেনে না।

শাহীন আবারো খানকি বিষয়ক গালিতে ফিরে গেল।

আমি স্তম্ভিত। এ কী বিপদে পড়লাম! আমি একা স্থান ত্যাগের পক্ষে, বাকি সবাই 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচাগ্র মেদেনী' টাইপ মেয়েরা বিশেষ করেই রণরঙ্গিনী। বাঙালি রমণী কী বিষয় তারা তা সুইসদের শিখিয়ে দিতে আগ্রহী।

চ্যালেঞ্জার লুঙ্গি পরে রাইন নদীর সুশীতল জলে সাঁতার কাটছিল। সে উঠে এসে লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরল। লুঙ্গি পরে মারামারি করা যায় না।

আমার সিক্সথ সেন্স বলছিল ওরা ফিরে আসবে না ঝামেলা কে পছন্দ করে!

আমার সিক্সথ সেন্স ভুল প্রমাণিত করে সেই দু'জন গাড়ি করে আবার উপস্থিত হলো। শাহীন বারবিকিউর চুলা থেকে জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ তুলে হাতে নিল। স্বাধীনের দিকে তাকিয়ে দেখি তার হাতে সুইস নাইফ।

দু'জন গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল। তাদের হাতে বন্দুক দেখা গেল না। তবে পিস্তল জাতীয় কিছু পকেটে থাকতে পারে।

শাহীনের সঙ্গে তাদের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো।

সুইস : আমরা সরি বলার জন্যে এসেছি। তোমাকে যে সব গালাগালি করেছি তার জন্যে Sorry, আমাদের এ উপলব্ধি গ্রহণ করলে খুশি হব।

শাহীন : এ উপলব্ধি গ্রহণ করা হলো।

সুইস : তোমরা কোন দেশ থেকে এসেছ?

শাহীন : আমার বন্ধুরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, আমি সুইস নাগরিক।

সুইস : তোমাদের পিকনিক শুভ হোক।

শাহীন : অল্পের জন্যে বাঁচলি, আইজ তরে জানে মাইরা ফেলতাম।

সুইস : কী বললে বুঝতে পারলাম না।

শাহীন : বাংলা ভাষায় বলেছি, তোমাদের ধন্যবাদ।

মহান বাঙালির সম্মান বজায় রইল। শুটিংয়ের শেষে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। আমি ঘোষণা দিলাম, আগামীকাল অফ ডে। আমরা কোনো শুটিং করব না।

হাসানের মুখ শুকিয়ে গেল। শুটিং অফ মানে আরেকদিন বাড়তি থাকা। বাড়তি খরচ। বাড়তি টেনশন।

আমি হাসনকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম, তুমি টেনশন করো না। আমরা Extra কাজ করে আগামীকালের ক্ষতি পুষিয়ে দেব।

আগামীকাল কাজ করবেন না কেন?

আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা। আমি ক্রিকেট খেলা দেখব।

শাহীন বলল, ক্রিকেট খেলা দেখা যাবে না।

কেন দেখা যাবে না?

শাহীন বলল, এখানাকার কোনো বাঙালির বাড়িতে ডিশের লাইন নেই। খরচের ভয়ে তারা ডিশ লাইন নেয় না।

আমি বললাম, রেস্টুরেন্টগুলোতে খেলা দেখার ব্যবস্থা নেই?

সুইসরা ক্রিকেট ভক্ত না। তারা ফুটবল ছাড়া কোনো খেলা দেখে না।

আমি হাসানের দিকে ফিরে বললাম, তোমার দায়িত্ব কাল আমাকে খেলা দেখানো।

হাসান বলল, অবশ্যই।

পাঠকরা ভুলেও ভাববেন না-আমি ক্রিকেটের পোকা, কে কখন কয়টা ছক্কা মেরেছে, কে কতবার শূন্যতে আউট হয়েছে, এসব আমার মুখস্থ। মোটেও না। আমি শুধু বাংলাদেশের খেলা থাকলেই দেখি। অন্য খেলা না।

বাংলাদেশের কোনো খেলা আমি মিস করি না। ঐ দিন আমার সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ। বাংলাদেশের কোনো খেলোয়াড় যখন চার মারে, আমার কাছে মনে হয় চারটা সে মারে নি। আমি নিজে মেরেছি। এবং আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। বাংলাদেশের কোনো বোলার যখন কঠিন বল করে তখন আমার মনের ভাব হচ্ছে-'বলটা কেমন করলাম দেখলিরে ছাগলা? কলজে নড়ে গেছে কি-না বল। আসল বোলিং তো শুরুই করিনি। তোকে আজ পাতলা পায়খানা যদি না করাই আমার নাম হুমায়ূন আহমেদই না।'

আনন্দে চোখে পানি আসার মতো ঘটনা আমার জীবনে অনেকবার ঘটেছে। যে ক'বার বাংলাদেশ ক্রিকেট জিতেছে প্রতিবারই আমার চোখে পানি এসেছে। বাংলাদেশী ক্রিকেটের দুর্দান্ত সব খেলোয়াড়দের ধন্যবাদ। তারা চোখভর্তি পানি নিয়ে আসার মতো আনন্দ একজন লেখককে বারবার দিচ্ছেন। পরম করুণময় এইসব সাহসী তরুণের জীবন মঙ্গলময় করুক, এই আমার শুভকামনা।

আমরা যেখানে আমি (রুখতেনস্টাইন) সেখানে ক্রিকেট খেলা দেখার কোনো ব্যবস্থা হাসান করতে পারল না। তাকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল। সে বাসে করে আমাদের নিয়ে রওনা হলো সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জুরিখে। জুরিখে অনেক বাঙালি, তাদের কারো বাসায় Star Sports কিংবা ESPN তো থাকবেই।

কাউকে পাওয়া গেল না। আমরা পাবে পাবে ঘুরতে লাগলাম। সাধারণত পাবগুলোতে খেলা দেখানো হয়। কোথাও কোথাও গেল না। এই সময় খবর এল জুরিখের একপ্রান্তে অস্ট্রেলিয়ানদের একটা পাব আছে। অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের খেলা সেই পাবে নিশ্চয়ই দেখানো হবে। গেলাম সেখানে, সেই পাবে রাগবি দেখাচ্ছে। আমরা ক্রিকেট দেখতে চাই চাই শুনে পাবের অস্ট্রেলিয়ান মালিক বিস্মিত হয়ে তাকাল।

www.MurchOna.com

স্বাধীন বলল, আমরা তোমাদেরকে একবার হারিয়েছি। আজও হারাব। আমাদের এই আনন্দ পেতে দাও। প্লিজ।

অস্ট্রেলিয়ান মালিক বলল, এসো। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

খেলা আগেই শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাট করছে। অবস্থা কেরোসিন। আমরা আয়োজন করে বসার দশ মিনিটের মধ্যে বাংলাদেশের চারজন খেলোয়াড় আউট।

আমরা মাথা নিচু করে বসে রইলাম। আমি অস্ট্রেলিয়ার পাব মালিককে বললাম, আমরা ঠিক করেছি আজ ক্রিকেট দেখব না। তুমি চ্যানেল বদলে দাও। সবাই রাগবি দেখতে চাচ্ছে। আমরা আসলে রাগবির ভক্ত।

ভ্রমণকাহিনী লেখার কিছু নিয়মকানুন আছে। যে-সব জায়গা দেখা হয় তার বর্ণনা দিতে হয় (ছবিসহ ছবিতে লেখক থাকেন। প্রতিটি ছবির সঙ্গে ক্যাপসন থাকে। নমুনা।

রুখতেনষ্টাইনের রাজপ্রসাদের সামনে লেখক।

লেখকের পাশে তার স্ত্রী শাওন।

রুখতেনষ্টাইন রাজপ্রাসাদ সেখানে মুখ্য না। মুখ্য হলো লেখক এবং লেখক পত্নী হাসি হাসি মুখে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ভ্রমণকাহিনীতে নিজ দেশের সঙ্গে একধরনের তুলনামূলক বিষয়ও থাকতে হবে। দেশে কিছুই নেই, বাইরে স্বর্গ-এই বিষয়টা আসতে হবে। যে-সব জায়গায় লেখক গেলেন, তার বর্ণনা এমনভাবে থাকতে হবে যেন পাঠক পড়তে গিয়ে টাসকি খেয়ে ভাবে-মানুষটা কত জ্ঞানী। নেপোলিয়ানের বাড়ি প্রসঙ্গে লিখতে হবে-কবে কখন নেপালিয়ান এসে রাইন নদী দেখে মুগ্ধ হয়ে এই প্রাসাদ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসীরা এই বাড়ি নিয়ে কী করে ইত্যাদি। এক ফাঁকে নেপোলিয়ানের জীবনীও কিছুটা দিতে হবে। নয়তো পাঠকের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকবে।

আমার নানান সমস্যার একটি হচ্ছে, নিজের দেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশই আমার ভালো লাগে না। পাঠকদের কেউ কেউ হয়তো চোখ কপালে তোলার মতো করে বলবেন-'বাপরে, ব্যাটা দেশপ্রেম ফলাচ্ছে'। আমি কিন্তু আমার কথা প্রমাণ করে দিতে পারি। আমেরিকায় পড়াশোনা শেষ করে সেই দেশেই বিরাট বেতনের চাকরি নিয়ে থেকে যাবার সুযোগ আমার ভালো মতোই ছিল। আমার প্রফেসর বারবারই বলেছেন-'তোমার পরিবারের সবার জন্যেই আমি

সিটিজেনশিপের ব্যবস্থা করছি, তুমি থেকে যাও। দেশে ফিরে কী করবে! আমেরিকা ল্যান্ড অব অপরচুনিটি।' আমি থাকি নি। দুশ' ডলার সঞ্চয় নিয়ে দেশে ফিরে এসেছি।

আমার ঘনিষ্ঠজনরা জানে, আমাদের দেশের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি করানো কতটা কষ্টের। কেন দেশের বাইরে যেতে চাই না? দেশের বাইরের কোনো কিছুই আমাকে স্পর্শ করে না। মনে লাগে না। বাইরে কম সময় কাটাই নি। আমেরিকায় এক নাগাড়ে ছয় বছর কাটালাম। কত বৈচিত্র্যের সুন্দর দেশ। কিন্তু আমার একদিনের জন্যেও মনে হয় নি-এই দেশ আমার হতদরিদ্র দেশের চেয়েও সুন্দর। পৃথিবীর কোন দেশে পাব আমি আমার দেশের উথালপাতাল জোছনা? কোথায় পাব আষাঢ়ের আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি? আমেরিকা থেকে একবার আমি মা'কে চিঠি লিখলাম-অনেকদিন বর্ষার ব্যাঙের ডাক শুনি না। আপনি কি ব্যাঙের ডাক রেকর্ড করে ক্যাসেট করে পাঠাতে পারবেন?

চিঠি পৌছানোর পর আমার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা (আহসান হাবীব, সম্পাদক উন্মাদ) ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে ডোবা ও খন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যথাসময়ে আমার কাছে ব্যাঙের ডাকের ক্যাসেট চলে এল। এক রাতে দেশের ছেলেমেয়েদের বাসায় দাওয়াত করেছি। সবাই খেতে বসেছে, আমি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে ব্যাঙের ডাকের ক্যাসেট ছেড়ে দিলাম। ভেবেছিলাম সবাই হাসাহাসি করবে। অবাক হয়ে দেখি, বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের চোখে অশ্রু চকচক করতে লাগল।

থাক এই প্রসঙ্গ, ভূস্বর্গ সুইজারল্যান্ড সম্পর্কে বলি। এই দেশ ইউরোপের যে-কোনো পাহাড়ি দেশের মতোই। আলাদা সৌন্দর্যের কিছু নেই। আমি আমার হাতের বলপয়েন্টের দোহাই দিয়ে বলছি-আমার দেশের রাঙামাটির সৌন্দর্য সুইজারল্যান্ডের সৌন্দর্যের চেয়ে কোনো অংশেই কম না। তফাত একটাই, আমরা গরিব ওরা ধনী। পরম করুণাময় ধনী-দরিদ্র বিবেচনা করে তাঁর প্রকৃতি সাজান না। তিনি সাজান নিজের ইচ্ছায়।

সুইজারল্যান্ডের মানুষগুলি ভালো। বেশ ভালো। হাসিখুশি। বিদেশীদের দিকে অবহেলার চোখে তাকায় না। আগ্রহ নিয়ে তাকায়। আগ্রহ নিয়ে গল্প করতে আসে। শাওনকে বেশ কিছু বিদেশিনী জিজ্ঞেস করলেন-তুমি চামড়া ট্যান করার জন্যে যে লোশন ব্যবহার করো, তার নাম জানতে পারি?

শাওন বলল, আমাদের চামড়া জন্ম থেকেই এরকম। কোনো লোশন দিয়ে ট্যান করানো হয় নি।

www.MurchOna.com

তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে-তোমরা কত না ভাগ্যবতী!

স্থানীয় অধিবাসীদের মানসিকতা কেমন-তার উদাহরণ হিসেবে একটা ছোট্ট গল্প বলছি। আমাদের নাটকে (রূপালী রাত্রি) আছে ডাক্তার এজাজ এবং ফারুক গ্রামের কামলাশ্রেণীর মানুষ। প্রথমবার সুইজারল্যান্ডের মতো একটা দেশে আসার সুযোগ হয়েছে। তারা স্যুট পরে মহানন্দে সুইজারল্যান্ডের পথে পথে ঘুরছে। যাকেই পাচ্ছে তাকেই বলছে, 'হ্যালো'।

নাটকের একটি দৃশ্য আছে, এরা দুইজন এক সুইস তরুণীকে বলবে, 'হ্যালো'। তরুণী তাদের দিকে তাকাবে। জবাব না দিয়ে চলে যাবে। ডাক্তার এজাজ ফারুককে বলবে-'এই মাইয়া ইংরেজি জানে না।'

সুইজারল্যান্ডের তরুণীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে এক পথচারী তরুণীকে প্রস্তাব করতেই সে রাজি হয়ে গেল। অভিনয় করল। অভিনয় শেষে সে ডাক্তার এজাজকে বলল, তুমি হ্যালো বলেছ, আমি জবাব না দিয়ে চলে গেছি। আমি কিন্তু এরকম মেয়ে না। আমাকে এরকম করতে বলা হয়েছে বলে আমি করেছি। তারপরেও আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

আধুনিক পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরের বিরাট গুরুত্ব। বার্ন শহরের এক পেটেন্ট অফিসের তেইশ বছর বয়সী কেরানি Annals of Physics-এ তিন পাতার একটি প্রবন্ধ লিখে পদার্থবিদ্যার গতিপথই সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিলেন। পেটেন্ট অফিসের সেই কেরানি নাম আলবার্ট আইনস্টাইন। বার্ন শহরে তাঁর একটি মিউজিয়াম আছে। আমার খুব ইচ্ছা হলো এই মিউজিয়ামটা দেখে যাই (মিউজিয়াম দেখার বিষয়ে আমার আগ্রহ নেই। আমি কোথাও বেড়াতে গেলে মিউজিয়াম দেখি না। সমুদ্র, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত দেখি)। শাহীনকে বলতেই সে বলল, কোনো ব্যাপারই না। নিয়ে যাব।

একদিন শাওনকে নিয়ে তার সঙ্গে বের হলাম। সে আমাদের এক ক্যাসিনোতে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, হুমায়ূন ভাই, এই ক্যাসিনো ছোটখাট। এখানে জুয়া খেলে আপনার ভালো লাগবে।

আমি বললাম, আইনস্টাইন সাহেবের খবর কী?

উনার জায়গাটা এখনো বের করতে পারি নি।

ফিজিক্স বাদ দিয়ে জুয়া?

শাহীন খুবই উৎসাহের সঙ্গে বলল, ক্যাসিনোতে জুয়া খেলতে লাইসেন্স লাগে। মেম্বার হতে হয়। আপনাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করেছি।

www.MurchOna.com

ঈশ্বর এবং জুয়া নিয়ে আইনস্টাইনের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে, যে উক্তি পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের শুরুতে আইনস্টাইন থমকে গেলেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্স তিনি মনেপ্রাণে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, ঈশ্বর জুয়া খেলেন না (Good does not play dice), দেখা গেল আইনস্টাইনের বক্তব্য সঠিক না-ঈশ্বর জুয়া খেলেন।

তিনিই যখন খেলতে পারেন-আমার খেলতে অসুবিধা কোথায়? আমি শাওনকে নিয়ে এক টেবিলে বসে অতি দ্রুত পাঁচশ' ডলার হারলাম। শাহীন আনন্দিত গলায় বলল, মজা হচ্ছে না হুমায়ূন ভাই?

আমি বললাম, হচ্ছে।

সে গলা নামিয়ে বলল, আইনস্টাইন ফাইনস্টাইন বাদ দেন। বিদেশে এসেছেন, অঙ্ক করবেন না-কি?

তা তো ঠিকই।

পাঁচশ' হেরেছেনে আরো হারেন-এই একটা জায়গাতেই হারলেও মজা।

জুয়ায় জেতার আনন্দটা কী আমি জানি না। কখনো জিততে পারি নি। আমার জুয়ার ভাগ্য খারাপ। এই লাইনে অতি ভাগ্যবান একজনের নাম স্বাধীন খসরু। তিনি স্ক্রাচ কার্ড নামক একধরনের জুয়া আগ্রহের সঙ্গে খেলেন। এক ইউরো, দুই ইউরো দিয়ে স্কাচ কার্ড কিনেন। কার্ডের বিশেষ জায়গা ঘসা হয়। সেখানে যদি চারটা সাত উঠে আসে বা এই ধরনের কিছু হয় তাহলেই পুরস্কার।

সুইজারল্যান্ডে স্বাধীন খসরু এই কাণ্ড ঘটালেন। কার্ড ঘসার পর যে বস্তু বের হলো তার অর্থ, তিনি বিশ হাজার ইউরো পুরস্কার পেয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে ইউরো পাওয়া যাচ্ছে না। সেদিন এবং তার পরের দিন ব্যাংক বন্ধ। অফিস টফিসও বন্ধ। আমাদের উত্তেজনার সীমা নেই। লক্ষ করলাম, সফরসঙ্গীদের মধ্যে হিংসা কাজ করতে শুরু করেছে। অনেকেই মত প্রকাশ করছে, শেষ পর্যন্ত টাকা পাওয়া যাবে না। সামান্য কার্ড ঘসে কেউ এত টাকা পায়? কোনো একটা ঝামেলা অবশ্যই আছে।

আমি জানি কোনো ঝামেলা নেই। নিউইয়র্কে দু'জন বাঙালির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে- যারা পাঁচ ডলারে স্কাচ কার্ড ঘসে এক মিলিয়ন ডলার করে পুরস্কার পেয়েছেন।

স্বাধীনের কার্ডের লেখা জার্মান ভাষায়। জার্মান ভাষা ভালো জানে এমন

www.MurchOna.com

কয়েকজনকে দিয়ে কার্ড পড়ালাম। তারাও বললেন, ঘটনা সত্যি। এই কার্ড বিশ হাজার ইউরো জিতেছে।

হঠাৎ লাখপতি হয়ে যাওয়ায় স্বাধীন দলছুট হয়ে পড়ল। কেউ তার সঙ্গে ভালোমতো কথা বলে না। সেও আলাদা থাকে। আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে না। নগদ ইউরো খরচ করে রেস্টুরেন্টে খেতে যায়। সঙ্গে থাকে নতুন পাওয়া বান্ধবী। এই বান্ধবী স্বাধীনকে বলেছে, সে যদি সুইজারল্যাণ্ডে থেকে যায় তাহলে স্বাধীনকে সে বিয়ে করতে রাজি আছে। সুইজারল্যান্ডে থেকে যাওয়া তার জন্য তেমন কোনো সমস্যা না। কারণ স্বাধীন ব্রিটিশ নাগরিক, তার পিছুটানও নেই। স্বাধীনকে মনে হলো নিমরাজি।

আমি শঙ্কিত বোধ করলাম। স্বাধীন অতি আবেগপ্রবণ ছেলে। আবেগের বশে বিয়ে করতে বসতে পারে। সমস্যা একটাই, সে আবেগ ধরে রাখতে পারে না। স্বাধীনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। লক্ষ করলাম, সে আমাকেও এড়িয়ে চলছে। নিজেই আগ বাড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো।

আমি : হ্যালো স্বাধীন!

স্বাধীন : (চুপ)

আমি : কনগ্রাচুলেশনস! বিশ হাজার ইউরো পেয়ে গেলে।

স্বাধীন : থ্যাং-কু য়ু।

আমি : তারপর কী ঠিক করলে, এই দেশেই সংসার পাতবে?

স্বাধীন : আমার কাছে সব দেশই সমান। বাংলাদেশে জন্ম হলেও জীবন কেটেছে ইংল্যান্ডে।

আমি : দু'দিনের পরিচয়ে একজনকে বিয়ে করে ফেললে পরে সমস্যা হবে না তো?

স্বাধীন : যখন এরেঞ্জ ম্যারেজ হয় তখন তো স্বামী-স্ত্রীর পূর্বপরিচয় ছাড়াই বিয়ে হয়। তারা সুখী হতে পারলে আমরা কেন হতে পারব না?

আমি : (চুপ)

স্বাধীন : হুমায়ূন ভাই, আমার অনুরোধ-এই বিষয়ে আমাকে আর কিছু বলবেন না।

আমি : বিয়েটা হচ্ছে কবে?

স্বাধীন : একটু দেরি হবে। লাইসেন্স করাতে হবে। আপনারা শুটিং শেষ করে দেশে চলে যান, আমি পরে আসব।

আমি : আরো একটু চিন্তা ভাবনা করলে হতো না?

www.MurchOna.com

স্বাধীন : চিন্তা ভাবনা তো করছি। সারারাতই চিন্তা করি। আগামীকাল সকালে আপনি আমাকে একটু সময় দেবেন? আপনাকে নিয়ে মেয়ের মায়ের বাসায় যাব। এখানে আপনি ছাড়া আমার মুরুব্বি কেউ নেই।

আমি : ঠিক আছে যাব।

মেয়ের মায়ের বাড়িতে যাবার আগে আমরা গেলাম স্কাচ কার্ড দেখিয়ে বিশ হাজার ইউরো তুলতে। সঙ্গে আছে শাহিন। সে জার্মান ভাষা জানে। আমরা জানি না।

কোম্পানির তরুণী কার্ড উল্টেপাল্টে বলল, হ্যাঁ, তোমরা বিশ হাজার ইউরো পেয়েছ।

আমরা তিনজন একসঙ্গে বললাম, থ্যাংক ইউ।

তরুণী বলল, তোমরা টাকা পাবে না। কারণ তোমরা কার্ডটা অতিরিক্ত খোঁচাখুঁচি করে নষ্ট করে ফেলেছ। যেখানে স্কাচ করার কথা না সেখানেও করেছ।

শাহীন বলল, তুমি তো খুবই অন্যায় কথা বলছ।

তরুণী বলল, তুমি লইয়ারের কাছে যেতে পার।

অবশ্যই লইয়ারের কাছে যাব।

আমরা লইয়ারের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, মামলা করলে অবশ্যই আমরা জিতব।

আমি বললাম, মামলা আমরা অবশ্যই করব।

লইয়ার বলল, আমি দশ হাজার ইউরো ফিস নেব। অর্ধেক এখন দিতে হবে।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা ছাড়া আমাদের কিছুই করার রইল না। কে দেবে উকিলকে এত টাকা? আর টাকা দিলেই শেষ পর্যন্ত যে আমরা মামলায় জিতব তার গ্যারান্টি কী?

স্বাধীনের দিকে তাকিয়ে আমার খুবই মায়া লাগল। বেচারা এই টাকার আশায় নিজের যা ছিল সব শেষ করেছে। অন্যের কাছে ধারও করেছে।

সব খারাপ জিনিসের একটা ভালো দিক থাকে। লটারির টাকা না পাওয়ার ভালো দিকটা হলো স্বাধীন ঘোষণা করল-এই পচা দেশে থাকার প্রশ্নই উঠে না। বিয়ে তো অনেক পরের ব্যাপার।

সুইজারল্যান্ডে বাসের সময় শেষ হলো। কী দেখলাম ?

ক. ছবির মতো সুন্দর কিছু জায়গা। সবই সাজানো। জঙ্গলের গাছগুলিও হিসাব করে লাগানো। কোন গাছের পর কোন গাছ, কত দূরত্বে-সব মাপা।

খ. অতি আধুনিক কেতায় সাজানো কিছু শপিংমল। পৃথিবীর হেন কোনো বস্তু

নেই যা সেখানে নেই। দামেরও কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। দেশটা অতি ধনী। এদের ক্রয়ক্ষমতা অনেক অনেক বেশি। জিনিসের দাম তো হবেই। রুপার কৌটায় এক কৌটা টুথপিক বিক্রি হচ্ছে বাংলাদেশী টাকায় পঁচিশ হাজার টাকায়। যেখানে দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচানোর কাজ সারা যায়, সেখানে কেন পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করা হবে?

গ. দেখলাম কিছু সুখী মানুষ। অর্থনীতির কঠিন চাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষ। যাদের পেছনে আছে ক্ষমতাধর এক রাষ্ট্র। উদাহরণ দেই-এক সুইস নাগরিক অস্ট্রিয়ায় স্কি করতে গিয়ে আহত হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র সুইজারল্যান্ড থেকে হেলিকপ্টার গেল। তাকে হেলিকপ্টারে নিজ দেশে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো।

এই দেশের সুখী মানুষদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ নেই। তারা এক ভুবনের বাসিন্দা, আমরা অন্য ভুবনের। আমরাই শুধু বলতে পারি-

অর্থ নয় কীর্তি নয় স্বচ্ছলতা নয়
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে খেলা করে
আমাদের ক্লান্ত করে।

ওরা এই কথা বলে না, কারণ অর্থশূন্য জীবন তাদের কল্পনাতে নেই।

বিদায় সুইজারল্যান্ড।

বিদায় ভূস্বর্গ।

www.MurchOna.com

চন্দ্রযাত্রা

একটা ধাঁধা দিয়ে শুরু করি। চার অক্ষরে নাম এমন এক দেশ, যে নামে শুনলেই বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের মানুষের চোখ চকচক করতে থাকে। হিন্টস দিচ্ছি-আ দিয়ে শুরু। শেষ অক্ষর কা।

হয়েছে-আমেরিকা।

এই দেশে যাবার জন্যে জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হওয়া মানুষদের আতঙ্কে অধীর হয়ে আমেরিকান অ্যাম্বেসিতে বসে থাকতে দেখেছি। সঙ্গে দলিল দস্তাবেজ। বাড়ির দলিল, জমির দলিল, গাড়ির ব্লু বুক, ব্যাংকের কাগজ। তাঁরা প্রমাণ করবেন যে, দেশে তাঁদের যথেষ্ট বিষয়-আশয় আছে। ভিজিট ভিসায় বেড়াতে গেলেও ফিরে আসবেন। আল্লাহর কসম ফিরে আসবেন।

ভিসা রিজেক্ট হওয়ায় ভিসা অফিসে জনৈক বৃদ্ধ শোকে হার্টফেল করে মারা গেছেন-এই খবর 'প্রথম আলো' পত্রিকায় পড়েছি।

আমি একজনকে জানি যিনি দেশের সব মাজার জিয়ারত করে আজমির শরিফ যাচ্ছেন খাজা বাবার দোয়া নিতে। খাজা বাবার দোয়া পেলে ভিসা অফিসারের মন গলবে, তিনি স্বপ্নের দেশে যেতে পারবেন। ইউরোপ আমেরিকা যাবার ব্যাপারটা না-কি খাজা বাবা কন্ট্রোল করেন।

আমেরিকা নামক এই স্বপ্নের দেশে আমাকে দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী কাটাতে হয়েছে। ছয় বছরের বেশি। পিএইচডি করলাম। পিএইচডি শেষ করে Post Doc করলাম। দেশে ফেরার পরেও আরো চার-পাঁচবার যেতে হলো। আমেরিকা নিয়ে বেশ কয়েকটা বইও লিখলাম। হোটেল গ্রেভার ইন, যশোহা বৃক্ষের দেশে, মে ফ্লাওয়ার। শেষবার আমেরিকায় গেলাম নুহাশকে নিয়ে। পিতা-পুত্রের যুগলবন্দি ভ্রমণ। ফেরার পথে দু'জনই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। নুহাশ ক্রমাগত বমি করছে, গায়ে জ্বর। আমার বুকে ব্যথা। আমি আতঙ্কগ্রস্ত। বুকের এই ব্যথা মানে হার্টবিষয়ক জটিলতা নয়তো? যদি সে-রকম কিছু হয়, দু'জনকেই প্লেন থেকে

www.MurchOna.com

নামিয়ে দেবে। আমাকে ভর্তি করবে হাসপাতালে। নয় বছর বয়েসি নুহাশ তখন কী করবে?

দেশে ফিরে ঠিক করলাম, আর না। অতি দূরের দেশে আর যাব না। আমেরিকায় কখনো না।

তারপরেও ব্যাগ-স্যুটকেস গোছাতে হলো। আবার আমেরিকা। তবে এবার অন্য একজনের তল্পিবাহক হিসেবে। সেই অন্য একজনের নাম মেহের আফরোজ শাওন। সে চন্দ্রকথা ছবিতে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছে। বলিউড অ্যাওয়ার্ড। জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার দেয়া হবে।

আমার জন্যেও কী কী পুরস্কার যেন আছে। পুরস্কার নেবার জন্যে আমেরিকায় যাবার মানুষ আমি না। আমি যাচ্ছি শাওনের জন্যে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, শাওনের নতুন দেশ দেখার আগ্রহ যেমন আছে, পুরস্কার নেবার আগ্রহও আছে।

এখন বিদেশে পুরস্কার বিষয়ে কিছু বলি। বেশ কয়েক বছর ধরে এটা শুরু হয়েছে। লন্ডন, আমেরিকা এবং দুবাই-এ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়।

শ্রেষ্ঠ গায়ক
শ্রেষ্ঠ গায়িকা
শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী
শ্রেষ্ঠ নায়ক
শ্রেষ্ঠ নায়িকা
.....

অনেক ক্যাটাগরি। বড় হল ভাড়া করা হয়। টিকিট বিক্রি করা হয়। টিকিট বিক্রির টাকাতেই খরচ উঠে আসে। টিভি রাইট বিক্রি হয়, সেখান থেকে টাকা আসে। সবচে বেশি আছে স্পন্সরদের কাছ থেকে। স্পন্সরের ব্যাপারটা খোলাসা করি। মনে করা যাক, আপনি একজন জনপ্রিয় নায়িকা। আপনাকে একটি পুরস্কার (ভারী ক্রেস্ট, ঠিকমতো ধরতে হবে। হাত ফসকে পায়ে পড়লে জখম হবার সমূহ সম্ভাবনা) দেয়া হবে। যিনি পুরস্কার হাতে তুলে দেবেন তিনিই স্পন্সর। তিনি পুরস্কার দেবার সময় হাসিমুখে আপনার সঙ্গে ছবি তুলবেন। আপনার বিষয়ে এবং নিজের বিষয়ে দু'টি কথা দশটি কথাতে গড়াবে। পুরো সময়টাতে বিনয়ী ভঙ্গি করে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

রাত ন'টার দিকে আমি এবং শাওন পৌঁছলাম নিউ ইয়র্কের হোটেল রেডিসনে। পুরস্কার কমিটি আমাদেরকে সেখানেই রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

www.MurchOna.com

হোটেল লবিতে পৌঁছে মোটামুটি বেকায়দা অবস্থায় পড়লাম। শিল্পীরা চারদিকে ঘুরঘুর করছেন। তাদের কারোর সঙ্গেই আমার তেমন পরিচয় নেই। মহিলা শিল্পীরা সবাই সঙ্গে তাদের গার্জেন নিয়ে এসেছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মা, তারা সিরিয়াস সাজ দিয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক ঘসে টকটকে লাল করে মহানন্দে ঘুরছেন। তাঁদের আনন্দ চোখে পড়ার মতো। শিল্পী কন্যাদের কারণে আমেরিকা ভ্রমণ বিনে পয়সায় হচ্ছে। আনন্দিত হবারই কথা। এমন গুণী মেয়ে পেটে ধরা সহজ কর্ম না। এই ক্যাটাগরির এক মা আবার আমাকে চিনে ফেলে কাছে এসে জানতে চাইলেন-শিল্পী যারা এসেছেন তাদের জন্যে ডেইলি কোনো অ্যালাউন্স আছে কিনা। আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে জানালাম, এই বিষয়টি আমি জানি না। তিনি বললেন, থাকা উচিত। তিনি এর আগে মেয়ের সঙ্গে লন্ডনে পুরস্কার নিতে গেছেন, সেখানে মেয়েকে হাতখরচ দেয়া হয়েছে।

আমি বললাম, ও আচ্ছা।

ভদ্রমহিলা বললেন, বুঝলেন হুমায়ূন ভাই, নিজ থেকে চেয়ে নিতে হবে। অনুষ্ঠানের আগেই নিতে হবে। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে আয়োজকরা আপনাকে চিনতেই পারবে না।

আমি আবারো বললাম, ও আচ্ছা।

ভদ্রমহিলা এই পর্যায়ে নতুন কাউকে আবিষ্কার করে তাঁর দিকে ছুটে গেলেন। সম্ভবত তিনি আয়োজকদের কেউ।

অনেক রাতে আমাদের জন্যে ঘরের ব্যবস্থা হলো। জানানো হলো, গণখাবারের ব্যবস্থা আছে। কুপন দেখিয়ে খেতে হবে। কোনো এক প্রতিষ্ঠান খাবার স্পন্সর করেছে। কোথায় গিয়ে খাব, কুপনই বা কোথায় পাব, কিছুই জানি না। শাওন বলল, চল বাইরে চলে যাই। ম্যাকডোনাল্ডের হামবার্গার খেয়ে আসি। আমি খুব উৎসাহ বোধ করছি না। প্রথমত, রাত অনেক হয়ে গেছে-ম্যাকডোনাল্ড খুঁজে বের করা সমস্যা হবে। দ্বিতীয়ত, নিউ ইয়র্ক খুব নিরাপদ শহরও নয়।

আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন ব্যান্ড তারকা জেমস। নিজেই খাবার এনে দিলেন। আর কিছু লাগবে কি-না অতি বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তার ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তাকে বললাম, আপনার মা নিয়ে গাওয়া গানটি শুনেছি। মা নিয়ে সুন্দর গান করলেন, শাশুড়িকে নিয়ে গান নেই কেন? প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, শাশুড়িরা জামাইকে মায়ের চেয়েও বেশি আদর করে।

আমার কথা শুনে ঝাঁকড়া চুলের জেমস কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে

www.MurchOna.com

তাকিয়ে হঠাৎই হোটেল কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করলেন। এমন প্রাণময় হাসি আমি অনেক দিন শুনি নি।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি জমকালো। লোকে লোকারণ্য। সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। আয়োজকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা। উত্তেজনার মূল কারণ, একজন ভারতীয় শিল্পী রাণী মুর্খাজি (ছায়াছবি ব্ল্যাক খ্যাত) দয়া করে পুরস্কার নিতে রাজি হয়েছেন। তিনি না কি যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারেন। শুধু পুরস্কার হাতে তুলে নেবেন- এই কারণে তাকে বিপুল অঙ্কের ডলার দিতে হচ্ছে। এই নিয়েও আয়োজকদের দুশ্চিন্তা নেই। কারণ স্পন্সরদের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে এই বিশেষ পুরস্কারটি স্পন্সর করা নিয়ে। ডলার কোনো সমস্যা না, রাণী মুখার্জির হাতে পুরস্কার তুলে দেয়ার দুর্লভ সম্মান পাওয়াটাই সমস্যা।

রাণী মুর্খাজি এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে বডিগার্ড। বাংলাদেশের অনেক শিল্পী এবং শিল্পীর মায়েরা আধাপাগল হয়ে গেলেন। তাদের আহ্লাদী দেখে আমি দূর থেকে লজ্জায় মরে গেলাম। একবার মনে হলো, জাতিগতভাবেই কি আমরা হীনমন্য? কবে আমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস ফিরে পাব? রাণী মুর্খার্জিকে নিয়ে আহ্লাদীর একটা উদাহরণ দেই। আমাদের দেশের একজন অভিনেত্রী ছুটে গেলেন। গদগদ ভঙ্গিতে ইংরেজি এবং হিন্দি মিশিয়ে বললেন, আমি বিশ্বাস করছি না আমি আপনাকে চোখের সামনে দেখছি। আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনাকে একটু জড়িয়ে ধরতে চাই।

রাণী মুখার্জি : Please no. You can take picture.

বাংলাদেশী অভিনেত্রী : আমি কোনো কথা শুনব না। আমি আপনাকে ছুঁয়ে দেখবই।

রাণী মুখার্জি : Don't touch me. Take picture.

বাংলাদেশী অভিনেত্রী : আপনার সঙ্গে হ্যান্ডশেক না করলে আমি মরেই যাব।

রাণী মুর্খার্জি নিতান্ত অনিচ্ছায় এবং বিরক্তিতে হাত বাড়ালেন। বাংলাদেশের নামি অভিনেত্রী সেই হাত কচলাতে লাগলেন।

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম জীবনে কখনো বিদেশে কোনো পুরস্কার নিতে যাব না। এই জাতীয় দৃশ্য দ্বিতীয়বার দেখার কোনো সাধ আমার নেই।

বাংলাদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে যেমন হীনমন্যতার ব্যাপার আছে, লেখকদের মধ্যেও আছে। তার একটি গল্প করি।

বাংলাদেশে জনৈক লেখক (নাম বলতে চাচ্ছি না) গিয়েছেন কোলকাতায়।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করবেন। বাড়ি খুঁজে বের করে অনেকক্ষণ কলিংবেল টেপাটেপি করলেন। তাঁকে অবাক করে দিয়ে সত্যজিৎ রায় নিজেই দরজা খুললেন। তবে পুরোপুরি খুললেন না। প্রবেশপথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। লেখক বৈঠকখানায় ঢুকতে পারছেন না। লেখক বললেন, আমার নাম .... আমি বাংলাদেশের একজন লেখক। নানান বিষয়ে বিশেষ করে শিশুসাহিত্যে আমার প্রচুর বই প্রকাশিত এবং সমাদৃত হয়েছে।

সত্যজিৎ : ও আচ্ছা।

লেখক : আমি আপনার ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর উপর বিশাল একটি বই লিখেছি।

সত্যজিৎ : ও আচ্ছা।

লেখক : আমি আপনার বাবা সুকুমার রায়ের জীবন ও কর্ম নিয়ে একটা বই লিখেছি।

সত্যজিৎ : হুঁ।

লেখক : আমি আপনার উপরও একটি বই লিখেছি।

সত্যজিৎ : ধন্যবাদ।

লেখক : আপনার উপর লেখা বইটি আমি নিজের হাতে আপনাকে দিতে এসেছি।

সত্যজিৎ : আমার বাড়িটা ছোট। এত বই রাখার জায়গা আমার নেই। কিছু মনে করবেন না।

সত্যজিৎ রায় ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি এই গল্পটি অনেকের কাছে শুনেছি। সর্বশেষ শুনেছি 'প্রথম আলো' পত্রিকার সাজ্জাদ শরীফের কাছে। যারা বাংলাদেশের ঐ লেখকের নাম জানতে আগ্রহী, তারা সাজ্জাদ শরীফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্থান : হোটেল রেডিসনের ঘর।

সময় : সকাল দশটা।

হোটেলের রুম সার্ভিসকে টেলিফোন করেছি নাশতা দিয়ে যাবার জন্যে। নিজের টাকা খরচ করে খাব, আয়োজকদের উপর ভরসা করব না। রুম সার্ভিস থেকে আমাকে জানানো হলো, বাংলাদেশের গেস্টদের যে সব ঘর দেয়া হয়েছে সেখানে রুম সার্ভিস নেই।

ভালো যন্ত্রণায় পড়লাম। নাশতার কুপনও নেই। জেমসকেও আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না যে তার কাছে সাহায্য চাইব। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

কেউ যেন অতি সাবধানে দু'বার বেল টিপেই চুপ করে গেল। আর সাড়াশব্দ নেই। আমি দরজা খুলে হতভম্ব। হাসি হাসি মুখে তিন মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। একজন 'অন্যদিন' পত্রিকার সম্পাদক মাজহার। সে এসেছে বাংলাদেশ থেকে। আরেকজন অভিনেতা স্বাধীন, সে এসেছে লন্ডন থেকে। তৃতীয়জন এসেছে কানাডা থেকে, 'অন্যদিন'-এর প্রধান সম্পাদক মাসুম। বর্তমানে কানাডা প্রবাসী। তারা তিনজন যুক্তি করে আমাকে কোনো কিছু না জানিয়ে একই সময় উপস্থিত হয়েছে শুধুমাত্র আমাকে এবং শাওনকে সারপ্রাইজ দেবার জন্যে।

আমরা সারপ্রাইড হলাম, আনন্দিত হলাম, উল্লসিত হলাম। আমার জীবনে আনন্দময় সঞ্চয়ের মধ্যে এটি একটি। তারা অতি দ্রুত রেন্ট-এ-কার থেকে বিশাল এক গাড়ি ভাড়া করে ফেলল। যতদিন আমেরিকায় থাকব ততদিন এই গাড়ি আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা যেখানেই ইচ্ছা সেখানে যাব।

কোথায় যাওয়া যায়?

আমেরিকায় মুগ্ধ হয়ে দেখার জায়গার তো কোন অভাব নেই। পর্বত দেখতে হলে আছে Rocky mountain, জনডেনভারের বিখ্যাত গান Rocky mountain high, সমুদ্র দেখতে হলে ক্যালিফোর্নিয়া। জঙ্গল দেখতে হলে-মন্টানার রিজার্ভ ফরেস্ট, ন্যাশনাল পার্ক। গিরিখাদ দেখতে হলে-গ্রান্ড কেনিয়ন। যে গ্রান্ড কেনিয়ন দেখে লেখক মার্ক টুয়েন বলেছিলেন, যে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না সে গ্রান্ড কেনিয়ন দেখলে ঈশ্বর বিশ্বাসী হতে বাধ্য।

প্রকৃতির বিচিত্র খেলা দেখতে উৎসাহী? তার জন্যেও আমেরিকা। আছে ওল্ড ফেইথফুল। ঘড়ির কাঁটার নিয়মে বিপুল জলরাশি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উঠে আসে আকাশে। আছে যশোহা বৃক্ষ নামের অদ্ভুত বৃক্ষের বন। দেখলে মনে হবে অন্য কোনো গ্রহে চলে এসেছি। আছে ক্রিস্টাল কেভস। মাটির গভীরে বর্ণাঢ্য ক্রিস্টালের গুহা। দেখলে মনে হবে হীরকখণ্ড দিয়ে সাজানো। আছে প্যাট্রিফায়েড ফরেস্ট। পুরো জঙ্গল অতি বিচিত্র কারণে পাথর হয়ে গেছে। যে জঙ্গলে ঢুকলেই রূপকথার জাদুকরদের কথা মনে হয়।

কোথায় কোথায় যাওয়া হবে, কী কী দেখা হবে তা নিয়ে পুরো একদিন গবেষণার পর আমরা রওনা হলাম আটলান্টিক সিটিতে। শাওনের ধারণা হলো নিশ্চয় অপূর্ব কিছু দেখতে যাচ্ছি। সে যতই জানতে চায় আটলান্টিক সিটিতে কী আছে আমি ততই গা মুচড়ামুচড়ি করি। ভেঙে বলি না। কারণ আটলান্টিক সিটি হলো গরিবের লাস ভেগাস। জুয়া খেলার ব্যবস্থা ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। একজন বঙ্গললনাকে তো বলা যায় না, আমরা যাচ্ছি জুয়া খেলতে। বঙ্গললনারা

সবাই 'দেবদাস' পড়েছেন। মদ এবং জুয়া কী সর্বনাশ করে তা তারা জানেন।

পবিত্র কোরান শরীফে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে-'দুইয়ের মধ্যেই মানুষের জন্যে কিঞ্চিৎ উপকার আছে। তবে উপকারের চেয়ে ওদের দোষই বেশি।' (সূরা বাকারা, ২-২১৯)

সূরা বাকারার এই আয়াতটির অনুবাদ একেক জায়গা একেক রকম দেখি। নিজে আরবি জানি না বলে আসল অনুবাদ কী হবে বুঝতে পারছি না। আরবি জানা কোনো পাঠক কি এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবেন?

অনেক অনুবাদে আছে-'উপকারের চেয়ে ওদের অপকারই বেশি। এর পরেও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?'

আবার অনেক অনুবাদে 'এরপরেও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?' অংশটি নেই। এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের কোরান শরীফ সরল বঙ্গানুবাদ, সেখানে 'এরপরেও কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না' অংশটি নেই।

জুয়াতে যে 'কিঞ্চিৎ উপকার' আছে তার প্রমাণ মাজহার আটলান্টিক সিটিতে পৌঁছামাত্র পেল। স্লট মেশিনে প্রথমবারই Jack pot, ট্রিপল সেভেন। একটা কোয়ার্টার ফেলে সে পেল সাত হাজার ইউএস ডলার। ঢাকা-নিউইয়র্ক যাওয়া-আসার খরচ উঠে গেল।

কাছের কাউকে জ্যাকপট পেতে আমি কখনো দেখি নি। ব্যাপারটায় অত্যন্ত আনন্দ পেলাম। আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না, কারণ মাজহার আবারো একটি জ্যাকপট পেল। প্রিয়জনদের সামান্য উন্নতি সহ্য করা যায়। বেশি সহ্য করা যায় না। মানুষ হিংসুক প্রাণী।

আমরা কেউ মাজহারের সঙ্গে কথা বলি না। সে চৌদ্দ হাজার ডলারের মালিক। বাংলাদেশি টাকায় ১২ লাখ টাকা। মেশিনের হ্যান্ডেল কয়েকবার টেনে বার লক্ষ টাকা যে পায় তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অর্থহীন। আমরা যে মাজহারকে পাত্তা দিচ্ছি না সে এটা বুঝতেও পারছে না। নিজের মনে মহানন্দে নানাবিধ জুয়া খেলে যাচ্ছে-রুলেট, ফ্লাশ, স্পেনিশ টুয়েন্টি ওয়ান। জুয়া খেলার টাকার অভাব এখন আর তার নেই। বড় বড় দান ধরে সে আশেপাশের সবাইকে চমকে দিচ্ছে। আরবের শেখ গুষ্টি পর্যন্ত চমকিত।

এক ফাঁকে বলে নেই-ধর্মপ্রাণ (?) এবং ধনবান আরবদের একটি বড় অংশ আমেরিকায় আসেন জুয়া খেলতে। রুলেটের টেবিলে গম্ভীর ভঙ্গিতে বসে থাকেন। তাঁদের হাতে থেকে তসবি। সামনের গ্লাসে অতি দামি হুইস্কি। জুয়া এবং মদ্যপানের মধ্যেও তাঁরা মহান আল্লাহকে ভুলেন না। তসবি টানতে থাকেন।

www.MurchOna.com

সূরা বাকারার আয়াত মাজহারের ক্ষেত্রে খেটে গেল। সন্ধ্যা নাগাদ তার সব জেতা টাকা চলে গেল। নিজের পকেট থেকেও গেল। কত গেল এটা সে বলে না। প্রশ্ন করলে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। সে বলল, এটা শয়তানের আখড়া। শয়তানের আখড়ায় আর এক মুহূর্ত থাকা ঠিক না। আমাদের এক্ষুনি অন্য কোথাও চলে যাওয়া প্রয়োজন। আমেরিকায় এত কিছু আছে দেখার, সেইসব বাদ দিয়ে ক্যাসিনো ভ্রমণ, ছিঃ!

মাজহারের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে আটলান্টিক সিটি ছেড়ে আমরা রওনা হলাম ওয়াশিংটন ডিসির দিকে। ওয়াশিংটন ডিসি হলো মিউজিয়াম নগরী। কতকিছু আছে দেখার। এক স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়ামেই তো দু'দিন কাটিয়ে দেয়া যায়। সেখানে আছে রাইট ব্রাদার্সের বানানো প্রথম বিমান। যে লুনার মডিউল চাঁদে নেমেছিল, সেই লুনার মডিউল। চাঁদের পাথর। যে পাথর হাত রেখে ছবি তোলা যায়।

আমাদের গাড়ি হাইওয়ে দিয়ে ছুটছে। ঘণ্টা দুই পার হয়েছে, হঠাৎ আমাদের মনে হলো গভীর রাতে আমরা ওয়াশিংটন পৌছব। হোটেল ঠিক করা নেই। সমস্যা হতে পারে। সঙ্গে মেয়েছেলে (শাওন) আছে। মেয়েছেলে না থাকলে অন্য কথা। তারচে' বরং আটলান্টিক সিটিতে যাই। সেখানে হোটেলে আরামে রাত কাটিয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

আমরা আটলান্টিক সিটিতে পৌছেই ক্যাসিনোতে ঢুকে গেলাম। মাজহার আরো হারল।

পরদিন শাওন খুব হৈচৈ শুরু করল। মেয়েদের বেশির ভাগ হৈচৈ যুক্তিহীন হয়। তারটায় যুক্তি আছে। সে বলল, আমি জীবনে প্রথমবার আমেরিকায় এসেছি। আবার আসতে পারব কিনা তার নেই ঠিক। আমি কি স্লট মেশিনের জঙ্গল দেখে বেড়াব? আর কিছুই দেখব না?

তাকে শান্ত করার জন্যে পরদিন রওনা হলাম ফিলাডেলফিয়া। ফিলাডেলফিয়াতে ক্রিস্টাল কেইভ দেখব। কিছু ভুতুড়ে বাড়ি আছে (Haunted house), সে সব দেখব। ভূতরা দর্শনার্থীদের নানাভাবে বিরক্ত করে। কিছু কিছু ভূত আবার দৃশ্যমানও হয়। আমার অনেক দিনের ভূত দেখার শখ। তার জন্যে ফিলাডেলফিয়া ভালো শহর।

বিকেলে এক রেস্টুরেন্টে চা খাবার পর মনে হলো-টিকিট কেটে ভূত দেখা খুবই হাস্যকর ব্যাপার। ভূত ছাড়া এই শহরে দেখারও কিছু নেই। Crystal cave-ও তেমন কিছু না। ঝলমলে কিছু ডলোমাইট। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করি কোথায় যাওয়া যায়।

www.MurchOna.com

শাওন বলল, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্যে সেই আটলান্টিক সিটিতেই যেতে হবে? এখানে মাথা ঠাণ্ডা হবে না?

আমি বললাম, অবশ্যই হবে। তবে এখানে হোটেলের ভাড়া অনেক বেশি। আটলান্টিক সিটিতে সস্তা।

আবারো গাড়ি চলল আটলান্টিক সিটির দিকে। সফরসঙ্গীরা ফিলাডেলফিয়াতে এসে মুষড়ে পড়েছিল। আবারো তাদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গেল। স্বাধীন অতি আনন্দের সঙ্গে বলল, হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর মজাই অন্যরকম।

প্রিয় পাঠক সম্প্রদায়, আপনারা যদি মনে করেন আমরা আটলান্টিক সিটির জুয়াঘর ছাড়া আমেরিকায় আর কিছুই দেখি নি তাহলে ভুল করবেন।

আর কিছু না দেখলেও আমরা নায়েগ্রা জলপ্রপাত নামক বস্তুটি দেখেছি। প্রমাণস্বরূপ ছবি দিয়ে দিলাম। আমরা যেন পাহাড় ভেঙে নামা বিপুল জলধারা ভালোমতো দেখতে পারি, প্রকৃতির এই মহাবিস্ময় পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি, তার জন্যে দু'দিন দু'রাত নায়েগ্রাতেই পড়েছিলাম। এখানে অবশ্যি রাজনীতিবিদদের ভাষায় একটি সূক্ষ্ম কারচুপি আছে। নায়েগ্রাতে ক্যাসিনো আছে। এদের জুয়া খেলার ব্যবস্থাও অতি উত্তম।

www.MurchOna.com
==

এলেম শ্যামদেশে

শ্যামদেশের আমি নাম দিয়েছি 'গা-টেপাটেপির দেশ'। যে-দেশের প্রধান পণ্য Massage, সে-দেশের এই নাম খুব খারাপ নাম না। 'থাই ম্যাসাজ পৃথিবীর সেরা' বলে কোনো জাতি সে অহঙ্কার করতে পারে এই ধারণাই আমার ছিল না। সব নাকবোঁচা জাতির কাছে কি এই দলাইমলাই অতি গুরুত্বপূর্ণ? খাড়া নাকের মানুষদের মধ্যে তো এই প্রবণতা নেই।

মঙ্গোলীয় জাতি ঘোড়া নির্ভর ছিল। ঘোড়াকে প্রতিদিন দলাইমালাই করতে হতো। ব্যাপারটা কি সেখান থেকে এসেছে? ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘ পথপরিক্রমায় শরীর ব্যথা। সেই ব্যথা সারাবার জন্যে ম্যাসাজ। ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তার দলাইমশাই রেখে গেছে, ব্যাপারটা কি এরকম? পাখি চলে গেছে কিন্তু তার পালক রেখে গেছে।

শ্যামদেশ ভ্রমণের ব্যাপারে আমাকে প্রথম যিনি আগ্রহী করতে চেষ্টা করেন তাঁর নাম মাহফুজুর রহমান খান। আমার ক্যামেরাম্যান। ব্যাংককের 'পাতায়া' নামক জায়গার কথা বলতে গিয়ে তাঁর চোখ সবসময় ভেতর থেকে খানিকটা বের হয়ে আসে। চেহারায় 'আহা আহা' ভাব চলে আসে।

কী জায়গা! স্যার, একবার যেতেই হবে। পাতায়া না গেলে মানব জীবনের বিরাট অংশই বৃথা। স্যার, বলেন কবে যাবেন পাতায়া? আমি যত কাজই থাকুক, আপনার সঙ্গে যাব।

এই ধরনের অতি উচ্ছ্বাসে কিছুটা আগ্রহ দেখানো ভদ্রতা। আমি ভদ্রতার ধারেকাছে না গিয়ে বলি-গা টেপার দেশে আমি যাব না।

মাহফুজুর রহমান খান বললেন, আপনি গা টেপাবেন না। সেখানে মসজিদ আছে। আপনি মসজিদে নফল নামাজ পড়বেন।

ব্যাংকক বিষয়ে দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস পাওয়া গেল শাওনের কাছে। মাহফুজুর রহমান 'পাতায়া'। শাওন 'ফুকেট'। ফুকেটের নীল সমুদ্র, স্কুভা ডাইভিং, দূরের নীল পাহাড়, অতি সস্তায় কেনাকাটা! ইত্যাদি।

www.MurchOna.com

আমার কাছে একটি গ্রন্থ আছে, নাম 'পৃথিবীর এক হাজার একটি অপূর্ব প্রাকৃতিক বিস্ময়, মৃত্যুর আগে যা দেখা তোমার অবশ্য কর্তব্য।' (1001 Natural wonders you must see before you die) বইটি প্রায়ই আমি নেড়েচেড়ে দেখি। মৃত্যু তো ঘনিয়ে এল-এক হাজার একের কয়টায় ক্রস মার্ক দিতে পারলাম তার হিসাব। বইটিতে বাংলাদেশের একটি মাত্র এন্ট্রি 'সুন্দরবন'। যেন সুন্দরবন ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই। মাহফুজ-শাওনের প্রায় স্বপ্নপুরী শ্যামদেশের ব্যাপারে বইটি কী বলছে দেখতে গিয়ে পাতা উল্টালাম। আমি হতভম্ব। শ্যামদেশের এন্ট্রি আছে তেত্রিশটি-কেয়ং সোফা জলপ্রপাত, ফু রুয়া রক ফার্মশন, দুই ইনথন পর্বত...। এর মধ্যে একটা এন্ট্রি আমার মন হরণ করল Naga Fireballs. এখানের ঘটনা হচ্ছে, প্রতিবছর এগারো চন্দ্রমাসের পূর্ণচন্দ্রের রাতে মেকং নদীর একশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য জুড়ে নদীর ভেতর থেকে শত শত আগুনের গোলা উঠে আসে। অগ্নিগোলক টেনিস বল আকৃতির। সাড়ে তিনশ' ফুট উঁচুতে উঠে মিলিয়ে যায়। যার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিতে পারছে না।

মৃত্যুর আগে আর কিছু দেখি না দেখি পূর্ণিমায় আগুনের গোলা দেখতেই হবে। আমি আমার ভ্রমণ বিষয়ক পোর্টফোলিওর প্রধান মাজহারকে ডেকে বললাম, ম্যাসাজ করাবে?

সে কাচুমাচু হয়ে বলল, জি-না। ম্যাসাজের অভ্যাস আমার নেই।

আমি বললাম, অভ্যাস নেই অভ্যাস করাবে। প্রথম প্রথম সিগারেট টানতে কুৎসিত লাগে। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে মহানন্দ। বিয়ারের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার-প্রথম চুমুকে তিতা বিষের মতো এক বস্তু, তারপর ক্যায়া মজা! যাই হোক, ব্যাংককে যাব মনস্থ করেছি। ব্যবস্থা করো।

মাজহার একদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেলল। প্যাকেজ প্রোগ্রাম। পৃথিবী প্যাকেজের আওতায় চলে এসেছে, সবকিছুতেই প্যাকেজ।

আমরা যথাসময় ব্যাংককের এয়ারপোর্টে নামলাম। দেশের বাইরে বাংলা নামের এয়ারপোর্ট 'সুবর্ণভূমি'। বিদেশের মাটিতে পা দিয়ে আমাদের সফর সঙ্গীদের একজন আনন্দে এবং উত্তেজনার আধিক্যে বমি করে নিজেকে ভাসিয়ে ফেলল। এই সফরসঙ্গী সর্বকনিষ্ঠ, বয়স ছয়মাস। নাম অন্বয় মাজহার। ছয়মাস বয়েসি আমাদের আরেকজন সফরসঙ্গী আছে, তবে তার ছয়মাস মায়ের পেটে। শাওন তার সন্তান পেটে নিয়েই ঘুরতে বের হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে মায়ের আবেগ, অনুভূতি এবং উচ্ছ্বাস গর্ভস্থ সন্তান বুঝতে পারে। সেই অর্থে

www.MurchOna.com

শাওনের সন্তান ও সফর অনুভব করছে ধরে নেয়া যায়। পেটের ভেতরে হয়তো আনন্দে খাবি খাচ্ছে।

আমি এখন পর্যন্ত যে ক'টি দেশ দেখেছি তার প্রতিটিকেই (একমাত্র নেপাল ছাড়া) বাংলাদেশ থেকে উন্নত মনে হয়েছে এবং মনটা খারাপ হয়েছে। মন খারাপের একমাত্র কারণ-আমরা এত পিছিয়ে কেন! আমার সব বিদেশ ভ্রমণ মন খারাপ দিয়ে শুরু। কী সুন্দর ঝকঝকে রাস্তা! বাই লেন, ট্রাই লেন। কী সুন্দর শৃঙ্খলা। ট্রাফিক আইন কঠিনভাবে মানা হচ্ছে। দেশে সামরিক শাসন অথচ একটি মিলিটারিও চোখে পড়ছে না। আমরা যাচ্ছি পাতায়ার দিকে। যতই যাচ্ছি ততই মন খারাপ হচ্ছে। মন ভালো হয়ে গেল পাতায়া পৌঁছে। আমার দেশের কক্সবাজারের সমুদ্রের কাছে এইসব কী? অবশ্যই ওয়াক থু। ছি ছি! এর নাম সমুদ্র? এই সেই সমুদ্র সৈকত?

মনে হচ্ছে বড় এক দিঘি। সমুদ্র সৈকত নামের জায়গাটা বস্তিরমতো ঘিঞ্জি। সমুদ্র থেকে একহাত জায়গা ছেড়ে চেয়ারের গায়ে চেয়ার লাগানো চেয়ারের মাথায় ছাতা এক ঘন যে নিচটা অন্ধকার হয়ে আছে। শত শত ফেরিওয়ালা ঘুরছে। কাটা ফল, ভাজা শুঁটকি, ডাব। গা মালিশওয়ালারা তেলের শিশি নিয়ে ঘুরছে। উল্কি আঁকাওয়ালারা ঘুরছে উল্কির জিনিসপত্র নিয়ে। হাটবারের মতো মানুষ। এদের মধ্যে অসভ্য বুড়ো আমেরিকানরা কিশোরী পতিতাদের সবার সামনেই হাতাপিতা করছে। নিজ দেশে এই কাজ করলে তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যেত। পয়সা খরচ করে মজা পেতে তারা এই দেশে এসেছে। তাদের চোখে এটা প্রসটিটিউটদের দেশ। সব মেয়েই প্রসটিটিউট।

পাতায়া থেকে হাজারগুণ সুন্দর আমার বাংলাদেশের সমুদ্র। কক্সবাজার, টেকনাফ, কুয়াকাটা, সেন্টমার্টিন। আর বেলাভূমি-আহারে কী সুন্দর!

পাতায়া দেখে এই কারণেই আমার মন ভালো হয়ে গেল। একবার মন ভালো হয়ে গেলে সবকিছু ভালো লাগতে শুরু করে। আমি সফরসঙ্গীদের চমকে দিয়ে গায়ের শার্ট খুলে ফেললাম। এইখানেই থামলাম না, গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলাম, পেটে উল্কি আঁকব। আমাদের সামনে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকা বদ আমেরিকানটাকে দেখিয়ে বললাম, ঐ ব্যাটা পেটে যে ছবি আঁকাচ্ছে সেই ছবি।

সফরসঙ্গী কমল বলল, হুমায়ূন ভাই, ঐ ব্যাটা তো পেটে নেংটা মেয়েমানুষ আঁকাচ্ছে।

আমিও তাই আঁকাব। সেও বুড়ো আমিও বুড়ো।

যখন সফরসঙ্গীরা বুঝল আমি মোটেই রসিকতা করছি না, বাংলাদেশের

www.MurchOna.com

লেখক ক্ষেপে গেছে তখন বুঝিয়ে সুঝিয়ে রফা করা হলো-আমার পেটে বাঘের মুখের উল্কি আঁকা হবে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আমি পেটে বাংলার বাঘ নিয়ে ঘুরব। উল্কি আঁকা হলো। শুরু হলো আমার শ্যামদেশ ভ্রমণ। সন্ধ্যার মধ্যে চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে গেলাম। হোটেলে ফিরে ঘোষণা করলাম, এখানে যা আছে দেখা হয়ে গেছে। যৌনতা প্রদর্শনীর শহর। জীবনের আনন্দ যেখানে অতি স্থূল অর্থ গ্রহণ করেছে।

মাজহার বলল, পাতায়ায় আমাদের আরো তিনদিন থাকতে হবে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, কেন?

আমরা প্যাকেজে এসেছি। প্যাকেজে এখানে তিনদিন থাকার কথা।

তিনদিন আমি কী করব?

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। আসলেই তো তিনদিন কী করা যাবে?

দ্বিতীয় দিন একই জায়গায় শুরু হলো। একই দৃশ্য। প্রাণহীন সমুদ্র, অতিরিক্ত প্রাণময় ইউরোপের বুড়োর দল। তরুণী থাই মেয়েদের সঙ্গে লটকা লটকিতে যারা অসম্ভব পারঙ্গম।

আমাদের দলে মহিলা আছে দু'জন-শাওন এবং মাজহারের স্ত্রী স্বর্ণা। তারা শপিং -এ বের হলো। ফুটপাথ শপিং। তারাও যথেষ্ট বিরক্ত হলো। প্রতিটি দোকানে একই জিনিস। বাংলাদেশের মতো অবস্থা।

একটি জাতির মানসিকতা নাকি তাদের তৈরি খেলনা থেকে পাওয়া যায়। পথের দু'পাশে কিছুদূর পরপরই রবারের যৌনাঙ্গ নিয়ে লোকজন বসে আছে। বিক্রি হচ্ছে। অদ্ভূত এই খেলনা দেখে মাজহার পুত্র অমিয় কেনার জন্যে ঘ্যানঘ্যান শুরু করে মা-বাবা দুজনের হাতেই মার খেল। বেচারা মার খাওয়ার কারণ বুঝতে পারল না। তার মন পড়ে রইল অদ্ভুত ঐ খেলনায়।

সন্ধ্যাবেলায় ওয়াকিং স্ট্রিট নামের এক রাস্তার পাশের রেস্টুরেন্টে সবাই বসে আছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে শঙ্কিত আরো দু'রাত কাটাতে হবে এই ভেবে, মন থেকে শঙ্কা দূর করে আনন্দে আছি এমন এক ভাব করার চেষ্টা করছি। আমাদের একজন সফরসঙ্গী আর্কিটেক্ট ফজলুল করিম শুধু অনুপস্থিত। বেচারার মন খারাপ তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে গেছে। স্ত্রীকে নিয়ে এই পাতায়াতে সে অনেকবার এসেছে। এবার সে এসেছে একা। বাকি সবাই এসেছে সস্ত্রীক। ব্যক্তিগত পারিবারিক আনন্দ থেকে বঞ্চিত। প্রায়ই দেখি সে দল ছেড়ে একা ঘুরছে। আমাদের খারাপই লাগে। আজ সে আমদেরকে চমকে দিয়ে হাসিমুখে উপস্থিত হলো আর সঙ্গে অতি রূপবতী এক থাই কন্যা। মায়াময় চোখ। উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ। মাথাভর্তি ঘন কালো চুল।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

জানা গেল, করিম এই বান্ধবী জোগাড় করেছে। সে এখন থেকে করিমের সঙ্গেই থাকবে। প্রতিরাতে তাকে পাঁচশ বাথ দিতে হবে।

আমি অবাক হয়ে মেয়েটির নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দলের সবাই মেয়েটির সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করল। আমরা ভাব করলাম যেন সে করিমের দীর্ঘদিনের চেনা কোনো তরুণী। কিছুটা সময় আমাদের সঙ্গে কাটাতে এসেছে। মেয়েটিও সহজ-স্বাভাবিক। ছয়মাসের অন্বয়কে কোলে নিয়ে আদর করছে। গল্প করছে।

এর মধ্যে মাজহার পুত্র এক খেলনা কিনে নিয়ে এল। রিমোট কন্ট্রোলের গাড়ি। কিছুক্ষণ চলে, তারপর তালগোল পাকিয়ে যায়, আবার চলে। সবাই খেলনা দেখে মজা পাচ্ছি। থাই মেয়েটি জানতে চাইল, খেলনার দাম কত? মাজহার বলল, পাঁচশ' বাথ।

মেয়েটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলল, Me and Toy same same 500 bath.

সরল বাংলায়-এই খেলনার সঙ্গে আমার কোনো প্রভেদ নেই। আমি এবং খেলনা একই মূল্য, পাঁচশ' বাথ।

পাতায়া ভ্রমণ শেষে আমরা থাইল্যান্ডের অনেক সুন্দর জায়গায় গিয়েছি। এক হাজার এক প্রাকৃতিক লীলা সৌন্দর্যের ছটা দেখেছি। বইয়ে ক্রস মার্ক দিয়েছি। কিছুই কেন জানি আমাকে স্পর্শ করল না। কানে সারাক্ষণ থাই মেয়েটির করুণ গলা রেকর্ডের মতো বাজতে থাকল - Me and toy same same. মানবজীবনের কী করুণ পরাজয়!

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

Uthon Periye Dui Paa by Humayun Ahmed

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com